ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাএ ৯৮৭
পাণ্ডুলিপি ঃ অনুবাদ বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
এস. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

প্রচ্ছদ ঃ কাইয়ুম চৌধুরী

চিত্রসূচী

১। হ্যামলেটের মূর্তি স্ট্রাটফোর্ড অন আভনে ১১
২। ইংল্যাণ্ডের মিনাক থিয়েটার ২৯
৩। পরিচালক অভিনেতা জর্জ আলেকজাণ্ডার ৩২
৪। অগাষ্ট স্ট্রীণ্ডবার্গ ৪৮
৫। স্ট্যানিস্লাভেস্কি ৫৯
৬। নাট্যকার পিরানদেল্লো ৬৫
৭। সারফেসের ভূমিকায় স্যার জন গিলগুড ৭০
৮। বিচারের দৃশ্য—রোজ ক্রফোড স্কুলের অভিনয়ে ৮১
৯। বিচারের দৃশ্য —অলডুইচ থিয়েটারে ৮১
১০। নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেটস ১০৩
১১। নাট্যকার জন হুইটিং ১০৬
১২। নাট্যকার আর্ণল্ড ওয়েস্কার ১২৩
১৩। রসের ভূমিকায় আলেক গিনেস ১২৬
১৪। চিচেস্টার থিয়েটার ১৩২
১৫। চিচেস্টার থিয়েটারে মঞ্চ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ১৩৪
১৬। চিচেস্টার থিয়েটারের অভ্যন্তরে নাটকের প্রস্তুতি ১৩৫
১৭। চিচেস্টার থিয়েটারে অভিনয় ১৩৮
১৮। চিচেস্টার থিয়েটারে অভিনয়, অন্য আসন থেকে ১৪০
১৯। চিচেস্টার থিয়েটারের মডেল ১৪৪
২০। নাট্যকার ইউনেস্কোর আঁকা গণ্ডারের ছবি ১৬২
২১। ইউজেঁ ইউনেস্কো ১৬৬
২২। মোৎসার্ট ১৬৮
২৩। স্ট্রাটফোর্ড-অন-আভনে লেখক ১৭৭
২৪। লেখককে লেখা, নাট্যকার ইউনেস্কোর পত্র ১৭৭

সূচীপত্র

১।	মহাকবি সেক্সপীয়র সম্পর্কে কিছু নূতন তথ্য	১
২।	হ্যামলেট যুগে যুগে	১১
৩।	ইউরোপের মুক্তাঙ্গন মঞ্চ পরিদর্শনে	২০
৪।	কয়েকটি যবনিকাপাতের কাহিনী	৩২
৫।	অভিনেতা বার্ণাড' শ	৩৮
৬।	একটি থিয়েটারের জীবনী	৪১
৭।	অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গ	৪৫
৮।	নাট্য প্রযোজনা প্রসঙ্গে	৫৬
৯।	পিরানদেল্লো ও ইটালীয় নাটক	৬০
১০।	স্কুল অব স্ক্যাণ্ডাল	৬৬
১১।	ওল্ড ভিক	৭৩
১২।	ব্রেখটের নাটকের প্রযোজনা	৭৬
১৩।	ব্রেখট সম্পর্কে একটি চিন্তা	৮৩
১৪।	যুগ প্রবর্তক ব্রেখট	৮৮
১৫।	আমাদের গুরু সার্তব	৯২
১৬।	দুটি নাট্যকার ও মৃত্যু	১০০
১৭।	নাট্যকার ক্যামু	১০৮
১৮।	আধুনিক বিদেশী নাটক সম্পর্কে	১১৩
১৯।	ওয়েসকারের ত্রয়ী	১১৮
২০।	লণ্ডন মঞ্চে ঐতিহাসিক নাটক রস	১২৫
২১।	চিচেষ্টার থিয়েটার	১৩০
২২।	অ্যাবসার্ড নাটক কি ও কেন ?	১৪৫
২৩।	সেকালে একালে অ্যাবসার্ড নাটক	১৫৭
২৪।	ইউনেস্কো আর তাঁর গণ্ডার	১৬১
২৫।	হুল্ফগাঙ্গ আমেদিয়ূস মোৎসার্ট	১৬৮
২৬।	উনবিংশ শতাব্দীতে সেক্সপীয়রের নাটকের বাংলা অনুবাদের তালিকা	১৭৮
২৭।	নির্দেশিকা	১৭৯

মহাকবি সেক্সপীয়র সম্পর্কে কিছু নূতন তথ্য

সময়টা হল ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ। নূতন যুগের হাওয়া ইওরোপকে পরিব্যাপ্ত করে ইংল্যাণ্ডে ছেয়ে গেল। চৈত্রের দমকা ঝড়ে শুকনো পাতা ওড়ার মতো হঠাৎ সুরু হল নূতন করে সাহিত্যের সাধনা। সিডনী ও স্পেন্সার লিখতে আরম্ভ করলেন নানা রকমের রচনা, কবিতা, গান, নাটক। দীর্ঘ খরার পর, গ্রীষ্মের শুষ্ক দাবদাহের পর এ যেন বর্ষার সরস শ্যামলিমা, পৃথিবীকে রূপে, রসে উর্বর করবার সাধনা। স্পেন্সারের চাষীর পঞ্জিকা (The Shepherd's Calendar, ১৫৭৯) এবং পরীদের রাণী (Faerie Queen, ১৫৯০-১৫৯৬ প্রকাশিত হলে জনসাধারণ তাঁকে মহাকবি চসারের উত্তরাধিকারী স্বীকার করে অভিনন্দন জানাল।

এডমণ্ড স্পেন্সার (১৫৫২-১৫৯৯) ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ফিলিপ সিডনীর মৃত্যু উপলক্ষে এক কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন, অ্যাস্ট্রোফেল। সেইজন্যে দীর্ঘকাল মনে করা হয়েছে যে এঁরা বুঝি নিকট বান্ধব ছিলেন। একই সময়ে কেমব্রিজে পঠন এই ধারণাকে প্রসারিত করেছে। এখন জানা গেছে যে ষোড়শ শতাব্দীর এই দুই কবির মধ্যে পরিচয় থাকলেও নৈকট্য ছিল না। স্পেন্সার এসেছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। দুরন্ত বিদ্যার্জনের ইচ্ছা তাঁকে কেমব্রিজে নিয়ে এসেছিল। এখানেই তাঁর কাব্যচিন্তা মুক্তির পথ পেল। বিদ্যার উপাধি অর্জনের পথে না গিয়ে তিনি বিদ্যার নন্দনাত্মাকে লাভ করলেন। তাঁর রচনায় তাই দেখা গেল প্রেম ভালবাসার মাধুর্যের সঙ্গে দুঃখের অপরূপ পরিচয়।

স্যার ফিলিপ সিডনী (১৫৫৪-১৫৮৬) একাধারে যোদ্ধা, কবি, রাজনৈতিক, মহারাণী প্রথম এলিজাবেথের উপদেষ্টা, প্রশাসক এবং চিন্তাশীল লেখক। জুটফানের যুদ্ধক্ষেত্রে এক পিপাসার্ত সাধারণ সৈনিককে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর মহৎ জীবন দানের কাহিনী আমরা ছোটবেলায় পড়েছি। বলা বাহুল্য রাণীর তিনি ছিলেন একজন অতি বিশ্বাসভাজন সভাসদ। অত্যুজ্জ্বল এলিজাবেথীয় উপদেষ্টাদের মধ্যে সিডনী ছিলেন মধ্যমণির মতো উজ্জ্বল। "কেন কবিতায় বলছি" এবং "কবিতায় লিখছি বলে ক্ষমা প্রার্থনা করি' (The Defence of Poesie and An Apology for Poetry) দুইটি বইই ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৫৯০এ প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস

আরকেডিয়া এবং ইংরেজী ভাষায় শ্রেষ্ঠ সনেটের বই তাঁর রচিত অ্যাস্ট্রোফেল অ্যাণ্ড স্টেলা প্রকাশিত হয় ৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে। এই বইএ তাঁর জীবনের প্রেমের কথা প্রকাশ পেয়েছে। পেনেলোপী ডেভরুকে বিয়ে করতে তিনি ফিরলেন না যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। এই ঘটনা কেন্দ্র করেই স্পেন্সার রচনা করলেন তাঁর অ্যাস্ট্রোফেল কাব্য।

সিডনী নানা ভাষা জানতেন। কেমব্রিজে সেই সব ভাষার বহু গ্রন্থ পড়বার সুযোগ হল। রেনেসাঁসের দর্শন তাঁর ভেতরে সঞ্চিত হয়ে প্রকাশ পেল সম্পূর্ণভাবে ইংরেজী ভাষা সাহিত্যের পোষাক পরে। রাণীর দরবারে এবং সম্ভ্রান্ত সমাজে তাঁর চিন্তাভাবনাকে বিশেষ সমাদর দেওয়া হল ফলে অতি সহজে নূতন যুগের আবহাওয়া ছড়িয়ে গেল জনসাধারণের মধ্যে। স্যার ফিলিপ সিডনীর জন্য সব রকমের আধুনিক ভাব প্রকাশের, আলোচনার বা লেখার কোন বাধা থাকল না ইংল্যাণ্ডে। এই রকম ভাব প্রকাশের বাধাহীন আবহাওয়া কেবল সেক্সপীয়রের আবির্ভাবকে সাহায্য করেনি তাঁর নানাবর্ণের এবং নানা ছন্দের রচনা জনসাধারণকে উপহার দেওয়াকে সহজ করেছে। তখন বই ছাপতে সময় লাগত অনেক। স্যর ফিলিপ সিডনী তো তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর একটি বইও ছাপার অক্ষরে দেখে যেতে পারেননি। তাই সহজে কবি খ্যাতি পেতে হলে কবিতা পড়তে হত সকলের সামনে। পড়বার জায়গা অবশ্য কবির সুযোগসুবিধা এবং রচনার বিষয় অনুসারে নানা রকমের হতে পারত। হতে পারত গীর্জা বা বিশ্ববিদ্যালয় বা রাণীর দরবার। হতে পারত হাটের এক কোণ বা বাজারের একটা ঘর বা দেহবিলাসিনীর গৃহ বা বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্য। কিন্তু এই সব জায়গাতেই লোক সংখ্যার তারতম্য হলেও সংখ্যা হবে সীমিত। বেশী লোককে কবিতা শোনাতে হলে তা লিখতে হবে গল্পের মতো। চরিত্র চিত্রণ করতে হবে। ঘটনার পারম্পর্য কাহিনীর সূত্রকে আগিয়ে নিয়ে যাবে। উপন্যাসের মতো কবির বক্তব্যের প্রকাশে শেষ হবে এই বিরাট কাব্য। দল করতে হবে। উপযুক্ত পোষাকে সজ্জিত নরনারীরূপে তাঁরা লেখকের কথা শোনাবেন জনসাধারণকে। এই নিরলস পরিশ্রমে নাটক প্রযোজনা করবেন যে কবি তাঁর কাব্যই শুনবে সর্বাধিক জনগণ এবং সেইজন্য অর্থ উপার্জন করে নিজের ও দলের আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার সুযোগ পাবেন তিনি।

অ্যাভন নদীর পারে স্ট্র্যাটফোর্ড গ্রামের উইলিয়াম সেক্সপীয়র (১৫৬৩-১৬১৬) কিন্তু জীবনে অর্থোপার্জন ভালই করেছিলেন। বিভিন্ন জায়গায়

তিন চার খানা বাড়ী তো ছিলই তাছাড়া অন্ততঃ দুইখানি গাড়ী, চারজোড়া ঘোড়া এবং বেশ কিছু অর্থ তাঁর কন্যাদ্বয়কে (নাকি কন্যাত্রয়) দিয়ে গিয়ে-ছিলেন। মহাকবি সেক্সপীয়র যে খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন সেটা তাঁর বিবাহে স্পষ্ট। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মাত্র আঠার বছর বয়সে তাঁর থেকে ১৯ বছরের বড় অ্যানা হ্যাথওয়েকে বিবাহ করে তিনি নিজের আর্থিক সমস্যার প্রাথমিক সমাধান করেন। কে কাকে প্ররোচিত করেছিল সে সুক্ষ্ম আলোচনায় গত চারশত বছরে বহু কেশ পক্ক হয়েছে। সুতরাং সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে অ্যানা হ্যাথওয়ের রূপ না থাকলেও প্রচুর সম্পত্তি ছিল। তাঁর জমি, গরু, চাষের ঘোড়া, মুরগীর খাঁচা, খামার বাড়ী, ফলের বাগান প্রভৃতির হিসেব সহজেই দেখা যায়। নিঃসন্দেহে সমাধান করা যায় যে মহাকবি তাঁর প্রাথমিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান আঠার বছর বয়সেই করে ফেলেন। অ্যানা হ্যাথওয়েই ছিলেন সেক্সপীয়রের তিনটি সন্তানের (কন্যার) জননী। দুইটি কন্যার কথা আমরা জানি। তাঁদেব বিবাহ, সংসার এবং উত্তরাধিকারীদের নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। মনে করা হত এঁদের তৃতীয় সন্তান ছিল পুত্র এবং অতি বাল্যকালে তার মৃত্যু হয়েছে। আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে এটিও ছিল কন্যা। সে এক অভিনেতাকে বিবাহ করে অন্যত্র চলে যাওয়ায় পিতার বিরাগভাজন হয়। সেজন্য কোথাও তার কোন উল্লেখ নাই। এই কন্যার যখন সন্ধান মিলেছে তখন আগামী কালে তার সম্বন্ধে আরো খবর পাবার আশা করা যায়। বিবাহিত জীবনে সেক্সপীয়র সুখী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে লণ্ডন প্রবাসকালে তিনি ছুটির সময় যথারীতি বাড়ী ফিরে এসেছেন। অ্যানা জানতেন যে তাঁর স্বামী অন্য স্ত্রীলোকে আকৃষ্ট হবেন এবং পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলে তাঁদের জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসতে পারে। কিন্তু মহাকবি সেক্সপীয়রেব নাট্য সাফল্য এই সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। উল্কার গতিতে ছড়িয়েছে তাঁর সুনাম, টেনে নিয়ে গেছে তাঁকে মহারাণী প্রথম এলিজাবেথের নবরত্ন সভায়। সেখানে কৃষ্ণকেশদামের অধিকারিণী রাণীর নিত্য সঙ্গিনীর প্রতি প্রেম নেহাতই কাব্যিক প্রসঙ্গ। এর ফলে জন্ম নিয়েছে বহু সনেট ও চতুর্দশপদী কবিতা। নাটককে করেছে জীবন্ত। মহান করেছে প্রেমের আদর্শকে। দর্শক তাদের নিজেদের খুঁজে পেয়েছে সেক্সপীয়রের রচনায়, ভাষায়, প্রেমে। অ্যানা হ্যাথওয়ে কখন লণ্ডন যাবার প্রয়োজন অনুভব করেননি তাই যাননি। তিনি জানতেন তাঁর কবি মহাশূন্যের যত দূরেই বিচরণ করুন অবশেষে ঘরে

তাঁকে ফিরতে হবে। তাঁর মতো কবিকে আর কে জেনেছে। তিনি ছাড়া মহাকবি সেক্সপীয়রকে আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ। এই কথা স্মরণ করে কবিজায়ার কাছ থেকে সরে যাবার সময় তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ২৪ বছর বয়সে সেক্সপীয়র প্রথম লণ্ডনে গেলেন। গ্রামের স্কুলে শিক্ষা শেষ করে তিনি অন্য এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং অর্থের অভাব তাঁর গ্রাম ছাড়ার কারণ নয়। স্ত্রীর সম্পত্তি ও শিক্ষকের কর্মে বহু লক্ষ ইংল্যাণ্ডবাসীর মতো তাঁর জীবনও পরম নিশ্চিন্ত-তায় সমাপ্ত হতে পারত। অভাব তিনি অনুভব করলেন মননের, নানা নূতন চিন্তাভাবনার গন্ধ ভেসে আসছে, কখনও একটু স্পর্শ। গুজবেরই কতো নূতন রং। কিন্তু কিছুই সম্পূর্ণ নয়—কোনটাই ধরা যাচ্ছেনা। খবর নিতে, মনের পিপাসাকে শান্ত করতে যেতে হবে যেখান থেকে উৎপত্তি হচ্ছে এই সমস্ত খবরের—লণ্ডন সহরে।

লণ্ডনে এক বছব কষ্ট পাবার খবরের অনেক গল্প প্রচারিত। কিন্তু সেটা পবো বছর হবে না। কাবণ নাটক অভিনয়ের সময় শেষ হলে তিনি বাড়ী ফিরেছিলেন এবং সম্ভবতঃ বাড়ীতেই রচনা করেছিলেন শৈত্যাবকাশে তাঁর সুবিখ্যাত নাটক দুইটি কমেডি অফ এরারস্ এবং (অথবা) ষষ্ঠ হেনরির প্রথম পর্ব। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটক দুইটির একটি লণ্ডনে অভিনীত হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মাঝে মাঝে নিজে অভিনযে অংশ গ্রহণ করতেন আজ প্রমাণিত। কখনও পরিচালকের ভূমিকাতেও তাঁকে দেখা গেছে। বহু নাটক, প্রচণ্ড সুনাম, অর্থ, সম্পদ, প্রতিপত্তি ও সম্মান পাবার পর ভগ্ন স্বাস্থ্যে তিনি চিরকালের মতো বাড়ী ফিরে এলেন ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ৪৬ বছর বয়সে। স্ত্রী গত হয়েছেন। কন্যাদের বিবাহ হয়ে গেছে। গৃহশূন্য। তিনি এবার তাঁর সম্পত্তি কন্যাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এবং নিজে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কন্যার কাছে বাস করতেন। তাঁর নিজের হেনলে ষ্ট্রীটের বাড়ীর সংস্কারও হয় এই সময়ে। এই বাড়ীতেই তিনি জন্মেছিলেন। কবির মা ছিলেন চাষীদের একমাত্র কন্যা সেজন্য তাঁর সম্পত্তিও সেক্সপীয়রকে বর্তেছে। অবশেষে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৫২ বছর বয়সে মহাকবি দেহ রক্ষা করলেন। স্থানীয় ট্রিনিটি গীর্জায় মহা সম্মানে তাঁর দেহাবশেষ রক্ষিত হল।

সেক্সপীয়রের কালকে নিয়ে গবেষণায় জানা গেছে যে তাঁর অধিকাংশ

নাটকের পরিচালক রিচার্ড বর্বাজের সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময় লুপ্ত। রিচার্ডের বাবা ছিলেন এই সম্প্রদায়ের দ্বাররক্ষক ও অর্থসংগ্রাহক। এ কাজের গুরুত্ব এই কাগজের প্রবেশপত্রের দিনে না বোঝারই কথা। তখন দ্বার রক্ষককে প্রবেশের অর্থ দিলে তবে ভেতরে আসা যেত। নিজেদের লোক না হলে অর্থনাশের সম্ভাবনা ছিল। সেক্সপীয়র নিজে দীর্ঘদিন এই কাজ করেছেন। অর্থাৎ দলের একজন প্রধান ও বিশ্বাসী লোকের ওপর সর্বদা এই ভার দেওয়া হয়েছে।

সেক্সপীয়রের বুঝতে এতটুকু ভুল হয়নি যে নাটককে হতে হবে সমাজের প্রতিচ্ছবি। যত সমাজের কাছাকাছি যাবে নাটক, যত সত্য ও গ্রহণীয় হবে তার বক্তব্য তত জনপ্রিয় হবেন নাট্যকার। তাঁর নাটক সমাদর পাবে এবং আর্থিক সাফল্যে পরবর্তী প্রযোজনাকে সাহায্য করবে! বলা বাহুল্য নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা সেক্সপীয়রের জীবনে আসেনি। অনেক সময় কেমব্রিজের বিদ্বানগোষ্ঠী তাঁর রচনা পদ্ধতিতে, প্রকাশ ভঙ্গিমায় এবং ব্যাকরণ ব্যবহারে দোষ দেখিয়েছেন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সেক্সপীয়র আনুষ্ঠানিক ভাবে একজন "বিশিষ্ট ভদ্রলোক" পর্যায়ে উন্নতি হলেন এবং কোট অফ আর্মস ব্যবহারের অনুমতি পেয়ে নিজের স্মারক চিহ্ন তৈরী করালেন, তখন তাঁকে ঠাট্টা করে কেমব্রিজে কবিতা লেখা হল। অতি তীব্র কঠোর শ্লেষপূর্ণ সে ভাষা। ভাবখানা হল: "কতো পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তি কবিতায় নানা অপূর্ব রস সৃষ্টি করেও জীবনে কিছু করতে পারলেন না আর এই ব্যাটা ভুল ব্যাকরণে কবিতা লিখে নিজের মুখ দিয়ে সেটা জবর আওয়াজ করে প্রচার করে কেবল বাড়ী আর বহু জমি করল না শেষকালে বিশিষ্ট ভদ্রলোকও হয়ে গেল। কথা বিক্রির কি মাহাত্ম্য!"

রিচার্ড বর্বাজের বাবা এবং কাকা দুজনাই খুব ভাল ছুতোর ছিলেন। নাটকের দলে তাঁদের প্রয়োজন এবং মঞ্চ তৈরীর কাজে তাঁদের জ্ঞান তাই খুব কাজে এসেছিল। রিচার্ড যখন সেক্সপীয়রের দলের প্রধান অভিনেতা ও পরিচালক হলেন তখন তাঁর ক্ষমতাও হল অপ্রতিহত। বর্বাজের কাগজপত্র পাওয়া যায় না কিন্তু আর এক সমসাময়িক অভিনেতা ফিলিপ হেন্সলোর চিঠিপত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে তাই থেকে বর্বাজ ও সেক্সপীয়র সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। নেড অ্যালেন বিবাহ করেন হেন্সলোর স্ত্রীর প্রথম পক্ষের কন্যাকে এবং ভাল অভিনেতা হওয়ায় শ্বশুরকে নিয়ে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে এক নাট্যদল গড়ে তোলেন। তাঁর চোখের সামনে ছিল সেক্সপীয়রের দলের মতো

দল গড়বার স্বপ্ন। তাঁর পত্রগুচ্ছ থেকে তাই এ সময়ের কিছু খবর পাওয়া যায়। অ্যালেনের বাড়ীতে লেখা পত্রে উল্লেখ আছে নাট্যকার বেন জনসন কিভাবে উন্মত্ত হয়ে অভিনেতা গেব্রিয়েল স্পেন্সারকে এক কুৎসিত পল্লীর মধ্যে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় হত্যা করেন। ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের প্লেগের সময় অ্যালেন ব্রিস্টলে পলায়ন করেন। সম্ভবত অধিকাংশ নাটুকে দলই তাই করেছিল। হেন্সলোর জামাইকে লেখা পত্রে জানা যায় যে, গেব্রিয়েলকে তিনি মোটা টাকা চড়া সুদে ধার দিয়েছিলেন। তাই গেব্রিয়েলের মৃত্যুতে আর্থিক ক্ষতির জন্ম তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শ্বশুর জামাই-এর মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল তাই অনেক চিঠি আছে। হেন্সলো জানান যে বেন জনসনকে স্বয়ং সেক্সপীয়র রক্ষা করছেন সেজন্ম তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই করা যাবে না। সেক্সপীয়রের তখন রাজসভায় বিশেষ প্রতিপত্তি হয়েছে। বেন জনসনকে রক্ষা করবার কারণ তাঁর এভরিম্যান ইন হিজ হিউমার নাটকের পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা হলেন সেক্সপীয়র। তাছাড়া দু বছর আগে গেব্রিয়েল এক নাপিতের দোকানে চুল কাটতে গিয়ে একজন অভিনেতাকে মেরে ফেলেছিলেন। এখন কোন ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা হলে সে সব ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ভাবে উঠবে এবং এই ঘটনার পরেই হেন্সলো টাকা ধায় দেওয়ায় তাঁকে এই ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলা বিচিত্র হবে না। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই সঙ্গত।

প্লেগের সময় যে সব অভিনেতারা লণ্ডনে থাকবার সাহস করেছিলেন তারা সবাই মারা গেলেন। বস্তুত পালিয়ে গিয়ে আয়ের পথ খোলা রাখা নাট্যদলগুলির পক্ষে বেশ কঠিন কাজ হয়েছিল। সেক্সপীয়র এ সময়ে কিন্তু বাড়ীতে ফেরেননি। মধ্য ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার ফলশ্রুতিতে একাধিক সনেট এই সব জায়গার রূপ বর্ণনা করে। প্রায় পুরো ১৫৯২ ও ১৫৯৩ সেক্সপীয়র লণ্ডনে ছিলেন না। ১৫৯৩ সালে আর্ল অফ সাউথহ্যাম্পটন সেক্সপীয়রের দলের ভার নিলেন। পর বৎসর থেকে স্বয়ং লর্ড চেম্বারলেন (রাণীর অর্থ মন্ত্রী) সেক্সপীয়রের পৃষ্ঠপোষক হলেন আমৃত্যু; যদিও এক্ষেত্রে সেটা আক্ষরিক ভাবে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সেক্সপীয়র লর্ড চেম্বারলেনের নাট্য গোষ্ঠীর নাট্যকার ও অভিনেতারূপেই পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী কালে অবশ্য এই দলই নাম পালটে রাজার দল বা রাজা প্রথম জেমসের নাটুকে দল নামে পরিচিত হয়েছে।

অন্য নাট্যদল থেকে সেক্সপীয়রকে আক্রমণ করা হয়েছে। যুদ্ধে অবতীর্ণ

হলেন তৎকালীন লণ্ডনের সব থেকে খ্যাতনামা সাহিত্য সমালোচক ও সাংবাদিক রিচার্ড গ্রীণ। লিখলেন: "কোথা থেকে একটা পাড়াগেঁয়ে ভুঁইফোড় অভিনেতা এসে জুটেছে সে যা লেখে সেগুলো নাকি নাটক। তার আবার কবিতা লেখার সখ আছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাকি লেখা তার কবিতা।" তারপর ষষ্ঠ হেনরি নাটকের তৃতীয় পর্বের ধরণে লিখলেন ব্যাঙ্গ কবিতা। সম্ভবত এমন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর কখনও কেউ করেনি। অবশ্য পেছনে অন্য কারণ ছিল। মার্লো, ন্যাশ, পীল, লাইলী ও গ্রীণ স্বয়ং ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র। তাঁরা সবাই বিভিন্ন সময়ে নাটক লিখেছেন কিন্তু হয় সে নাটক অভিনীত হয়নি কিংবা হলেও দর্শক সমাগম হয়নি। মার্লো ছাড়া আর কার নাম তো বিংশ শতাব্দী জানতই না। রাগটা সেখানেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের নাটক চললনা আর এই কোথাকার মূর্খ এক গোঁয়ার নাটক লিখে দেশকে মাতিয়ে দিল। বেন জনসন এই লড়াইটা ভালই উপভোগ করেছিলেন তাই মৃত্যুর পরের স্মারক কবিতায় সেক্সপীয়রকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন: "তোমার কাছে পরাজিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র লাইলী ও কিডের জ্ঞান, এমনকি মার্লোর অমন জোরদার কাব্য তোমার রচনার কতো পেছনে পড়ে থাকল।"

গ্রীণ ও সেক্সপীয়রের বিতণ্ডা এক কথায় মেটেনি। 'সেটল' নামে কাগজ সেক্সপীয়রের প্রতিবাদ ছাপে। তারপর গ্রীণের সেক্সপীয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ছাপা হল, তারপর আবার সেই সূত্রে সেক্সপীয়রের প্রতিবাদ। বলা বাহুল্য সংঘর্ষের কারণ সেদিন যোদ্ধাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। বিরাট এক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বদল যে আরম্ভ হয়ে গেছে তা এঁরা কেউ বুঝতে পারেন নি। নূতন যুগের হাওয়ায় যে বিশ্ববিদ্যালয়, অভিজাত শ্রেণী, ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষার প্রহরা ভেঙে যেতে বসেছে গ্রীণ তা দেখতে চাইলেন না। আর আর্থিক নির্ভরতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী মহাকবির পক্ষে ও সব জানার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই গ্রীণ জ্বলেপুড়ে মরলেন তাঁর জ্ঞানের অহঙ্কারে। তাঁর সরস রচনাগুলি টিকে আছে কেবল ভাষার তীক্ষ্ণতার উদাহরণ হয়ে। তাঁর কাব্য সাহিত্য লুপ্ত।

সেক্সপীয়র ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্লোব থিয়েটারের অংশীদার হয়ে বসলেন। দশ বছর যেতে না যেতেই টেমস নদীর অপর পারে ফ্যাসানদুরস্ত আধুনিক থিয়েটার ব্ল্যাকফ্রায়ার্স তৈরী হল (এখানেই আধুনিক ন্যাশানাল থিয়েটার আজ অবস্থিত)। প্রথম থেকেই বেশ মোটা অংশের মালিক উইলিয়াম

সেক্সপীয়র। সময় ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ। শুধু তিনি নন তাঁকে অনুসরণ করে অনেক নাট্যকার ও অভিনেতা আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টি করে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেছেন। অভিনেতারা সমাজের ঘৃণ্য জীবের পর্যায় থেকে এই সময় নিজেদের সমবেত চেষ্টায় অনেক উঁচুতে নিজেদের স্থাপনা করেছে। মহাকবির উদাহরণ যে তাঁদের পথপ্রদর্শন করেছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সেক্সপীয়রের রচনার প্রধান গুণ হল যে তা যেমন তার সমকালীন যুগের অভিনয়ে চিৎকার করে বলা অঙ্গভঙ্গীর প্রবলতা সহ্য করেছে আজও তেমনি স্বাভাবিক বাচনভঙ্গীর অভিনয় বা সিনেমার অতি স্বাভাবিক কথা বলার ভেতর দিয়ে সমানই প্রস্ফুটিত হচ্ছে। তাঁর কাব্য, তাঁর ছন্দ, তাঁর ভাষা মাধুরী চারশত বছরেব আবহাওয়া সহ্য করে আজও অম্লান। শুধু তাই নয়। নানা দেশে তাঁর রচনা প্রচারিত। এমনকি সুদূর আফ্রিকায় জঙ্গলের সাজে অভিনয় হয়েছে ম্যাকবেথ নাটকের। সর্বত্র সেক্সপীয়র মানমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নাটকের অভিনয় দেখে যত কবিতা যুগে যুগে লেখা হয়েছে তা সংগ্রহ করলে একখানা বৃহৎ খণ্ডে সম্পূর্ণ ছাপা যাবে না।

সেক্সপীয়রের সময়ও তফাৎ কিছু কম ছিল না। ১৫৯৮ এর পর এই বিভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠল। নূতন যুগের মানুষ পুরাতন অভিনয়ধারা পুরাতনী নাটক ত্যাগ করে নবতর শিল্পসৃষ্টির জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। পুরাতন থিয়েটার আগুনে পুড়ে যাবার পর বর্বাজ শোরডিচে একটা থিয়েটার ক্রয় করেন। এবার সেই থিয়েটার খুলে ফেলে তারই কাঠ-কাপড় দিয়ে তৈরী হল টেমসের দক্ষিণে নূতন গ্লোব থিয়েটার। গ্লোব এবং ব্ল্যাকফ্রায়ার্স দুটি থিয়েটারেই সেক্সপীয়রের নাটক নিয়মিত অভিনীত হতে থাকল। তার মধ্যে ব্ল্যাকফ্রায়ার্সে অভিনীত হত যত নূতন ধরণের নাটক। হাসির নাটকগুলি সবই ব্ল্যাকফ্রায়ার্সে অভিনয়ের জন্য রচিত। থিয়েটার দুটির মধ্যে দূরত্ব বেশী ছিল না। নাট্যকার প্রতি রাত্রে দুটি থিয়েটারেই ইচ্ছা করলে ঘুরে আসতে পারতেন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরও সেক্সপীয়রের নিয়মিত ও ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য অন্য সবাইকে ভাবিয়ে তুলল। হান্সলো-অ্যালেন গোষ্ঠী লোকসানের ভয়ে দলবল নিয়ে এবার পাত্তাড়ি গুটিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে গেলেন। এমন কি বেন জনসনও ক্ষেপে গেলেন। তাঁর দুইটি বিখ্যাত নাটক ভোলপোন এবং অ্যালকেমিস্ট সেক্সপীয়রের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্ল্যাকফ্রায়ার্স থিয়েটারে চমৎকার ভাবে অভিনীত হল। কিন্তু সেক্সপীয়রের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। তিনি যা লেখেন তাই দারুণ চলে। বেন জনসনের মতে পঞ্চম হেনরি, ষষ্ঠ হেনরি

এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিচার্ড নামীয় নাটকগুলি অতি সাধারণ। তাঁর মতে জুলিয়াস সীজার, কোরিওলেনাস ও পেরিক্লিস অতি নিকৃষ্ট নাটক। তিনি অভিযোগ তুললেন যে কেবল মহাকবির নামেই সবগুলি সমানভাবে জনপ্রিয়। শেষকালে তিনিও কবিতা লিখে ঠাট্টা করলেন। তাঁর প্রথম সাফল্যজনক নাটক যেটি সেক্সপীয়রের পরিচালনায় এবং অভিনয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যখন ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাকবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হল সকলে সবিস্ময়ে দেখল যে একটি চরিত্রকে বদলে সেক্সপীয়রকে ঠাট্টা করা হয়েছে। কয়েকটি সংলাপ পালটিয়ে সাধারণ মঞ্চ এবং তার দর্শকদের সম্বন্ধে কটুকথা বলা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের দর্শক বেন জনসনকে ক্ষমা করে নি। সেই বছরেই সেক্সপীয়রকে স্মরণ করে এক মহৎ কাব্য রচনা করার পরও নয়।

কালের অতীত এই অনন্ত প্রতিভাধর মহাকবিকে বোঝবার সাধ্য বেন জনসন কোথায় পাবেন। আজও কোরিওলেনাস, পেরিক্লিস, জুলিয়াস সীজার এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় অবাক বিস্ময়ে দেখতে হয়। এই নাটকগুলিতে বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা প্রতিফলিত। মহাকবির মনীষার কোন মাপ আজও পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত কতশত সমালোচক বোঝবার চেষ্টা করেছেন কি করে একজন সামান্য নাট্যকার, চাষী বংশে যাঁর জন্ম, শিক্ষাদীক্ষায় সাধারণ, এমন কালজয়ী এতগুলি নাটক লিখে গেছেন। সম্ভবত মানব চরিত্রে অভিজ্ঞতা সেক্সপীয়রের মতো আর কারু ছিলনা। তিনি যেন মন্ত্র দিয়ে দর্শকদের যাদু করতেন। টেম্পেষ্টে তাই তিনি ইচ্ছা করেই লিখেছেন: "আমার মন্ত্র ভুলে, আমার যাদুদণ্ড ভেঙে এবার ঘরে ফিরে চলেছি।" সর্ব সমেত ৩৮টি পূর্ণাঙ্গ নাটক সেক্সপীয়র ২১ বছরে লিখে জনসাধারণকে উপহার দিয়েছেন। আর দিয়েছেন কবিতা। কাব্য সুষমায় সেগুলির জন্যই তিনি মহাকবি আখ্যা পেতে পারেন।

বলা হয়েছে রেণেঁসাসের যুগ এখনও চলছে। যুক্তি ও জ্ঞান মানুষের মনকে পরিব্যাপ্ত করেছে। ধর্ম ও সংস্কার যদি কোথাও মোহজাল সৃষ্টি করে থাকে বুদ্ধি ও তর্ক তাকে ধ্বংস করবে। তাই এ যুগে ধর্ম ও সংস্কারকে যুক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে সখ্য স্থাপনা করতে হয়েছে। এই জ্ঞান থেকেই শাখায়িত হয়েছে জ্ঞানান্বেষণ এবং তারই ফলে নানা বিদ্যার প্রচার ও প্রকাশ হচ্ছে। সেক্সপীয়রের রচনা এই যুক্তি ও জ্ঞানে নির্ভরশীল বলেই তার অধিকাংশ আজও গ্রাহ্য এবং জনপ্রিয়। যদি চিন্তাশীল মানুষের ভাবধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে মহাকবির রচনা থেকে প্রতি দশক, প্রতি যুগ, প্রতি কাল সমসাময়িক

চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাবে। এটাই সেক্সপীয়রের মহত্ব, তাঁর বিরাটত্ব এবং প্রতিভার অপরূপ বিকাশ।

ঝরণা যেমন শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে বিলীন হয় তেমনি সেক্সপীয়রের মাধ্যমে রেণেসাঁসের গতি ইংল্যাণ্ডের সাধারণের মধ্যে মিশে গেল। তারপর তাদের বংশধররা যখন ভারতবর্ষে বিশেষ বাংলায় এলেন তখন তাঁদের অজান্তে তাঁরাই হলেন রেণেসাঁস চিন্তাধারার বাহক। যেমন একদিন ম্যালেরিয়া এসেছিল বিদেশ থেকে তেমনি করেই এল নূতন দিনের আলো যার ব্যবহারিক দিকটা গ্রহণ করল এদেশের লোক। বিদেশীদের সংস্পর্শে এসে তারা বদলে গিয়ে হল এক নূতন ধরণের মানুষ। সেক্সপীয়রের ধারা মিশল বেদের সঙ্গে ভাগবৎ, গীতার সঙ্গে, আমাদের আউল বাউল কবিগানের সঙ্গে, আমাদের বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সঙ্গে। তারই ফলশ্রুতিতে এলেন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন আর রবীন্দ্রনাথ। থাক সে আর এক প্রবন্ধ।

হ্যামলেট যুগে যুগে

মহাকবি সেক্সপীয়র রচিত হ্যামলেট ইংলণ্ডের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক। সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হবার পর থেকে আর কোন নাটক সম্ভবতঃ এতবার অভিনীত হয়নি। কিন্তু একথা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে যে হ্যামলেট অভিনীত হয়েছে তা আজকে যে হ্যামলেট নাটক আমরা পড়ি তারই অনুরূপ। পরিপূর্ণভাবে সেক্সপীয়র রচিত হ্যামলেট নাটক উনবিংশ শতাব্দীর আগে অভিনীত হয়নি। সেক্সপীয়রের



জীবদ্দশায় কিভাবে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল সে খবর আজও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রযোজক,

পরিচালক, অভিনেতা ও অভিনেত্রী হ্যামলেট নাটককে নিজের মনের মতো করে নিয়ে অভিনয় করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে হ্যামলেট নামে যে নাটক অভিনীত হয়েছে তা পুরোপুরি সেক্সপীয়র রচিত হ্যামলেট নাটক নয়। হ্যামলেট নাটকের বিভিন্ন অভিনয়-রীতি এবং বিভিন্ন প্রধান চরিত্রাভিনেতাদের কীর্তিকলাপ এই প্রবন্ধে আলোচনা করব।

সেক্সপীয়র রচিত হ্যামলেট নাটকের প্রথম অভিনয় ১৬০০ বা ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে হয়, একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে বলা বাহুল্য। এই স্বীকৃতির মানে এই নয় যে, ঐ তারিখ নিয়ে বিবাদ শেষ হয়েছে। বরঞ্চ জ্ঞানী-জনদের মধ্যে হ্যামলেট রচনার এবং তার প্রথম অভিনয়ের তারিখ নিয়ে তীব্র বিতণ্ডা শতাব্দীকাল থেকে চলে আসছে। এই সূত্রে ওথেলো নাটকের কাল এবং রচনার পরিপক্কতা নিয়ে যে গবেষণা চলেছে তা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে একাধারে যেমন শ্রদ্ধার বস্তু তেমনি হাস্যকর। বিভিন্ন গবেষকের কুটিল দৃষ্টিতে এই রচনা কিভাবে বিভিন্নরূপে বিচারিত হয়েছে তা সত্যি বিস্ময়কর।

আমাদের একথা বিশ্বাস করতে বাধা নেই যে, সেক্সপীয়রের সহ-যোগিতায় হ্যামলেট নাটক গ্লোব থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। রিচার্ড বর্বাজ পরিচালনা ও হ্যামলেট চরিত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামলেট পুনরভিনীত হয় রাণী এলিজাবেথ এবং প্যালাটিনের ইলেকটারের সম্মুখে। লর্ড ট্রেসারারের বিজ্ঞপ্তি থেকে জানতে পারি যে, ক্রমান্বয়ে চৌদ্দটি নাটক পরিবেশিত হয়, তার মধ্যে হ্যামলেট, ওথেলো ও কিং লিয়ার অন্যতম। এই নাটকগুলি প্রযোজনার জন্য জন হেমিংকে তিরানব্বই পাউণ্ড ছয় শিলিং আট পেন্স দেওয়া হয়। এই সময়ের পর থেকে হ্যামলেট নাটক প্রায় নিয়মিতভাবে ইংলণ্ডে অভিনীত হতে থাকে। বিশেষভাবে যে ঘটনা চোখে পড়ে তা হচ্ছে একমাত্র হ্যামলেট ছাড়া সেক্সপীয়রের কোন নাটক ১৬১০ থেকে আজ পর্যন্ত নিয়মিত অভিনীত হয়নি। ইংলণ্ডের প্রত্যেক সময়ের শ্রেষ্ঠ নটরা এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'অনথ্রোপোপেগস' নামে নৃতত্ত্ব বিষয়ক এক বিরাট বই প্রকাশিত হয়। তার ১৪ পৃষ্ঠায় নরখাদকদের বিবরণীতে অন্যান্য কথার শেষে লেখা আছে, "অনেকটা হ্যামলেটের ভূতের মতো"। সুতরাং 'হ্যাম-লেটের ভূত' ১৬২৪ এর মধ্যে প্রচলিত প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বোঝা

যায়। নাবিকদের ডায়েরী ছাড়া ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হ্যামলেট অভিনয়ের অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে নাবিকদের বিবরণ থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে এটি জনপ্রিয় নাটকের অন্যতম ছিল।

১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাজ্ঞবর স্যমুয়েল পেপি হ্যামলেটের ভূমিকায় বেটারটনের অভিনয় দেখে নাটকের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। পরে এই ভূমিকা টেলার গ্রহণ করেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কখনও বেটারটনকখন ও টেলার হ্যামলেটের রূপারোপ করতেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হিষ্টোরিয়া হিষ্টানিকা গ্রন্থে টেলারের অভিনয়ের ভীষণ প্রশংসা করা হয়েছে। বেটারটন কিন্তু ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ভূমিকা-ভিনয় করা ছাড়েননি। ৭০ বছর বয়সে বেটারটনকে দেখে সাংবাদিক এণ্টনি এ্যাসটন বলেছেন যে, তখন যদিও তাঁকে ঐ চরিত্রে মানাত না তবু অভিনয় দেখলে তিনিই যে হ্যামলেট এ বিষয়ে সন্দেহও থাকত না।

বেটারটনের মৃত্যুর পর বিখ্যাত গ্যারিক এই চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন। এই সময় সিন আঁকার শিল্প সমধিক উন্নত হল। গ্যারিক তার পূর্ণ সুযোগ নিলেন। কাল জামা আর ডান পায়ের মোজা খোলা অবস্থায় গ্যারিক যে হ্যামলেটের সৃষ্টি করলেন তা এখন পর্যন্ত চলেছে। আজ অঙ্গে কাল রঙের জামা ছাড়া হ্যামলেট চরিত্র কেউ কল্পনা করতে পারেন না। ডান পায়ের মোজা খোলা রাখার ফ্যাশন, গত দশকের (১৯৫০-৬০) অতি আধুনিকরা মাত্র সেদিন বন্ধ করতে পেরেছেন। গ্যারিকের হ্যামলেট চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় হয ১৭৪২ ৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং তেরবার তাঁকে এই চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। গ্যারিকের সমসাময়িকদের মধ্যে উইলকস্, ডেলানে, সিবার ও রায়ান এই চরিত্রে অভিনয় করেন। সেই সময়কার বড় অভিনেতাদের মধ্যে একমাত্র কুইন কখনও এই ভূমিকা গ্রহণ করেননি। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সেরিডান প্রথম এই চরিত্রে অভিনয় করলেও ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ছয়বার হ্যামলেটের ভূমিকায অভিনয় করার জন্য গ্যারিককে তিনশো পাউণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই গ্যারিকের ভাগ্যরবি রাহুগ্রস্ত হয়—এবং হ্যামলেটের ভূমিকায় ব্যারী সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। ড্রুরিলেন থিয়েটারের ম্যানেজার হয়ে গ্যারিক এই থিয়েটারের পরিধি বৃদ্ধি করলেন এবং ১৭৬২-৬৩তে আবার হ্যামলেটের অভিনয় করলেন। ব্যারীর সাফল্যের পর রাতারাতি অভিনেতা হয়ে যাবার মোহে বহু লোক হ্যামলেটের অভিনয় করতে সুরু করলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পাওএল এবং

হল্যাণ্ড। হল্যাণ্ড সম্পর্কে নানা গল্প প্রচলিত আছে। তাঁর সুন্দর চেহারার জন্য অনুরাগিণীর অভাব ছিল না। কোন কিছু হল্যাণ্ডের হাত থেকে পড়ে গেলেই এই অনুরাগিণীর দল দৌড়ে স্টেজে উঠে সেটি তুলে দিতেন। অভিনয় এমনিতেই অসম্ভব হয়ে উঠল। তারপর যেদিন দুটি সুন্দরীর প্রেম-প্রতিযোগিতা মঞ্চের ওপর মল্লযুদ্ধে প্রকাশ পেল সেদিন অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল।

গ্যারিক হ্যামলেট নাটকটিকে যেমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন তেমনি তার ক্ষতিও করেছিলেন। কোন এক তরল মুহূর্তে তাঁর সেক্সপীয়রের ওপর কলম চালাতে ইচ্ছা হয়। সেই নয়া হ্যামলেটের অভিনয় কেউ না করলেও হ্যামলেট নাটককে ভাল করে লেখার চেষ্টা গ্যারিকের পরিশ্রমেই সুরু হল এবং ১৭৬০ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত নানারকমের হ্যামলেট নাটকের দেখা পাই। কখন তার মা নাই, কখন বন্ধু নাই, কখন বাপ নাই। একজন নাট্যকার, তো ফরটিনব্রাসকে নায়ক ও হ্যামলেটকে 'ভিলেন' করেও নাটক লিখে ফেললেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হেণ্ডারসন প্রথম অভিনয় করলেন হ্যামলেট্ চরিত্রে আর ১৭৮০তে জন কেম্বল সেক্সপীয়রকে পুনরায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন অর্থাৎ সেক্সপীয়রের রচনাকে পুরোপুরি তাঁর অভিনয়ে বজায় রাখলেন।

লণ্ডনের থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ যুগ এই সময় সুরু হল। কেম্বলের পর যে সব অভিনেতারা হ্যামলেটের অভিনয় করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই হ্যামলেট চরিত্রের ওপর তাঁদের নিজস্ব ছাপ রেখে গেছেন। কিন্তু কেম্বলের মতো সেক্সপীয়রের রচনাকে অবিকৃত রাখার ইচ্ছা তাঁদের ছিল না, যার ফলে তাঁরা প্রত্যেকে হ্যামলেট চরিত্রটিকে নিজের মনের মতো করে নিয়েছিলেন। একদিকে বিদ্বান ইয়াঙ্গ, প্রতিভাশালী কীন এবং মধুরকণ্ঠ চার্লস কেম্বল যেমন হ্যামলেট চরিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি কিয়ার্ণস এবং হিলিয়ার্ড হোয়াইটের হ্যামলেট চরিত্র মজার গল্প হয়ে আছে। হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় করতে করতে কিয়ার্ণস নাটকে সুরের অপ্রাচুর্য খুঁজে পেলেন। সেজন্য হ্যামলেটরূপী কিয়ার্ণস এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাবার সময় ব্যাগপাইপে একই সময় অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণভাবে দুটি সুরে আলাপ করতেন। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি স্বয়ং একটি গান রচনা করে সেইটে ওফেলিয়াকে দিয়ে গাওয়াতেন। শ্রীযুক্ত হোয়াইট হ্যামলেটকে চাষারূপে রূপারোপ করলেন এবং হ্যামলেট নাটককে বিশেষ করে চাষাদের নাটক এইটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হ্যামলেট নাটকের স্বাভাবিক অভিনয় চলা সত্ত্বেও একদল লোক মনে

করতে লাগলেন যে হ্যামলেট আসলে একটি কমিক নাটক এবং সেটিকে সেইভাবেই প্রযোজনা করা উচিত। তার ফলে দীর্ঘদিন ধরে আমরা নানা রকমের কমিক হ্যামলেটের খবর জানতে পারি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খ্যাতনামা অভিনেতৃগণও এই কমিক হ্যামলেটের রূপারোপ করেছেন। জনপ্রিয় অভিনেতার অভিনয়কে ব্যঙ্গ করার জন্যও অনেক সময় কমিক রীতিতে হ্যামলেট নাটকের অভিনয় হয়েছে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দেও এই কমিক হ্যামলেট অভিনয়ের ধারা অব্যাহত ছিল। আমেরিকার বিলি ব্রায়াণ্ট এই সময় দীর্ঘদিন যাবত হ্যামলেট নাটকের অভিনয় করিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি হ্যামলেট নাটকে যথেষ্ট চরিত্রের অভাব অনুভব করে ম্যাকবেথ নাটকের ডাইনীদের এবং মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস থেকে সাইলককে ধার নিয়েছিলেন। পাছে এত চেষ্টা করেও জনপ্রিয়তা কম হয়, তাই তিনি প্রচলিত সমকালীন গল্পের জনপ্রিয় কিছু চরিত্র যেমন—ব্যাটম্যান, ফ্যানটম্ ইত্যাদি সংযোজনা করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারা যায় যে, হাসি এবং ভয়াবহতাকে ক্রমান্বয়ে প্রতি দৃশ্যে বাড়িয়ে দিয়ে ব্রায়াণ্ট এক অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি করতেন এবং সেই আবহাওয়াকে অনুভব করবার জন্য দর্শকগণ বারবার এই অভিনয় দেখতে যেতেন।

যাঁরা স্যার হেনরি আরভিং-এর সঙ্গে জর্জ বার্ণাড শ'র দীর্ঘদিনের মনোমালিন্যের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে আরভিং-এর সঙ্গে শ-এর মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় সেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করে। হ্যামলেট চরিত্রটিকে নিজের মনের মতো করে প্রক্ষেপণের জন্য আরভিং নাটক থেকে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে দিতেন। শ' সমালোচনা করেছিলেন যে আরভিং হ্যামলেট চরিত্রের রূপায়ণ করতে পারেননি, হ্যামলেটকে জোর করে আরভিং চরিত্রে রূপায়িত করেছেন। সুতরাং আরভিং-এর অভিনয়ে সেক্সপীয়রের নাটক তার নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একথা বলা যায় না।

কেবলমাত্র খ্যাতনামা অভিনেতারাই নয়, বালক বালিকাগণ এবং অভিনেত্রীগণও হ্যামলেট চরিত্রে রূপারোপ করেছেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হেনরি চার্লস বেটি মাত্র ১২ বছর বয়সে ড্রুরিলেন থিয়েটারে হ্যামলেট ভূমিকায় অভিনয় করে সমস্ত ইংলণ্ডকে মাতাল করে দিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ ১২ বছর বয়স্ক এই অভিনেতার অভিনয়ে এমন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁকে গ্যারিকের সমকক্ষ অভিনেতা বলতে দ্বিধা করেননি। সমালোচকগণ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। দু'একজন সমালোচক বেটির অভিনয়ে ত্রুটি ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। সেকথা জানামাত্র তাঁদের ওপর জনসাধারণ হামলা করতে দ্বিধা করেনি। বেটির জনপ্রিয়তা কি প্রচণ্ড পাগলামির পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল তা আমরা জানতে পারি যখন দেখি ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট স্বয়ং বেটির অভিনয় দেখতে যাবার জন্য পার্লামেণ্ট মুলতুবী করার প্রস্তাব করেছেন! ইংলণ্ডের যুবরাজ কার্লটন হাউসে বেটিকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করে অত্যন্ত কৃতার্থবোধ করেছেন। ১৫ বছর বয়সে প্রচুর অর্থ এবং সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বেটি প্রবীণ অভিনেতার সম্মানে সম্মানিত হলেন। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বেটি অভিনয় করেছিলেন। তারপর শ্রীমান্ বেটি ৮৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও জীবনে আর কখনও অভিনয় করেননি। বেটির অভিনয়ের ধারা ধরে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ স্মিথ ৮ বছর বয়সে এবং ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পেইন ১৭ বছর বয়সে হ্যামলেট চরিত্রে রূপারোপ করেছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসী শ্রীমান্ জোসেফ বার্ক মাত্র ৭ বছর বয়সে সাইলক, রিচার্ড দি থার্ড এবং হ্যামলেট চরিত্রে প্রথম রূপারোপ করেছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে এই চরিত্রগুলিতে ইনি অভিনয় করেন এবং দৃশ্যান্তরের অবসরে হাসির গান করে এবং একক বেহালা বাজিয়ে দর্শকদের মোহিত করে রাখেন। পরিণত বয়সে বেহালা বাদক হিসেবে তাঁর কিছু খ্যাতিলাভ হলেও অভিনেতা হিসেবে তাঁকে আর দেখা যায়নি।

বেটির পরে যেসব বালক অভিনেতা হ্যামলেট চরিত্রে রূপারোপ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আর কেউই যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লারা ফিসার নামে একটি বালিকা অভিনয় প্রতিভায় এবং জনপ্রিয়তায় বেটির সমকক্ষ হয়েছিলেন বলা চলে। মাত্র ৬ বছর বয়সে ক্লারা নিয়মিত ড্রুরিলেন থিয়েটারে সাইলক ও জুলিয়েটের ভূমিকাভিনয় করতে সুরু করেন। পরিণত বয়সের আগে অর্থাৎ ১৭ বছর বয়স হবার আগে তিনি হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় করেননি। কিন্তু সেই অভিনয়ের জনপ্রিয়তা সম্ভবতঃ বেটিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং ম্যাক্স বীরভোম পর্যন্ত তাঁকে প্রশংসা করতে বাধ্য

হয়েছিলেন। ক্লারার জনপ্রিয়তায় হোটেল, রেসের ঘোড়া, জাহাজ, মদ এবং দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের উত্তরাধিকারীর নাম ক্লারা রাখা হবে কিনা তা নিয়েও দীর্ঘ আলোচনার সংবাদ পাওয়া যায়। অপরিণত বয়স্ক অভিনেত্রীদের মধ্যে একমাত্র ক্লারাই তাঁর এই জনপ্রিয়তাকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পেরেছিলেন এবং দীর্ঘকাল নাটক অভিনয় করে জনসাধারণকে আনন্দ দিয়েছিলেন।

হ্যামলেট চরিত্রে রূপ দিতে মহিলা অভিনেত্রীরাও পেছিয়ে থাকেননি। বিখ্যাত সিডন বংশের সারা সিডন ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামলেট চরিত্রে রূপ দেন। ড্রুরিলেন থিয়েটারে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জোয়ান পাওয়েল প্রথম লণ্ডনের দর্শকদের অভিবাদন জানালেন। মিসেস বার্টলি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাতে প্রথম মহিলা হ্যামলেটের সম্মানে ভূষিত হলেন। এই বছরই মার্চ মাসে তিনি ইংলণ্ডে হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়া গ্লোভার লণ্ডনে হ্যামলেট ভূমিকা অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এডমণ্ড কীন স্বয়ং তাঁর এই নারী প্রতিদ্বন্দ্বীর অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী ব্যাণ্ডম্যান-পামার হ্যামলেট চরিত্রে ১০০ রাত্রির বেশী অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন! এঁরা ছাড়া ১৭৮০তে মিসেস ইঞ্চবোল্ড, ১৮১৯এ মিসেস বার্ণেস, ১৮৩৯এ মিসেস শ' ও মিসেস ক্রহাম এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন বলে খবর পাওয়া যায়। শ্রীমতী শার্লট ক্যুসম্যান ও শ্রীমতী মারিয়ট যেদিন হ্যামলেট চরিত্রে মঞ্চে নেমেছিলেন সেদিনকার আবহাওয়া কল্পনা করা কঠিন নয়।

কিন্তু এই চরিত্রে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্যলাভ করেছেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী সারা বের্ণহার্ট। সেদিনকার অভিনয় দেখেছিলেন এমন একজন দর্শক আজও বেঁচে আছেন—তিনি হলেন এলেন টেরির পুত্র বিখ্যাত গর্ডন ক্রেগ। তাঁর আত্মজীবনীতে এই অভিনয়ের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, চালচলনে নারীসুলভ কোমলতাকে সম্পূর্ণ ঢাকতে না পারলেও বাচনে এবং অভিনয়ে যে অজাতশশ্রু ডেন রাজকুমারকে তিনি সৃষ্টি করলেন, অভিনয়ের শেষে তার জন্য চোখের জলে বুক ভেসে গিয়েছিল।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী এসমে বেরিঞ্জার ৬৪ বছর বয়সে হ্যামলেট চরিত্রে রূপারোপ করে আলোচনার তরঙ্গ তুলেছিলেন। সর্বশেষ মহিলা হ্যামলেট আমরা দেখেছি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন সিওভান ম্যাকেনা এই চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের দর্শকদের দীর্ঘদিন পর চমকে দিয়েছিলেন।

কারণ তখন হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় করা, অভিনয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে বিবেচিত হচ্ছে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেচার হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। তখন থেকেই হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় প্রত্যেক বৃটিশ অভিনেতার সম্মানের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়াল। গত একশ বছরের মধ্যে এমন একজন অভিনেতাও দেখা যাবে না যিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতার কৃতিত্ব দাবী করেছেন অথচ হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় করেননি। ম্যাকরেডি ও ব্যারী সালিভান (১০৫২), চার্লস কীন (১৮৫৮), হেনরি আরভিং (১৮৭৩) ফরবেশ রবার্টসন (১৮৯৭) কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম। ফরবেশ রবার্টসন আরভিংএর জীবদ্দশাতেই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হ্যামলেট সৃষ্টি করলেন। তাঁর হ্যামলেট আরভিংএর মত শান্ত, বিজ্ঞ, ধীরস্থির নয়—সে উদ্দাম, অসংযত। তার তারুণ্য তার চিন্তার খাঁচায় ডানা ঝাপটিয়ে মরে গেল, সে শব্দ তিনি দর্শকদের শোনাতে পেরেছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামলেট নাটক প্রথম সিনেমায় রূপায়িত হল এবং ফরবেশ রবার্টসন হ্যামলেট চরিত্রে রূপারোপ করলেন। এই সময় থেকেই হ্যামলেট অভিনয়ের আধুনিক যুগ সুরু হল বলা যেতে পারে।

আধুনিক যুগে হ্যামলেট নাটকের অভিনয় করে যারা অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁরা হলেন—স্ট্যাক (১৯১৬), থর্নডাইক (১৯ ৮), হোয়ারবারটন (১৯১০), মিলটন (১৯২৩), হলোওয়ে (১৯২৭), জন গিলগুড (১৯৩০ ও ৩৪), রবার্ট হ্যারিস (১৯৩২), ডনাল্ড উলফিট (১৯৩৬), লরেন্স অলিভিয়ার (১৯৩৭), এ্যালেক গিনেস (১৯৩৯), রবার্ট হেলপম্যান (১৯৪৪), মাইকেল রেডগ্রেভ (১৯৫০), রিচার্ড বারটন (১৯৫৩), এ্যালেন বেডেল (১৯৫৯), পল স্কোফিল্ড (১৯৬০), আইয়ান বানেন (১৯৬১), পিটার ও টুল (১৯৬৩) ও ডেভিড বারনার (১৯৬৬)।

এক নাগাড়ে অভিনয় চলাকে যদি শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের মান বলে ধরা যায় তাহলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি আরভিংএর ২১১ রাত্রির পর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন গিলগুডের ১৫৭ রাত্রি সর্বাপেক্ষা লম্বা হ্যামলেট অভিনয়।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামলেট দ্বিতীয়বার সিনেমায় রূপান্তরিত হয়। পরিচালনা ও প্রধান ভূমিকায় লরেন্স অলিভিয়ারের অপূর্ব অভিনয় দীর্ঘদিন মনে রাখার মত। এ ছাড়া জাপান, পোল্যাণ্ডে ও জার্মানীতে হ্যামলেট সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে। হ্যামলেট এমন একখানি নাটক যা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বার বার অভিনয় হয়েছে। আমেরিকার যৌক্তরাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত

থেকে উজবেকিস্থান, মস্কোর শীতের রাত্রি থেকে স্পেনের উত্তপ্ত সন্ধ্যায়, উত্তর নরওয়ের মধ্যরাত্রির সূর্য থেকে ইটালীয় সন্ধ্যার চন্দ্রের স্নিগ্ধতা এই অভিনয়ের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। পূর্বাঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে জাপান ও ভারতবর্ষে এবং সুদূর অষ্ট্রেলিয়াতে বার বার হ্যামলেট নাটকের অভিনয় হয়েছে।

আজকে ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ভূখণ্ডগুলিতে এমন কোন খ্যাতিমান অভিনেতা নেই যিনি জীবনে অন্ততঃ একবার এই ভূমিকায় অভিনয় করেননি। এমন খ্যাতিমান প্রযোজক দুর্লভ যিনি এই নাটকের প্রযোজনা করেননি। এছাড়া, রেডিও, টেলিভিশন ও রেকর্ডে সম্পূর্ণ হ্যামলেট অথবা তার অংশবিশেষ অগণিতবার অভিনীত হয়েছে।

সবশেষে তাই বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, মহাকবির স্মৃতি রক্ষার জন্য কারও ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। তাঁর কীর্তিরথ সগৌরবে চলেছে সমস্ত গণ্ডীকে অস্বীকার করে। চারশ' বছর পূর্ণ হল, আজও তাঁর নাটক, বিশেষ করে মৃত্যুর নাটক হ্যামলেট মৃত্যুকে উপেক্ষা করে অমরতা পেয়েছে।

ইউরোপের মুক্তাঙ্গন মঞ্চ পরিদর্শনে

১৯৫৮ সালের আগে পর্যন্ত মুক্তাঙ্গন মঞ্চ সম্পর্কে আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। ভাবতাম মুক্ত অঙ্গনে খানিকটা উঁচু জায়গাই বোধ হয় মুক্তাঙ্গনমঞ্চ আর যাত্রারীতিতে অভিনয়ই বোধ হয় মুক্তাঙ্গন মঞ্চের অভিনয়ের ধারা। মাঝে মাঝে বিদেশী পত্রপত্রিকায় মুক্তাঙ্গনমঞ্চ সম্পর্কে ছবি দেখতাম, কখন দু' একটা প্রবন্ধও পড়েছি। কিন্তু কোন সময়েই এই মঞ্চের সার্থকতা কিংবা সম্ভাবনা আমার চোখে বড় বলে মনে হয় নি। বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ ছিদ্রান্বেষণায় আর সবজান্তা আত্মতৃপ্তির মনোভাব নিয়ে ভাবতাম—এতো সাধারণ। মুক্ত অঙ্গনে অভিনয় হবে তার মধ্যে অসাধারণত্ব থাকতে পারে, বিশেষত্ব কি আছে? ইউরোপ ভ্রমণের সময় বিভিন্ন দেশের মঞ্চ ও অভিনয় দেখার ঔৎসুক্য ছিল এবং তা মেটাবারও যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু যেখানেই গিয়েছি সেখানেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মুক্তাঙ্গন মঞ্চের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মুক্তাঙ্গন মঞ্চে অভিনয় দেখতে দেখতে কবে যে আমি তার একজন প্রগাঢ় ভক্ত হয়ে উঠেছি নিজেই বুঝতে পারিনি। অন্ধের চোখে খোঁচা মেরে দৃষ্টি আনার মতো—আমার মোহ যে ঠিক কখন কাটল তা আজও জানিনা।

আজ আমি বিশ্বাস করি যে যদি বাঙলা দেশে অভিনয়কে সহজ করতে হয়—যদি নাটকের উন্নতি করতে হয়, যদি নাট্যাভিনয়কে লোকশিক্ষা ও জনসংযোগের কাজে লাগাতে হয় তাহলে মুক্তাঙ্গন মঞ্চ ছাড়া আমাদের গতি নাই। আজকের নাট্যাভিনয়ে মঞ্চ এক বিরাট সমস্যা। মঞ্চ কেবল পাওয়াই কঠিন নয় অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা। নূতন মঞ্চ তৈরী করা আকাশকুসুম কল্পনা। মঞ্চ উপস্থাপনার লোকের অভাব যেমন আছে, তেমনি আছে মঞ্চ তৈরী হবার জায়গার অভাব, আর্থিক দায়িত্ব নেবার ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের অভাব। এমনকি তিন চার শ আসনের মঞ্চগৃহ তৈরী হবার থেকে বাইবেলের সেই উটটির ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে চলে যাওয়া সহজ—একথা বলা বাহুল্য। এই জন্যে আজ আমি মনে করি, বাঙলার নাটকে সমাজের পক্ষে মুক্তাঙ্গন মঞ্চ তৈরী করে সেখানে অভিনয় করার কথা চিন্তা করা উচিত। যে কোন পার্ক বা খোলা জায়গায় উঁচু মঞ্চ করে অভিনয় করা যেমন ব্যয়ের দিক থেকে সহজ—তেমনি স্থায়ী মুক্তাঙ্গন তৈরী করার চেষ্টাও কণ্টকাকীর্ণ নয়। শৌভনিক

গোষ্ঠী সৃষ্ট মুক্তাঙ্গন মঞ্চ সম্ভবত এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁদের আমার অভিনন্দন জানাই। আমার মতে কলকাতা থেকে বহরমপুর পর্যন্ত বাংলাদেশের যে সক্রিয় নাট্যরসিক অঞ্চল আছে—তাতে অন্তত আটটি স্থায়ী মুক্তাঙ্গন মঞ্চ তৈরী হওয়া উচিত। মুক্তাঙ্গন মঞ্চের কথা বলতে গিয়ে সেখানে অভিনীত নাটক সম্পর্কেও অবহিত করতে চাই। ঘরের নাটক মুক্তাঙ্গনে করা দুঃসাধ্য নয়—কঠিন। মনটা স্বভাবতই দেয়ালের বেড়া ডিঙিয়ে গাছ ফুল আর ঘাসের সংস্পর্শ পেতে চাইবে। মুক্তাঙ্গন মঞ্চের নাটককেও তাই উপযোগী করা বাঞ্ছনীয়। আমি বিশ্বাস করি বাংলার নাট্যকারগণ ঘরের নাটকের ডাকে যেমন সাড়া দিয়েছেন—মুক্তাঙ্গনের নাটকের ডাকেও তেমনি সাড়া দেবেন। নাটকের অভাব মুক্তাঙ্গন মঞ্চের বিরোধিতা করবে না। একথা বলতে আমার দ্বিধা নাই।

এইবার নিবন্ধের নৈর্ব্যক্তিক অংশ সুরু করা যাক। আমার দেখা মুক্তাঙ্গন মঞ্চগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে বিবৃত করব।

১। আমার দেখা মঞ্চগুলির মধ্যে পম্পিয়াই সহরের মুক্তাঙ্গন মঞ্চটি সব থেকে পুরোন। দুই হাজার বছর আগে খ্রীষ্টের জন্মের অনেক পূর্বে ইটালীর পম্পিয়াই সহরের সঙ্গেই তার সৃষ্টি। যখন ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পিয়াই সহর ধ্বংস হয়ে গেল (78 A. D.) তখন এই মঞ্চটিও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর পম্পিয়াই সহরের সঙ্গে দীর্ঘকাল চলল অজ্ঞাতবাস, লোকচক্ষুর আড়ালে—লাভা আর মাটির স্তূপে ঢাকা ছিল মঞ্চটি দীর্ঘদিন। যখন মাটি খুঁড়ে এই অতীতের নিদর্শনকে বার করা হোল—তখন দেখা গেল যে যদিও মঞ্চটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিন্তু দর্শকের আসনগুলি অটুট আছে। মঞ্চের এই অবস্থা ক্রমে ইটালীর নাট্যরসিকদের এই মঞ্চে অভিনয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। ইটালীর গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহ দেখালেন। এখন প্রতিবছর বসন্তকালে দীর্ঘদিন ধরে এই মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় হয়। সাধারনত প্রাচীন গ্রীক রোমান নাট্যকারদের নাটক অভিনয় হয়ে থাকে। প্রাচীন নাট্যকারগণ এই পরিবেশকে অনুসরণ করেই নাট্যরচনা করেছিলেন—সুতরাং নাটক উপস্থাপনায় কোনরকম অসুবিধা হয় না। কোন দৃশ্যপট অবশ্য এখনও ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু আলোর নানা ব্যবহারে আর নানা রঙের আলোর ব্যবহারে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। অভিনেতাদের দিক থেকে মুখ তুললে আকাশ দেখা যায় না—দেখা যায় ভিসুভিয়াসের শান্ত স্থির রূপ—অভিনয় ও মঞ্চের প্রহরীর মতো ধীর গম্ভীর উদার। কল্পনা করতে ইচ্ছা করে

তবে কি নাট্যমঞ্চের অপমানেই সেদিনের ক্রোধরশ্মি, অগ্ন্যুৎপাত ? এই মঞ্চটি খাঁটি গ্রীক থিয়েটারের রীতিতে তৈরী হয়েছে। অর্দ্ধবৃত্তাকার পাথরের গ্যালারী ক্রমান্বয়ে ধাপের পর ধাপ উঠে গিয়েছে। আজও পুরাতনকালের মতন এই ধাপের ওপর বসেই অভিনয় দেখতে হয়—অন্য কোন রকমের আসনের ব্যবস্থা নাই। সব নীচের ধাপের মধ্যভাগ থেকে মঞ্চ প্রায় পনের ফিট দূরে। তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট উঁচু মঞ্চ ; চৌকো (rectangle) বারান্দার মতো অর্ধবৃত্তাকার আসন শ্রেণীর দুই কোণকে যোগ করেছে। মঞ্চটিও পাথরের তৈরী। নীচে খিলান করে তার ওপর মঞ্চভূমিকে তৈরী করা হয়েছে। মঞ্চের ওপর কতকগুলি থাম আছে—তার মধ্যে কয়েকটি ভেঙ্গে গেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে। এই থামগুলির পেছন থেকে আলো ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে—পুরানো প্রবেশপথগুলিকেই আসা যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। একমাত্র পেছনের দেওয়ালটিকে মেরামত করা হয়েছে এবং তার সামনে কাপড় অথবা ক্যানভাস জাতীয় কিছু এঁটে দেওয়া হয়েছে, আলোর প্রতিফলন ও শব্দের প্রসারের জন্য। সব থেকে আমার কাছে আশ্চর্য লাগল যে, কোনরকম যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়াই সমস্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। খোলা আকাশের নীচে দর্শকেরা বসেন—আকাশের চন্দ্রাতপই অভিনেতৃদের মাথার ওপরের একমাত্র আচ্ছাদন—তবু কোন সময়ে কণ্ঠস্বর শুনতে কোন অসুবিধা হয় না। এমনকি সব থেকে পেছনে বসেও চমৎকার শোনা যায়। অভিনয় সম্পর্কে দু' একটা কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। ইউরিপাইডিসের 'মিডিয়া' নাটকের অভিনয় হচ্ছিল রোমান ভাষায়। আমার কেবল গল্পটি জানা ছিল, ভাষার বিন্দুবিসর্গ বুঝিনি—কিন্তু তাতে নাটকের রসগ্রহণ করতে বাধা হয়নি। বিশেষ অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি এমনই সমতালে চলেছিল যে প্রতিটি মুহূর্ত বুঝতে পারছিলাম বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

২। এরপর যে মঞ্চটির কথা বলছি সেটি ডেনমার্কের কোপেনহেগেন সহরে অবস্থিত। এই মঞ্চটি দেখতেও যেমন অদ্ভুত—এখানে যে নাটক অভিনীত হয় তাও বিশেষত্ব পূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন চীন ও জাপানী স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য নিয়ে ইউরোপে মাতামাতি সুরু হয়েছিল তখনই টিভোলির (Tivoli) বাগানে এই মঞ্চ তৈরী হয়। মঞ্চটি দেখতে ঠিক একটি চীনের প্যাগোডার মতো কেবল সাধারণ দৃষ্টিতে নয়—বরং এ, অলংকরণে, প্রতিটি সূক্ষ্মকাজে চীনের একটুকরোই যেন নিয়ে আসা হয়েছে

মনে হয়। সামনের যে প্রধান পটখানি মঞ্চের ভেতরকে লোকচক্ষুর আড়াল করে দেয় সেটিও অপূর্ব। সেখানে যেন একটি ভারতীয় ময়ূর পেখম বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন তার বর্ণাঢ্যতা তেমনি তার রঙ্গিমা। বৌদ্ধ ধর্ম মন্দিরের মতো ঘণ্টা বাজে, একে একে আটবার। ময়ূরের পেখম দুপাশ দিয়ে নেমে যায় জাপানী পাখার মতো। যন্ত্রসঙ্গীত সুরু হয়—তার মাঝে ময়ূরের দেহ ধীরে ধীরে নীচে নেমে যায়—অভিনয় সুরু হয়।

স্টেজের ঠিক সামনের জমিটা একটু নীচু আর লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। কারণ এখানেই বাদকরা বসেন আর বাদকরাই এই অভিনয়ের প্রাণ। এখানে গত অর্দ্ধশতাব্দীর বেশী দিন ধরে একই রকমের অভিনয় হয়ে আসছে—আর সে অভিনয় হচ্ছে মূকাভিনয়। ফরাসী Classical মূকাভিনয়ের ধারা বহন করে চললেও—দীর্ঘ ব্যবহারে কতকগুলি বিশেষ স্থানীয় ধারা ঐতিহ্য হয়ে গেছে। সব থেকে আনন্দের বিষয় হচ্ছে যে এই মূকাভিনয়গুলি সাধারণত অপ্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের উপলক্ষ্য করে রচিত আর অভিনীত হয়। কিন্তু কলাকৌশলে, রস সৃষ্টিতে আর আঙ্গিকের উৎকর্ষে প্রাপ্ত বয়স্কদের কিছুমাত্র কম আনন্দ দেয় না। বস্তুত প্রাপ্ত বয়স্কদের ভীড়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাঁধে চড়ে অভিনয় দেখতে হয়। আজ এই মঞ্চ ডেনমার্ক এবং ইউরোপের সমাজ জীবনে স্থায়ী আসন নিয়েছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁদের জীবন স্মৃতি বলতে গিয়ে লেখেন 'আমার বাবার কাঁধে চড়ে যখন টিভোলীর নাট্যাভিনয় দেখলাম তখন আমার বয়স—'। ছোটদের বড়দের কাঁধে চড়ে দেখতেই হয়—কারণ কোন স্থায়ী দর্শক আসন নাই। মঞ্চের এবং বাদকদের সামনে খানিকটা চৌকা জায়গায় চেয়ার ও বেঞ্চ দিয়ে দেওয়া হয়—অভিনয় সুরু হবার আধ ঘণ্টা আগে। টিকিট করলে বসার আসন পাওয়া যায়। চেয়ার ও বেঞ্চ রাখার জায়গাটি স্টেজের দিকে ঢালু থাকায় পেছনের বেঞ্চ থেকে স্পষ্ট দেখা যায় সব কিছু। চেয়ারে বসার শুধু একটা নিয়ম--ছেলে-বুড়ো কেউ দাঁড়াতে পারবেনা। এই নিয়ম করতে হয়েছে এই কারণে যে বসে দেখার লোকের থেকে দাঁড়িয়ে দেখার লোক হয় অনেক বেশী। দাঁড়িয়ে দেখলে টিকিট লাগে না সুতরাং মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল ফুটবল খেলার দিন—ময়দানের উঁচু দিকটায় যেমন লোক দাঁড়ায়—তেমনি কাতারে কাতারে লোক দাঁড়ায় মূকাভিনয় দেখার জন্যে। ছোটদের আরাম করে দেখার পক্ষে বাপের কাঁধ ছাড়া উপায় কি?

মঞ্চটি মাটি থেকে প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু, দৈর্ঘে বাইশ ফুট আর উচ্চতায়

আঠারো ফুট। দুপাশের জায়গা এবং অলংকরণ ধরলে অবশ্য দৈর্ঘ প্রায় তিনগুণ আর উচ্চতা দু'গুণ হবে। মঞ্চ সম্পূর্ণভাবে ঢাকা। প্রসেনিয়ামের বেড়ায় আবদ্ধ পিকচার-ফ্রেম ষ্টেজ বলতে যা বোঝা হয় তাই। বাদক ও দর্শকদের আসন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত অঙ্গনে। এক একবার অভিনয়ের সময় একঘণ্টা থেকে দেড়ঘণ্টার ভেতর। গ্রীষ্মের ছুটি ও মেলার আবহাওয়ায় সন্ধ্যার পর থেকে তিন বা চার বার পর্যন্ত অভিনয় হয়ে থাকে। এই মঞ্চ পৃথিবীর ছোটদের এত প্রিয় হবার কারণ তার অপূর্ব পরিবেশ, মনোহরণ করা নাট্যবস্তু আর আঙ্গিকের চরম উন্নতি। ভাষা থাকেনা বলেই বোধ হয় এই রূপকথার আনন্দলোকে বিচরণ করতে ছোটরা আর ছোটদের বাবা, মা, আত্মীয় স্বজনরা এত ভালবাসে। সাধারণ সমতল মঞ্চ অথচ মুহূর্তের মধ্যে সেখানে সমুদ্র গর্জে উঠল—কাপড় কাচবার বড কাঠের গামলা ভাসিয়ে নায়ক একখানা গাছের ডাল নিয়ে হাল ধরে বসলেন। বজ্রপাত হোল। কাঠের গামলা মুহূর্তে হয়ে গেল বিরাট এক ময়ূরপঙ্খী নাও।

ডুবে গেল ময়ূরপঙ্খী জলের অতলে। নায়ককে ধরে নিয়ে আসা হোল জলদেবীর দরবারে। জলের তলায় পরিষ্কার দেখা যায়না বুদবুদ ভেসে ওপরে উঠে যায়। তারই মাঝে এক এক করে সাত দরজা খুলে যায়, দেখা যায় জলদেবীকে। নায়ক তাঁকে বিয়ে করবে না জেনে জলদেবী তাকে টুকরো করে কেটে ফেলার হুকুম দিলেন। মহিলা ও শিশুদের সমবেত চীৎকারের মধ্যে নায়ক ছয় টুকরো হয়ে গেলেন। দুটো টুকরো হাত আর পা ; দেহ আর মাথা। খোঁজ পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এলেন নায়িকা। নানা বিপদ কাটিয়া তিনি সমুদ্রের রাজা নেপচুনের স্মরণ নিলেন। নেপচুনের ইচ্ছামাত্র নায়কের ছয় টুকরো দেহ তাঁর কাছে এল। তিনি এক একটা অংশকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারতেই সেটা সেখানে লেগে থাকল—তারপর মুণ্ডটা ছুঁড়ে মারতেই জ্যান্ত নায়ক এগিয়ে এসে নায়িকার হাত ধরে নেপচুনকে অভিবাদন করলেন। ছোটদের সঙ্গে বড়রাও আনন্দ উল্লাসে হাততালি দিয়ে চীৎকার করে উঠল।

কল্পলোকের কথা তো বটেই। অসম্ভব, উদ্ভট সব স্বীকার করি। কিন্তু ছোটদের সঙ্গে এতগুলি বড়কে যারা এই রকম সম্পূর্ণভাবে ভোলাতে পারেন তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

৩। ডেনমার্কের আর একটি বিখ্যাত মুক্তাঙ্গন মঞ্চের কথা না বললে অন্যায় যেমন হবে তেমনি অন্যায় হবে টিভোলীর মুক্তাঙ্গনের সঙ্গে এর কোন রকম তুলনা করা। কেননা এই মুক্তাঙ্গন মঞ্চে অভিনয় আসর প্রতি বছর

বসে না আর যখন বসে মাত্র দুই থেকে তিনমাস হয় এটির স্থায়ীত্ব এবং প্রত্যের বছর একই নাটকের অভিনয় হয়।

বিশদ বিবরণে আসা যাক। প্রতি দুই বছর অন্তর এলসিনোরে রাজা হ্যামনেডের ক্রোনবার্গ প্রাসাদ দুর্গের প্রধান চত্বরে সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের অভিনয় হয়। বলা বাহুল্য ডেন রাজা হ্যামনেডই সেক্সপীয়রের হ্যামলেট। সাধারণত বিদেশী অভিনেতৃ সংঘকে আহ্বান করা হয় এই নাটক অভিনয় করার জন্য। তাঁরা এসে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে মুক্তাঙ্গন মঞ্চ তৈরী করে নেন। স্বভাবতই এই মঞ্চটি একটু উঁচু করা হয়—তা না হলে সমতল ভূমিতে রাখা আসনের পেছনেরগুলি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবে। আজ পর্যন্ত সেক্সপীয়রের নিজের দেশের লোকেরাই এখানে সব থেকে বেশীবার অভিনয় করেছেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এলসিনোরে ক্রোনবার্গ প্রাসাদ দুর্গে হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারার সম্মানকে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত অভিনেতারা হ্যামলেট অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে মনে করেন। স্যার জন গিলগুড, স্যার লরেন্স অলিভার, স্যার মাইকেল রেডগ্রেভ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। তাঁদের অভিনীত হ্যামলেটের কথা আজও ডেনমার্কের জনসাধারণ ভুলতে পারেনি।

৪। এইবার আসা যাক নাটকের খাসতালুক ইংল্যাণ্ডে। এখানে একাধিক মুক্তাঙ্গন মঞ্চ আছে। তবে প্রায় প্রতি মফস্বল সহরে অন্তত একটি করে মঞ্চগৃহ থাকার জন্য মুক্তাঙ্গনের ডাক স্বভাবতই সেখানে কম। কিন্তু অপেশাদার গোষ্ঠীগুলির উৎসাহে মুক্তাঙ্গনের অভিনয় ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনটি মুক্তাঙ্গনমঞ্চ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রথমটি খাস লণ্ডন সহরের বুকের ওপর—নাম রিজেণ্ট পার্ক ওপেন এয়ার থিয়েটার। এখানে নিয়মিতভাবে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে অভিনয় হয়। আমাদের কলকাতার ইডেন গার্ডেনে যদি মুক্তাঙ্গনমঞ্চ থাকতো তাহলে যেরকম লাগতো রিজেণ্ট পার্কের মঞ্চটিকেও সেই রকম লাগে। উঁচু বেড়া আর গাছপালায় চওড়া বন্ধন দিয়ে মঞ্চ আর তার সামনে ঢালু পাকা চত্বরটিকে সম্পূর্ণভাবে আড়াল করা হয়েছে। চৌকো মঞ্চটা তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট উঁচু। পেছনে যদিও সিমেণ্টের দেওয়াল আছে কণ্ঠক্ষেপের সুবিধার জন্য—কিন্তু তার সামনের লতাপাতা ও বৃক্ষজাল এমনভাবে সেটাকে ঢেকে রেখেছে যে লক্ষ্য না করলে দেখা যায় না। কাঠের তৈরী দৃশ্যসজ্জা ব্যবহার করা হয় প্রয়োজন অনুসারে। সামনের সিমেণ্টের চত্বরটি সামনের দিকে ঢালু—

যাতে পেছনের দর্শকের দেখতে অসুবিধা না হয়। টিকিটের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে চত্তরটিতে দাগ দেওয়া আছে। টিকিট কাটার সঙ্গে সঙ্গে ভাজ করা চেয়ার পাওয়া যায়। চত্তরের নির্দিষ্ট বন্ধনীর মধ্যে সেই চেয়ার পেতে বসতে হয়।

প্রায় এই একই ব্যবস্থা দেখেছি সুইডেনের স্টকহল্‌ম্‌ শহরের স্ক্যানসেন পার্কের মুক্তাঙ্গনমঞ্চে। একমাত্র তফাতের মধ্যে পেছনের দেওয়ালটি সাপের ফণার মতো স্টেজের মাথার ওপর বিস্তারিত হয়ে থাকে। আমি যখন দেখেছি তখন সেখানে যন্ত্রসঙ্গীতের আসর বসেছিল—সুতরাং নাটকের আসর কেমন দেখতে হয় বলতে পারলাম না। তবে এখানে চত্তরটি রিজেন্ট পার্কের প্রায় তিনগুণ বড় আর মঞ্চটির উচ্চতাও প্রায় পাঁচ ফুট।

রিজেন্ট পার্কের মুক্তাঙ্গনে নাটক দেখেছি সেক্সপীয়রের 'এ মিডসামার নাইটস্‌ ড্রিম'। বেশীর ভাগ অপেশাদারের সঙ্গে কয়েকজন পেশাদার মিলে এই নাটকটি অভিনয় করেন। পরে ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন সহরের সুবিখ্যাত সেক্সপীয়র মেমোরিয়াল মঞ্চে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পেশাদার অভিনেতাগণের অভিনীত এই নাটকটি দেখার সুযোগও আমার হয়েছিল। কিন্তু সেক্সপীয়র মেমোরিয়াল থিয়েটারের পরিচালনায়, অভিনয়ে, আলোক সম্পাতে—স্টেজের কারুকার্যে শতগুণে নাটক উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বারে বারেই মনে হচ্ছিল রিজেণ্ট পার্কের মুক্তাঙ্গনের অভিনয়ে যে সত্য ছিল সেটা যেন এখানে নাই। সত্যি গাছ গাছড়ার ফাঁকে খোলা আকাশের নীচে—শত শত তারার সস্নেহ দৃষ্টির তলে বসে যে সত্যটা আপনা থেকেই আমাদের ভাবাবেগের মধ্যে মিশে যাচ্ছিল তা ওই ইটকাঠের বাড়ীর মধ্যে আরামে গদিয়ান হয়ে বসে পাইনি। বোধ হয় সেইদিন থেকেই মুক্তাঙ্গনকেই শ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম। তারপর চরম উপলব্ধি এল আরো কিছু পরে 'মিনাক থিয়েটারে'।

৫। মিনাক থিয়েটারের কথা বলার আগে সেক্সপীয়রের জন্মভূমির মুক্তাঙ্গন মঞ্চের কথা বলে নেওয়া যাক। এই মঞ্চের কথা বিশেষ করে বলতে চাই—কারণ যত মুক্তাঙ্গন মঞ্চ দেখেছি এটা তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। শুধু তাই নয়—একদল অপেশাদার তরুণ নাটুকেদল এইটির গঠন ও পরিচালনার জন্ত দায়ী। এঁদের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম যে এরা আশা করেন যে পাঁচ বছরের মধ্যে এখানে স্থায়ী মুক্তাঙ্গন মঞ্চ করতে পারবেন। এদের এখানকার কর্মপদ্ধতি হোল অ্যাভন নদীর পারে এবং ট্রিনিটি গীর্জার বিস্তীর্ণ পরিবেশ যেখানে সুরু হয়েছে সেখানে পার্কের খানিকটা অংশ তিন মাসের

জন্য প্রতি বছর বন্দোবস্ত নেওয়া। তারপর অ্যাভন নদীর দিকে কাঠের মঞ্চ তৈরী করান—যার সামনেটা কুড়ি ফুট আর পাশটা পঁচিশ ফুট। তার সামনে অর্দ্ধবৃত্তাকারে সার্কাসের গ্যালারী ভাড়া করে এনে বসান হয়। গ্যালারীর নিম্নতম ধাপ থাকে আলো বসাবার জন্য। গ্যালারীর তল থেকে আলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পরে চারিদিক অস্থায়ী বেড়া দিয়ে ঘিরে দেন। অ্যাভন নদী আর গীর্জার জন্য মাত্র দুইদিক বেড়া দিয়ে আটকালেই চলে। এরা প্রতি বছর তিনমাস ধরে নানা রকমের নাটক অভিনয় করেন। কোন নাটককেই ১৪ দিনের বেশী চালান হয় না। এদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রথমেই এই কথাটা মনে হোল—বারে! এতো আমরাও পারি। এইভাবে যদি মুক্তাঙ্গন মঞ্চ তৈরী করা হয়—তাহলে সেটা আর কঠিন কি? কাঠের মঞ্চ আর কাঠের গ্যালারী তৈরী করে মঞ্চের অভাব দূর করা কেবল খরচের দিক থেকে নয়, তৈরী করার দিক থেকেও সহজসাধ্য। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নির্বাচিত নাটক এই মঞ্চে অভিনয়ের যোগ্য হয়—যেন মঞ্চের জায়গাটা সুনির্বাচিত হয়। গাছে আর ফুলে, ঘাসের সবুজে আর আকাশের নীলে যেন অবাধ বন্ধুত্বের সুযোগ থাকে।

৬। এই বন্ধুত্ব যে কত নিবিড় হতে পারে তা দেখাবার জন্যে যে 'মিনাক থিয়েটার' অপেক্ষা করে বসেছিল তা মোটেই জানতে পারি নি। ঘটনাটাকে বিশদভাবে বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। কারণ 'মিনাক থিয়েটারের' সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার পক্ষে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

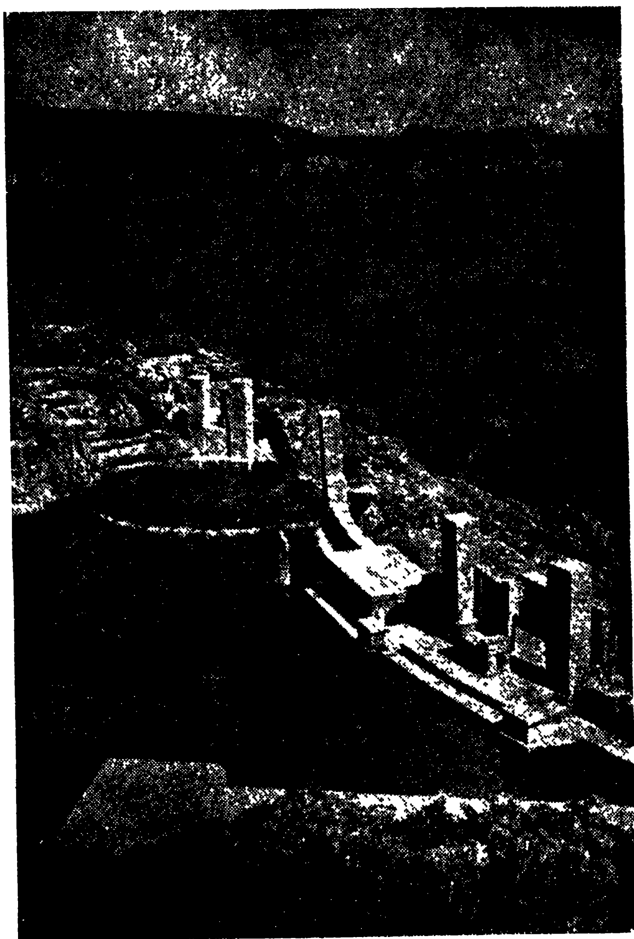
সুরুতেই আরম্ভ করি। মিনাক থিয়েটারের সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হোল তার দু'ঘণ্টা আগেও জানতাম না যে আমরা পরস্পরকে দেখতে পাব। নিজের কাজ উপলক্ষ্যে গিয়েছি ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে, কর্ণোয়ালের সীমানায় ক্যানবোর্ণ সহরে। সারাদিনের কাজের পর জমায়েত হওয়া গেছে টাইকস হোটেলের বিশ্রাম কক্ষে। একদিনের পরিচিতদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া চলেছে বহুদিনের পরিচিতের মতো। কখন আলোচনা থিয়েটারে চলে গিয়েছে লক্ষ্য করিনি। 'আপনি পোর্টো কর্ণোর থিয়েটার দেখেছেন?' প্রশ্ন করলেন বৃটিশ কাউন্সিলের স্থানীয় অধ্যক্ষ। আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করায় জানালেন—ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমতম প্রান্তে—যেখানে ইংল্যাণ্ড পাহাড়ে পাহাড়ে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে অতলান্তিকের জলে—সেইখানে শৈলশ্রেণীর মধ্যে তৈরী হয়েছে এক মুক্তাঙ্গন মঞ্চ ১৯৩২ সালে। স্থলের সীমায় জলের কোলে এই থিয়েটারই হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের প্রান্তিক—মিনাক থিয়েটার।

আজকের পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ যত মুক্তাঙ্গন মঞ্চ আছে তার মধ্যে মিনাক থিয়েটার অন্যতম। তার এত কাছে এসে পড়েছি তা জানতাম না। বৃটিশ কাউন্সিলের কর্মাধ্যক্ষ মহাশয় জানালেন যে আর দেড় ঘণ্টার মধ্যে অভিনয় সুরু হবার সময়, যাবার ইচ্ছা থাকলে তখুনি প্রস্তুত হতে হবে। প্রস্তুত হয়ে এলাম ওভারকোট সঙ্গে নিয়ে—কর্মাধ্যক্ষ মহাশয় ধীর স্থির ভাবে গিয়ে তাঁর মটরের সারথ্য গ্রহণ করলেন। গাড়ী চালাবার সঙ্গে সঙ্গে যা সুরু হলো তা যে কোন ডিটেকটিভ আর ডাকাতের গল্পের সিনেমায় দিব্যি জুড়ে দেওয়া যায়।

গাড়ীতে উঠে তিনি জানালেন সেখান থেকে মিনাক থিয়েটার ত্রিশ মাইলের কিছু বেশী পথ। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর গতি চড়চড় করে বেড়ে গেল। বাড়ীতে ঢুকলেন দৌড়ে। গাড়ীর ইঞ্জিন চালু রেখে। দৌড়ে নেমে এলেন স্ত্রীকে খবর দিয়ে—আর দু'খানা কম্বল নিয়ে। বন্ধুর বাড়ী এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নিলেন একটা খালি ফ্লাস্ক—এক ভোজন ঘর থেকে সেটাকে চায়ে পূর্ণ করলেন—কিনলেন এক প্যাকেট বিস্কুট। পূর্ণোদ্যমে গাড়ীকে ছুটতে দিয়ে জানালেন মিনাক থিয়েটারের কাছাকাছি কোন খাবারের জায়গা নাই। সহরে পথে প্রথম সন্ধ্যার জনতা, সহরের বাইরে আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ—কিছুই কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের গতি কমাতে পারল না। এক সময়ে হেসে বলে ফেললেন 'আমার থিয়েটার খুব ভাল লাগে। কিন্তু প্রাণ খুলে ক্ষ্যাপামো করার সঙ্গী পাই না।' সেই মুহূর্তে সেই পঞ্চাশোর্ধ ধীর স্থির ইংরেজ ভদ্রলোক আর বহুদূর সাগর পারের আমি বাঙ্গালী যেন একাত্ম হয়ে গেলাম। মনে হোল বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কল্পনা বোধ হয় শুধুই কবির কাব্যকুসুম নয়।

সমুদ্রের ধার ঘেঁসে পাহাড়ের বাঁক ঘুরে রাস্তা এসে থেমেছে পোর্টো কর্ণোর মিনাক থিয়েটারে। রাস্তাও সেই খানেই শেষ হয়েছে। মনে হয় পশ্চিম যাত্রার পথ যেন মিনাক থিয়েটারে নিয়ে এসে ফুরিয়ে গেল। তারপর শুধু জল আর জল—অতলান্তিকের ভালবাসা আছাড় খেয়ে পড়ছে—সংযুক্ত সাম্রাজ্যের ভূধর শ্রেণীতে। এখানেই গড়ে উঠেছে মিনাক থিয়েটার—পাহাড়ের শেষে জলের সীমায়। অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে থিয়েটারে বসে। পেছনের পশ্চাৎপটে দেখা যায় নীল সমুদ্রের নিঃসীম জলরাশি। পাছে এই বারি রাশি দেখে মন ঝিমিয়ে পড়ে—তাই বাঁদিক থেকে শৈলশ্রেণীর একটা স্কন্ধ নেমে এসেছে জলের ওপর। ঘাসের আস্তরণে তার মাথাটা সবুজ—লোনা জলের ঝাপটায় তলার খড়ি পাথরের সাদা রং নীল জলের ওপর অপরূপ শোভার সৃষ্টি করে।

পাহাড়ের কোল কেটে তৈরী করা হয়েছে দর্শকদের বসার আসন। ওপর থেকে নীচে ধাপের পর ধাপ নেমে গেছে। সেই ধাপের ওপর একটা কম্বল বিছিয়ে—আর একটা গায়ে জড়িয়ে দর্শকরা অপেক্ষামান। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত লাগে। সব তলের ধাপ থেকে অর্ধচক্রাকারে খানিকটা সমতল জায়গা—এইটাই মিনাক থিয়েটার মঞ্চ।



মঞ্চটি ঘাসের আস্তরণে ঢাকা। দুইপাশের পাহাড়ের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করা হয়নি। দৃশ্যসজ্জার জন্য তৈরী করা হয়েছে কিছু সিমেণ্টের ও সিমেণ্ট রঙের কাঠের ব্লক। বিভিন্ন নাটকের প্রয়োজনে সেগুলি বিভিন্নভাবে স্থাপনা

করা হয়। দর্শকের আসন থেকে মনে হয় এই ব্লকগুলি বুঝি পাহাড়ের শেষ সীমা—তার নীচে গভীর খাদ সোজা নেমে গেছে সমুদ্রের আলিঙ্গনে। অভিনেতৃরা নীচের থেকে উঠে আসেন সিঁড়ি বেয়ে। কথার ফাঁকে ফাঁকে স্তব্ধতা ভেঙে যায়, পাথরের ওপর ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দে। জোর বাতাস যেদিন বইতে সুরু করে—সেদিন পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে ওঠে এক অপূর্ব সোঁ সোঁ আওয়াজ।

স্থানীয় গ্রামের অপেশাদার দল এই মঞ্চের মালিক। প্রতি গ্রীষ্মে তাঁরা আহ্বান করে আনেন দেশের বিভিন্ন জায়গার অপেশাদার ও পেশাদার থিয়েটার দলকে। সেদিন আমরা দেখলাম ফরাসী নাট্যকার আন্দ্রে ওবের 'নোয়া' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ। অভিনয় করলেন কর্ণোয়ালের পেশাদার নাট্যসংস্থা। বাইবেলের 'নোয়ার' গল্প নাটকের বিষয়বস্তু। সব কিছু ভেসে গেল জলপ্লাবনে—কেবল নোয়া তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে জামাইদের নিয়ে উঠেছেন তাঁর বিরাট নৌকায়। সঙ্গে নিয়েছেন বিভিন্ন রকমের জীবজন্তু ও পশুপাখী। অসীমজলে 'নোয়ার' বিচরণ—সেখানকার মানুষ ও জানোয়ারের বিরোধ আর স্থল খুঁজে পাবার পর মানুষের সুনিয়মিত চরম কৃতঘ্নতা নাটকের বিষয়বস্তু। জানোয়াররা তাদের স্বভাবসিদ্ধ আন্তজ্যে উপকারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নোয়া আর তার স্ত্রীর নূতন জগতের মূল্যায়নে নাটক শেষ হয়েছে। শিল্পগোষ্ঠী অভিনয়ে কোন ভয়ঙ্কর কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নাই। একমাত্র নোয়া এবং তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা অভিনয়কে প্রথম শ্রেণীর বলতেও দ্বিধা হবে। অথচ সমগ্র প্রযোজনায় একটা অপূর্ব রূপ দেখতে পেয়েছি। নাটকের বক্তব্য অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আমাদের মনে গেঁথে গেছে। এক শাশ্বত সত্যের প্রতিষ্ঠায় মন আপ্লুত আর বিভোর হয়ে যায়।

কেন এমন হয়, এ প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজতে দূরে যেতে হবে না। আমরা যখন অভিনয় করি তখন কি করি? আমরা দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাত করে নাটকের আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করি। তারপর হাবে ভাবে, ভাষায় অভিনয়ে সেই (illusion) মায়াসৃষ্টিকে একটা কায়েমী রূপ দিতে চাই। কিন্তু যেই আলো জলে ওঠে, বিশ্রামের সময় আসে, সেই মায়ালোক ভেঙে যায়। আবার তাকে সৃষ্টি করতে রূপ দিতে আমরা প্রয়াস করি। কিন্তু এই মিনাক থিয়েটারে সেই আবহাওয়া আপনা থেকেই তৈরী হয়ে আছে। জলরাশিকে আঁকতেও হয়না—কল্পনাও করতে হয়না—সমস্ত জ্ঞান দিয়ে অনুভব

করা যায়। মাথার ওপরে অসীম আকাশ—প্রথমরাত্রের তারায় তারায় ভাস্বর, পাহাড়ের সাদা রঙ—জলের শব্দ, বাতাসের গান সবে মিলে নোয়ার জীবনের ব্যথাকে তার প্রাণের ভাষাকে মূর্ত করে তোলে। পৃথিবীর এই কোণে আবাশ মাটি আর জলের সঙ্গমে বসে নোয়ার জীবন জিজ্ঞাসাকে একান্ত সহজ, একান্ত স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে দ্বিধা হয়না। যে আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যে ঘরের স্টেজে মাথা খুঁড়ে মরি এখানে সেই আবহাওয়া, নাটকের আবহাওয়া আপনা থেকেই স্বাভাবিকভাবে বিরাজ করছে। নাটক শুরুর জন্যে অপেক্ষা করার সময়—সেই আবহাওয়াতেই নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছি—বিরামের সময় সেই আবহাওয়াতেই বিশ্রাম নিচ্ছি। পাহাড়ের গুহায় থাকা কতকগুলো অদেহী আত্মার মতো আমরা যেন ওপর থেকে সত্যিকারের নোয়ার জীবন আলেখ্য দেখলাম। তার আনন্দে হাসলাম—তার দুঃখে বিগলিত হয়ে গেলাম। এই যে সত্য সৃষ্টি—এই তো নাটকের মূল কথা। আর সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে অভিনয়ের উৎকর্ষের থেকেও নাটকের প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করা কতো বেশী প্রয়োজন সেদিন পোটাকর্ণোর মিনাক থিয়েটারে বসে শিখলাম। যখন নোয়া বিশাল বারিধিতে হারিয়ে গেলেন তার সঙ্গে আমরাও হারিয়ে গেলাম। প্রথম মাটি দেখে যখন আনন্দিত হয়ে উঠলেন আমরাও যেন প্রথম মাটি দেখতে পেলাম। তারপর সেই মাটিতে যখন তার সন্তানরা ভেদ হিংসা আর দ্বেষের বীজ বপন করলেন নোয়ার সঙ্গে আমরাও যেন সমকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম—ভগবান, এই জন্যেই কি পৃথিবীকে বাঁচালে ?

ফেরার পথে আমরা উভয়ে নির্বাক। বাঁকাচোরা পথে আলোর সুতীব্র দৃষ্টি সুরঙ্গ কেটে চলেছে। আমার সঙ্গী অপরাধীর মতো বললেন কিছু মনে করবেন না—আজকের রাতটা আপনাকে চা আর বিস্কুট খেয়েই কাটাতে হোল। তবে আজকের এই অভিজ্ঞতার দাম আমার জীবনে একটা ডিনারের থেকে বহুগুণে বেশী। উভয়ে নিঃশব্দে পিঠচাপড়ে করমর্দন করলাম। আমার বাসস্থানে আমাকে নামিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম ধীরগতিতে প্রাত্যহিক জীবনের তালে তাঁর গাড়ী রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কয়েকটি যবনিকাপাতের কাহিনী

অভিনয়ের শেষে যবনিকাপাত হয় একথা আমরা সবাই জানি। ইউরোপের নানা দেশে যবনিকাপাতের পরে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের দর্শকদের অভিবাদন জানাবার রীতি প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে আর একটি বিশিষ্ট নিয়ম দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে। সে'টি হোল কোন নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয়ের শেষে দর্শকগণ নাট্যকারকে দেখতে চান। যবনিকা উঠে যায়, নাট্যকার আসেন। দর্শকগণ হর্ষধ্বনি করে নাট্যকারকে অভিনন্দন জানান—নাট্যকার কখনো কখনো ভাষণ দেন—এইভাবে সেদিনকার অনুষ্ঠানে শেষ যবনিকা নেমে আসে। নাটক খারাপ হলে সাধারণত দর্শকরা নাট্যকারকে দেখতে চান না—তবে এ বিষয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই।



জর্জ আলেকজাণ্ডার

আজকে যে কয়টি কাহিনীর অবতারণা করা হবে তার সবগুলিই ঘটেছিল অধুনালুপ্ত সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারে। ঘটনাগুলির নায়ক আলাদা হলেও পার্শ্বচরিত্রে একজনকেই বারবার দেখা যাবে। তাঁর নাম হোল জর্জ আলেকজাণ্ডার। তিনি একধারে সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারের ম্যানেজার এবং প্রধান অভিনেতা ছিলেন। তাঁকে বলা হোত থিয়েটার জগতের শ্রেষ্ঠ ভদ্রলোক। হেনরী আরভিং এবং উইলিয়াম কেণ্ডালের জীবদ্দশায় এটা সহজ সম্মান ছিল

না। অভিনয়েও তাঁর সুনাম ছিল। অভিনয় করে রাজসম্মানে প্রথম ভূষিত হন স্যার হেনরী আরভিং তার পরে স্যার জর্জ আলেকজাণ্ডার।

নাট্যরসিকদের কাছে আলেকজাণ্ডারের দান আরভিংকেও ছাপিয়ে যায় একথা বলতে দ্বিধা বোধ করি না। ইংলণ্ডের নাট্যগৃহে জর্জ আলেকজাণ্ডার প্রথম সুস্থ আবহাওয়ার সৃষ্টি করলেন। অভিনেতাগণ যে আগে ভদ্রলোক ও পরে অভিনেতা এই সত্য আলেকজাণ্ডার কেবল প্রচলন করেই ক্ষান্ত থাকলেন না, তাঁর থিয়েটারে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন। অত্যন্ত দুর্দমনীয় অভিনেতাও সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারে এসে ভদ্রভাবে থাকতেন।

আলেকজাণ্ডার সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারের ভার নেন ১০৯০ খ্রীষ্টাব্দে এবং আমৃত্যু (১৯১৮) এই নাট্যগৃহটির পরিচালনা করেন। সব থেকে আশ্চর্য বিষয় যে, যখন কোন নাট্যগৃহই এক বছরও লাভের সঙ্গে চলছে না তখন সেণ্ট জেমস্ থিয়েটার বছরের পর বছর লাভ দেখিয়ে চলেছিল—বস্তুত আলেক-জাণ্ডারের মৃত্যুর বছর—(সেটাই প্রথম মহাযুদ্ধেরও শেষ বছর) ছাড়া কখনও লোকসান হয় নাই।

আলেকজাণ্ডারের চরিত্রের আর একদিক হোল তিনি একটা নির্দিষ্ট মতবাদে নাটক নির্বাচন করতেন। ইংরেজী নাট্য সাহিত্যের তখন ঘোর দুর্দিন। নাট্যসাহিত্য দুষিত পঙ্কপল্বলে নিমজ্জিত—নাট্যকারগণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে আপন আপন স্বার্থ চিন্তায় মগ্ন। ইংলণ্ডের মঞ্চে চলছে বিদেশী নাটকের অনুবাদ। সস্তা ফরাসী প্রহসনে ছেয়ে গেছে দেশ। সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারে এসেই আলেকজাণ্ডার ঘোষণা করলেন যে, অন্তত এই একটি মঞ্চে কেবল ইংরেজ নাট্যকারের নাটক অভিনীত হবে। এ কথা তিনি আমৃত্যু রেখেছিলেন। ২৮ বছরের মঞ্চ প্রযোজনায় তিনি ৯২টি পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় করান তার মধ্যে মাত্র ৬টি বিদেশী নাট্যকারের রচনা।

আলেকজাণ্ডারের নাম নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কেন না সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আধুনিক কালকে (বা বিংশ শতাব্দীকে) তিনি নিয়ে এলেন প্রথম এই সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারে। পৃথিবীর সর্বত্র যখন চলছে পুরাতন পন্থার চর্বিত চর্বণ, সমসাময়িককাল, সমসাময়িক চিন্তাধারা থাকছে অবজ্ঞাত, তখন জর্জ আলেকজাণ্ডার দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের নাটুকে সমাজ সবিস্ময়ে শুনলেন যে, অস্কার ওয়াইল্ড নামে এক নবীন নাট্যকারের নাটক সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারে অভিনীত হবে। বলা বাহুল্য অস্কার ওয়াইল্ড তখন মোটেই অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। সমাজের

উচ্চ পর্যায়ে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর উল্কার গতিতে বিচরণ তখন সকলকেই উত্তেজিত ও বিস্মিত করেছিল। অস্কার ওয়াইল্ডকে নাটক লিখতে রাজী করান যেমন আলেকজাণ্ডারের কৃতিত্ব তেমনি নিত্য তাগিদ দিয়ে এবং নানা আলোচনা, মনোমালিন্য এবং বিতণ্ডার ভেতর দিয়ে সেই নাটক শেষ করান এবং অভিনয় করাও তাঁর কৃতিত্ব। 'লেডী উইণ্ডামিয়ারস্ ফ্যান' অভিনীত হোল ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯২। বিংশ শতাব্দীর প্রথম নাট্যকার রূপে দেখা দিলেন অস্কার ওয়াইল্ড—জর্জ আলেকজাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হলেন সম্মানের সিংহাসনে।

সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারে চলল নানা রকমের নূতন নাটক। অভিনীত হোল জর্জ বার্নার্ড শ'র 'মিসেস ওয়ারেনস্ প্রফেসন' এবং ইবসেনের 'গোস্টে'র অনুবাদ। কিন্তু এই দু'টি নাটকের কোনটিই তেমন জনপ্রিয় হল না। বার্নার্ড শ' এবং ইবসেনের নাটক দু'টি সম্পর্কে সুতীব্র বিরূপ সমালোচনা হোল। জর্জ আলেকজাণ্ডার প্রমাদ গণলেন। বছরে অন্তত একখানা নাটক জনপ্রিয় না হলে লোকসান বন্ধ করা কঠিন। আলেকজাণ্ডার প্রবীণ নাট্যকার পিনারোর দ্বারস্থ হয়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন 'রিপ ভ্যান উইঙ্কলে'র নাট্যরূপ দেবার জন্য। পিনারো নাট্যরূপ দিতে অস্বীকার করলেন। আগিয়ে দিলেন নিজের একখানি নাটক 'দি সেকেণ্ড মিসেস ট্যানকোয়েরী'। অগত্যা সেইটাই নিতে হোল আলেকজাণ্ডারকে। এই নাটকেও তাঁর প্রযোজক প্রতিভার স্ফুরণ হোল। নাম-ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তিনি আনলেন এক অখ্যাত অভিনেত্রী মিসেস প্যাটরিক্ ক্যাম্বেলকে। পিনারোর প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে দিয়েই অভিনয় করালেন। ১৮৯৩ সালের এক সন্ধ্যায় প্রথম নাটকটির অভিনয় সুরু হোল। প্রথম অঙ্কের পরই দর্শক হর্ষধ্বনির মধ্যে নাট্যকারকে দেখতে চাইলেন। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠলো, নাটক শেষে যখন পিনারো মঞ্চে দেখা দিলেন তখন আনন্দে দর্শককুল সেখান থেকে তাঁকে ঘাড়ে করে পথে বার হয় আর কি! পথে পথে সারারাত্রি চলল এই নাটকের আলোচনা। লণ্ডনের অধিবাসী বোধ হয় সে রাত্রে ঘুমুতে ভুলে গেল। এমন নাটক তারা নাকি জীবনে দেখে নি। এইভাবে বিশ শতাব্দীর নাটক কায়েমী প্রতিষ্ঠা পেল। সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারের জীবনেও এমন রাত্রি আর আসেনি।

আমেরিকান লেখক হেনরি জেমস্ তখন লণ্ডনে। অপূর্ব মিষ্টি ভাষার অধিকারী জেমস্ গল্প ও উপন্যাস লিখে বেশ সুনাম করেছেন। আজকেও

জেমসের ভাষার মাধুর্য যে কোন সাহিত্য রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জেমসের দুর্বলতা ছিল যে তিনি নাট্যকার হবেন এবং প্রধানত সেই কারণেই তিনি লণ্ডন সহরে বসবাস করেছিলেন। অনেক নাটক তিনি লিখলেন—কিন্তু একটাও সমাদৃত হোল না। আজকে ভেবে আশ্চর্য হই যে, যার গল্পের নাট্যরূপে চমৎকার নাটক হয়েছে তিনি নিজে নাট্যরচনায় অপারগ হলেন কেন? হেনরি জেমসের গল্পের নাট্যরূপ 'এয়ারেস' বা 'এ্যাস্পার্ণ পেপার্স' আজকের সুপ্রসিদ্ধ নাটক কিন্তু 'গাই ডমভিলে'র নামও কেউ শোনে নি। জর্জ আলেকজাণ্ডারও বিশ্বাস করেছিলেন যে কোথাও না কোথাও হেনরি জেমসের নাট্যপ্রতিভা লুকিয়ে আছে। তাই আগেকার অসাফল্যকে উপেক্ষা করে তিনি 'গাই ডমভিল' অভিনয় করলেন ১৮৯৪ সালের এক শীতের সন্ধ্যায়। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। স্যাটারডে রিভিউ পত্রিকার নাট্যসমালোচক হিসেবে জর্জ বার্নার্ড শ' প্রথম এসেছেন সেদিন। আরও উপস্থিত হয়েছেন পলমল গেজেট পত্রিকার নাট্যসমালোচক এইচ, জি, ওয়েলস। নাটক সুরু হোল। জর্জ আলেকজাণ্ডার নট হিসাবে অনুভব করছেন নাটক জমছে না। নাটকের শেষে সামান্য গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে যবনিকাপাত হোল। ডাক উঠল—'author, author'.

তড়িৎপদে হেনরি জেমস্ মঞ্চে উঠে এলেন। মাথায় টাক, কালো দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখ। ক্ষীণদৃষ্টি নাট্যকারকে দেখে গুঞ্জনধ্বনি নিস্তব্ধ হোল—কিন্তু পরমুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ল শত তরঙ্গ কল্লোলে। চারিদিক থেকে সুতীব্র ভাষায় গালাগাল বর্ষিত হতে থাকল। গ্যালারী থেকে সমানে আসতে লাগল নানারকম জান্তব আওয়াজ এবং উপহাসের ধ্বনি। সে যেন এক দক্ষযজ্ঞের তাণ্ডব নর্তন। জর্জ আলেকজাণ্ডার ছুটে এলেন মঞ্চের ওপর। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই গ্যালারী থেকে বলে উঠল,—'তোমার কোন দোষ নাই কত্তা। নাটকটা যাচ্ছেতাই।'

এই যুগের তিনজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এই ঘটনার যে বিবরণ রেখে গেছেন—নাট্য সমালোচনার ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয়। হেনরি জেমস্ সেদিন কিছু বলতে পারেন নি। কিন্তু বাড়ী ফিরে ভাইকে চিঠি লিখেছিলেন আমেরিকায়। তিনি লিখলেন: 'ওইখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হোল সভ্যতার সমস্ত শক্তি সমন্বয় সমুদ্রের মতো ফুলে ফেঁপে উঠে আমার ওপর ভেঙ্গে পড়ল—আমি অদৃশ্য হলাম।' এরপর তিনি আর কখনও নাটক লেখেন নাই।

'গাই ডমভিলের' অসাফল্য বহু নাট্যকারকে ভয় পাইয়ে দিল। উপন্যাসিক

না দেখে আলেকজাণ্ডার ছুটলেন অস্কার ওয়াইল্ডের কাছে। অস্কার ওয়াইল্ড নিদারুণ অর্থকষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য একমাসের মধ্যে লিখে দিলেন একটি নাটক। 'দি ইম্পর্টেন্স অফ বিয়িং আরনেষ্ট।' নাটক মহলায় ফেলে আলেকজাণ্ডার বার বার ওয়াইল্ডকে অনুরোধ করলেন কিছু রদবদল করে দেবার জন্যে। নাট্যকার তার উত্তরে লিখে দিলেন : 'ও নাটক তোমার—তুমি দাম দিয়ে কিনেছ সুতরাং যা ইচ্ছা তুমি করতে পার।'

আলেকজাণ্ডার অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। 'গাই ডমভিলের' কথা স্মরণ করে জনৈক রিপোর্টার একদিন অস্কার ওয়াইল্ডকে প্রশ্ন করে বসলেন : 'নাটকটি সাফল্যলাভ করবে কি না?' ওয়াইল্ড তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে উত্তর দিলেন : 'নাটকের সফলতা তো স্থির হয়েই আছে—কারণ আমি লিখেছি—তবে প্রথম রাত্রের দর্শকরা সফল-দর্শক নাও হতে পারেন।'

১৮৯৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী নাটকটির প্রথম অভিনয় হোল। দর্শকরা আনন্দে হাততালি দিতে দিতে হাত লাল করে ফেললেন। নাট্যকার ওয়াইল্ড ও প্রধান অভিনেতা আলেকজাণ্ডার নাটকের শেষে নিঃশব্দে অভিবাদন জানালেন দর্শকদের। যবনিকাপাত হোল। আনন্দে আলেকজাণ্ডার প্রায় নৃত্য করে বলে উঠলেন : 'কি অস্কার আমি বলি নাই, তুমি হলে জাত-নাট্যকার!' অস্কার ওয়াইল্ড মৃদু হেসে ঠোঁটের কোণা থেকে সিগারেটটা না নামিয়েই উত্তরে বললেন : 'ভাই অ্যালেক্স কিছুদিন আগে আমি একটি নাটক লিখেছিলাম—যার নামও দিয়েছিলাম 'দি ইম্পর্টেন্স অফ বিয়িং আরনেষ্ট'। তোমার এই চমৎকার নাটকখানা দেখে আমার সেটার কথা বারবারই মনে হচ্ছিল।'

কিন্তু সফলতা সত্ত্বেও এ নাটক বেশীদিন চলে নি। অস্কার ওয়াইল্ড অভিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের অনুরোধে অভিনয় বন্ধ করতে হয়। নীতির দায়ে নাট্যকার অভিযুক্ত হলে তার নাটককে ভাল বলা যায় কি?

শেষ যবনিকাপাতের কাহিনীর সময় কয়েক বছর পরে—১৮৯৮। জন অলিভার হবস্, গল্প ও উপন্যাস লিখে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁকে নাটক লিখতে অনুরোধ করলেন। হবসের নাটক 'অ্যামবাসাডর' অভিনীত হোল ২রা জুন ১৮৯৮। আলেকজাণ্ডার মনে করেন নাই এ নাটকটি দীর্ঘদিন চলবে। তবু নাট্যকারের প্রতি ন্যায়-পরায়ণতায় ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্রীকে এনেছিলেন। এইচ, বি, আরভিং, সি আব্রুরি স্মিথ, মিস ভ্যানবার্গ, মিস কে ডেভিস এবং স্বয়ং—

নানা ভূমিকায় নামলেন। নাটকের সাদাসিদে সোজা গল্প, চমৎকার অভিনয় এবং সুন্দর মঞ্চসজ্জা দর্শকদের অভিভূত করল। নাটক শেষ হবার আগেই আলেকজাণ্ডার অনুভব করলেন যে তিনি সোনাকে গিল্টি ভেবেছিলেন।

আনন্দে খুসীতে দর্শকরা নাট্যকারের দর্শন চাইল। একটি ফুলের তোড়াও ইতিমধ্যে নাট্যকারকে দেবার জন্যে সংগৃহীত হোল। যবনিকা উঠে গেল। গ্যালারী থেকে চীৎকার উঠল—'চমৎকার নাটক লিখেছ জন, বাহবা!'

একটু পরেই জর্জ আলেকজাণ্ডার এক মহিলার হাত ধরে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। সবিস্ময়ে দর্শকরা স্তব্ধ হয়ে গেলেন—আলপিন পড়লেও আওয়াজ পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ডার পরিচয় করিয়ে দিলেন নাট্যকার মিসেস পার্ল ক্রাইগীর সঙ্গে, যিনি জন অলিভার হবসের ছদ্মনামে লিখে থাকেন। দ্বিগুণ জোর হয়ে উঠল অভিনন্দনধ্বনি। আনন্দ ও খুসীর মধ্যে সেদিন রাত্রের যবনিকাপাত হোল।

অভিনেতা বার্নার্ড শ'

খ্যাতনামা নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ'র নাম অনেকে জানেন। কিন্তু তিনি যে একজন উৎসাহী অভিনেতা ছিলেন, একথা না-জানাই স্বাভাবিক। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তার পরবর্তীকালে অপেশাদারী নাট্যসংস্থাগুলি নতুন নাটকের ঢেউ তোলেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে প্রচলিত নাটকগুলি অত্যন্ত পুরাতনপন্থী এবং সংস্কারবিরোধী প্রমাণ করার জন্য অপেশাদার নাট্য-সংস্থাগুলি নাটক আলোচনার ব্যবস্থা করলেন, প্রবন্ধ লিখলেন, এবং নতুন নাটক অভিনয় করে দিকনির্দেশ করতে চাইলেন।

বার্নার্ড শ' এই আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। স্যার হেনরি আরভিংয়ের অভিনয় ক্ষমতা এবং নাটক নির্বাচন নিয়ে বার্নার্ড শ' যে তুফান তুলেছিলেন, তা আজ ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে গিয়েছে। হেনরি আরভিং সারাজীবনে শ'কে ক্ষমা করতে পারেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই দুই মনীষীর মধ্যে এই বিভেদের প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও উভয়কে একই সঙ্গে সমভাবে ভালবেসেছিলেন অভিনেত্রী এলেন টেরী। তিনি এই দুই প্রতিভার সমন্বয়ে প্রচুর সম্ভাবনা দেখেছিলেন। বহু চেষ্টা করেছিলেন তাঁর স্নেহরস-সিঞ্চিত এই দুই ব্যক্তিকে পরস্পরের আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য। সে অসাফল্য যেমন করুণ, তেমনি হতাশার। কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

১৮৮০ সনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পড়ার ঘরে কার্ল মার্ক্সের মেয়ে এলেনর মার্ক্সের সঙ্গে শ'য়ের আলাপ হয়। এলেনর তখন একজন উগ্র ইবসেনপন্থী। তিনিই শ'কে প্রথমে ইবসেনের লেখার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং এঁরই প্রচেষ্টায় ইবসেনের নাটকে শ' অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের স্মৃতিমন্থন করতে গিয়ে শ' বলেছেন—শ্রীমতী লর্ড ইবসেনের 'ডলস্ হাউস' অনুবাদ করলেন। সেটা পড়বার দিন আমার সমাজতন্ত্রী বন্ধুরা দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তখনি চরিত্র নির্বাচন হয়ে গেল। অভিনয়ের দিন ক্রোগস্টাড রূপী আমি পিছনের ড্রয়িংরুমে (সেটাই সেদিন সাজঘর হয়েছিল) বাদাম খেয়ে আর গল্প করে সময় কাটালাম। দরজার ওপাশে নোরা-রূপী এলেনর মার্ক্স ততক্ষণ হেলমারের অবস্থা কাহিল করে দিল।

উইলিয়ম মরিসের সোস্যালিষ্ট লীগে মাঝে মাঝে অপেশাদারীরা অভিনয় করতেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মরিস তাঁর মেয়েকে চিঠি লিখলেন যে, বার্নার্ড শ'

তাঁর লেখা 'ইণ্টারলিউড' নাটকে অভিনয় করতে রাজী হয়েছেন। এই অভিনয় সেই বছর ১৫ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছিল ক্যারিংটন রোডের হলে; কিন্তু শ' অভিনয় করেননি—যদিও তিনি সেখানে সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

একখানি বিজ্ঞাপন পাওয়া গিয়েছে যাতে ঘোষণা আছে: আগামী ৬ই নভেম্বর ১৮৮৬ এডোয়ার্ড রোসের লেখা 'টু সে দি লীস্ট অফ ইট' নাটকের অভিনয় হবে। পরিচালনা করবেন জে এবং এইচ নাথান। নভেল্টি থিয়েটারে অনুষ্ঠান হবে। নাটকে অংশ গ্রহণকারী যে পাঁচজনার নাম আছে তার মধ্যে দেখি চাব ডাম্বলটনের ভূমিকায় জি বার্নাড শ'। সহকর্মী ও বন্ধু রোজকে আর্থিক সাহায্য করার জন্যে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে।

১৮৯৭-এর আগে বার্নার্ড শ'র অভিনয়ের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। মধ্যবর্তী সময়ে তিনি কোন অভিনয় করেননি জোর করে বলা চলে না। তবে আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন সাক্ষ্য হস্তগত হয়নি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল, ভিক্টোরিয়া হলে বার্নার্ড শ'র 'ডেভিলস্ ডিসাইপিল' অভিনীত হয়। মুদ্রিত অনুষ্ঠানসূচীতে লেখা হয়েছে, রেভ রেণ্ড এণ্টনী অ্যাণ্ডারসনের ভূমিকায় ক্যাশেল বাইরন। বলা বাহুল্য এই ক্যাশেল বাইরন স্বয়ং জর্জ বার্নার্ড শ' ছাড়া আর কেউ নন। স্মরণ থাকতে পারে যে, তখন শ'-এর লেখা উপন্যাস 'ক্যাশেল বাইরনস প্রফেশন' কিছুদিন মাত্র প্রকাশিত হয়েছে।

শ' শেষ অভিনয় করেন ১৯০৮ এ। ২৮শে জানুয়ারি, স্যাভয় থিয়েটারে হারলে গ্র্যানভিল বারকারের রাজনৈতিক নাটক 'ওয়েস্ট'-এর অভিনয় হয়। বারকার নিজেকে শ'-এর শিষ্য বলে ঘোষণা করতেন, সুতরাং তাঁর এই নাটকে বার্নার্ড শ' অংশ গ্রহণ করলেন। অনেকে মনে করেন নাট্যবস্তু সংগঠন ও প্রচারপত্র লেখাতেও শ'-এর প্রভাব অনস্বীকার্য। তিনি স্বয়ং কলম ধরেছিলেন কি না যদিও বলা কঠিন, তবে কাছাকাছি ছিলেন অনুমান করা যায়। বার্নার্ডশ'-এর নামের তলায় লেখা হয় 'ডাবলিনের রয়্যাল থিয়েটারের ভূতপূর্ব অভিনেতা।'

এই বছরেই 'গেটিং ম্যারেড' নাটকে শ' বিডলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাটকের শেষে যে ছবি তোলা হয় তাতে তাঁকে বিডলের রূপসজ্জায় দেখা যায়।

এর পরে শ' সম্ভবত আর অভিনয় করেননি। কিন্তু অভিনয়ের শিক্ষা দান এবং নিজের কয়েকটি নাটক পরিচালনা করেন। স্যার লুই ক্যাসনের

কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে 'জন বুলস আদার আইল্যাণ্ড' নাটকে অভিনয় করার সময় শ'-এর পরিচালনক্ষমতায় উনি আশ্চর্য হয়ে যান। সারা জীবনে বার্নার্ড শ' ছয় সাতটির বেশী নাটক পরিচালনা করেননি। স্যার লুই অভিনেতা হিসাবে তাঁর সঙ্গে কাজ করে মনে করেন যে, অত্যন্ত অভিজ্ঞ পরিচালকের গুণাবলী তাঁর মধ্যে ছিল। স্যার লুই ক্যাসন (সিবিল থর্নডাইকের অভিনেতা স্বামী) আরও লিখেছেন যে, তিনি শ'এর অভিনয় কখনও দেখেননি; সুতরাং শ'-এর অভিনয় সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করতে চান না। তবে অভিনয়ের শিক্ষাদানের সময় যত অল্প আয়াসে, অল্প নড়াচড়ার ভিতর দিয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ভূমিকার নিখুঁত ও সূক্ষ্মরূপ চিত্রণ করতেন, অত্যন্ত দক্ষ শিল্পীর পক্ষেও সে-রকম করা দুরূহ। ক্যাসন মনে করেন যে, অভিনয়ে বার্নার্ড শ'এর এই চরিত্র-চিত্রণ সম্ভবত ক্ষণস্থায়ী হত অর্থাৎ সব সময়ে এই চিত্রণ সমভাবী হত না, তা না হলে অভিনয়ের এই অপূর্ব প্রতিভা নিয়ে শ' অভিনেতা হতেন, কখনই নাট্যকার হতেন না।

বার্নার্ড শ' নাটক পরিচালনা করার সময় সর্বদা দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতেন—কোন ঘটনা কেন হচ্ছে এবং কী করে হচ্ছে। তিনি প্রতি অভিনেতাকে এই দুই বিষয়ে সর্বদা অবহিত হবার জন্যে অনুরোধ করতেন। এবং এই দুই বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকবার জন্য বলতেন।

জর্জ বার্নার্ড শ' নাটকের জগতের এক মোহময় নাম। সেক্সপীয়রের সঙ্গে তাঁর যত মিল তত অমিল। তাঁর মত অভিনেতা-জীবনের অভিজ্ঞতা শ'য়ের নাট্যকার-জীবনে কাজে এসেছিল কি না জানা যায় না। তিনি অল্প যা অভিনয় করেছেন তা নাট্যমোদীর চয়নের বস্তু হলেও তার কোন বিশেষ প্রভাব তাঁর রচনায় পড়েছে বলে মনে হয় না। বস্তুত শ'-এর অভিনেতা-জীবন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। কিন্তু শ'এর ভেতর যে নাট্যপ্রতিভা ছিল এবং প্রয়োজন হলে তিনি যে সে-ক্ষমতার বিচ্ছুরণ করতে পারতেন, একথাও স্বচ্ছন্দে বলা যায়। তাহলে বার্নার্ড-শ' যথেষ্ট অভিনয় কেন করলেন না? এ প্রশ্নের উত্তর নাট্যকার-পত্নী শারলোটা শ' অত্যন্ত ভালভাবেই দিয়েছেন। উনি বলেছেন জীবনের এক ভূমিকা শেষ করেই জর্জ বার্নার্ড শ' অন্য ভূমিকা ধরতেন। 'সারাজীবন ধরেই সর্বক্ষণ শ' অভিনয় করে গিয়েছেন।'

একটি থিয়েটারের জীবনী

লণ্ডন শহরের উপকণ্ঠে ক্রয়ডন শহর, যেমন কলকাতার উপকণ্ঠে ব্যারাকপুর। কলকাতার মত লণ্ডন শহরও বেড়ে চলেছে, ক্রয়ডনও শহর-সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে লণ্ডনের অংশীভূক্ত হয়ে। গড়ে উঠতে শুরু করেছে বড় বড় অফিসবাড়ি, বারোতলা-তেরোতলা। গড়ে উঠছে বড় বড় রাস্তা, মস্ত কেনাবেচার বাড়ি, সেখানে দোকান আছে, বাজার আছে, আছে প্রসাধনের ঘর—আধুনিক রুচির পরাকাষ্ঠা। একালীন সভ্যতার সমারোহের সঙ্গে ক্রয়ডন পা ফেলে এগিয়ে গিয়েছে সমানতালে। ভেঙে পড়েছে পুরনো ঘর-বাড়ি, অদৃশ্য হয়েছে সেকালীন ছায়াঘেরা পার্ক। গ্রাম্য রাস্তার কোথাও স্ফীতি, কোথাও লুপ্তি ঘটেছে।

ক্রয়ডনে দুটি থিয়েটার ছিল—গ্র্যাণ্ড থিয়েটার ও ডেভিস থিয়েটার। তাদের বুকের ওপর দিয়ে চলে গেল আধুনিক সদর-রাস্তা, তারা সমভূমি হল। নিউমেটিক্ ড্রিল আর এয়ার ক্রমপ্রেশারের বিকট আওয়াজে ক্রয়ডন-বাসীর নাট্যপ্রীতিকেও চাপা দেওয়া হল। একদা নাট্যপিপাসু ক্রয়ডন সম্পূর্ণভাবে থিয়েটারহীন হয়ে গেল।

যাঁরা নাটক ভালবাসেন, তাঁরা স্বীকার করেছেন যে থিয়েটার-প্রীতি অমর। কোন বিশেষ জীবের সঙ্গে তুলনা করলে বলা চলে যে, সেই আদিম অ্যামিবার জাইগটের মতো অমর। যতদিন যায়, তার বংশবৃদ্ধি হয়—কিন্তু মৃত্যু হয় না। ক্রমবিকাশের অপূর্ব নিয়মে প্রতি জাইগট দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে দুইটি পূর্ণ জাইগট হয়ে সঞ্চরণ করে।

ক্রয়ডনের নাট্যপ্রীতিকেও তাই বেশীদিন চেপে রাখা গেল না। স্কট গিলবার্ট সাধারণের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিলেন। স্থানীয় রক্ষণশীল দলের মিলন-গৃহটি দুই বছরের জন্য লীজ নিয়ে সেখানে থিয়েটার ইন দি রাউণ্ড তৈরি করলেন। নামকরণ হল—পেমব্রোক থিয়েটার। কিন্তু পেমব্রোক থিয়েটারের দুর্ভাগ্যের তখনও কিছু বাকী ছিল। পুরনো ডেভিস থিয়েটারের আসবাবপত্র ও মঞ্চসামগ্রী গিলবার্ট কিনে নিয়েছিলেন। হলটা মেরামতের এবং থিয়েটার সদৃশ করার ভার দিয়েছিলেন একটা গৃহনির্মাণ কোম্পানির উপর। কিন্তু হঠাৎ অন্য জায়গায় কাজের চাপ বেশী পড়ায় শেষ মুহূর্তে এঁরা কাজ করতে পারবেন না বলে খবর দিলেন। মাসাধিক কাল দৌড়াদৌড়ি

করেও গিলবার্ট কোন কোম্পানিকেই পেমব্রোক থিয়েটারের ছোট্ট কাজ নিতে রাজী করাতে পারলেন না। সবাই ব্যস্ত. আধুনিক ক্রয়ডনকে গড়ে তোলার জন্যে। বিরাট ক্রেনগুলোর মতই তাদের মন তখন উন্মার্গী। সর্ব-ধ্বংসী বুলডোজারের মতই তাদের চিন্তা তখন শত শত পাউণ্ডকে তাদের পকেটের দিকে ঠেলে আনছে।

গিলবার্ট তখন ক্রয়ডনের অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিকে ডেকে পাঠালেন। দলে দলে ছেলেমেয়েরা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। নাটক অভিনয় না করে, নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে তাঁরা উঠে পড়ে লাগলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। জীন আর সোয়েটারের উপর ওভারঅল চাপিয়ে ছেলেমেয়েরা ইঁট বইছেন, মাচায় বসে বাড়ি মেরামত করছেন, হলের ভিতর গর্ত খুঁড়ে নতুন মঞ্চের ভিত্তিস্থাপন করছেন। সব থেকে ময়লা আর সব থেকে ব্যস্ত যে লোকটি, যাঁকে দেখলে মনে হয় অন্তত ইনি নিশ্চয় জাত মিস্ত্রি, তিনি হলেন স্বয়ং গিলবার্ট। কে বলবে, ইনি সেই ধোপদুরস্ত মিষ্টভাষী হাল্কা-গলার সদাহাস্যময় লোক! মনে হয় স্টেজে কখনও অভিনয় করবেন না বলে সে শখ এখনই মেটাচ্ছেন। প্রধান মিস্ত্রির ভূমিকায় এঁর হাঁকডাক শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত যে উনি জীবনে কখনও মিস্ত্রির কাজ করেননি।

প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কাজ চলল। দিনে যদি চব্বিশ ঘণ্টার বেশী সময় থাকত, তাহলে তখনও কাজ হত। উদ্দীপনার নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করল ক্রয়ডনের ছেলেমেয়েরা। অবশেষে পাঁচই অক্টোবর ১৯৫৯ দ্বারোদ্ঘাটন করল পেমব্রোক থিয়েটার Jean Anouilh-এর 'থিভ্স্ কার্নিভ্যাল' নাটক দিয়ে। দর্শকরা প্রথমরাতের অভিনয় দেখে যখন বাইরে যাচ্ছেন—লক্ষ্য করলেন বহু জায়গায় ছোট ছোট বিজ্ঞপ্তি টাঙানো রয়েছে—'কাঁচা রঙ। দয়া করিয়া হাত দিবেন না।'

পেমব্রোক থিয়েটার সবার ভালবাসা পেল। সমালোচকরা কেবল নাটক ও অভিনয়ের প্রশংসা করলেন না, পুরনো থিয়েটার দুটি ধ্বংসের অতি অল্প-কালের মধ্যে ক্রয়ডনবাসীকে একটি নতুন থিয়েটার উপহার দেবার জন্য গিল-বার্টকে ভূয়সী ধন্যবাদ জানালেন।

পেমব্রোক থিয়েটার গড়ে উঠল থিয়েটার-ইন দি রাউণ্ড হিসেবে। অর্থাৎ ঘরের মধ্যেখানে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার মঞ্চ উঁচু হয়ে জেগে রইল। চারপাশে পড়ল দর্শকদের আসন। অভিনেতাদের দর্শকদের মধ্যে দিয়ে আসা বন্ধ করার জন্যে—মঞ্চের তলায় গড়ে তোলা হল সাজঘর। নীচে থেকে অভিনেতারা

মঞ্চের ওপর উঠে আসবেন। প্রতিদিন ৪৫০ জন দর্শককে দেখাবার ব্যবস্থা হল। এবং স্থির করা হল চোদ্দ দিনের বেশী কোন নাটকের অভিনয় করা হবে না। বলা বাহুল্য, লণ্ডনের প্রচলিত নিয়মে রবিবার ছাড়া দৈনিক অভিনয়ের ব্যবস্থা হল এবং শনিবার ছাড়া আরও দু দিন দ্বিপ্রাহরিক অভিনয় হতে থাকল। চোদ্দ দিনে প্রতিটি নাটকের অভিনয় হতে লাগল বিশবার। গিলবার্ট দুঃসাহসিকতার আরও পরিচয় দিলেন। নাটক নির্বাচনেও সাধারণ পর্যায়কে বাদ দিয়ে বিশিষ্টতার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পেমব্রোক থিয়েটার কেবলমাত্র লণ্ডনের সাফল্যমণ্ডিত নাটক অভিনয় করে সন্তুষ্ট রইল না, সাতটি নতুন নাটক অভিনয় করল। বর্তমানে 'ইনহেরিট দি উইণ্ড' নামে যে নাটক সিনেমায় রূপান্তরিত হয়ে সকলের প্রশংসা পেয়েছে—ইংলণ্ডে পেমব্রোক থিয়েটারে তার প্রথম অভিনয় হয়, আর তখন থেকেই এই নাটকটি নাটকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নাট্যকার মেরি ব্যারিংটনের 'লোটাস ঈটারস', ক্যাটেভের 'কুইনটেট ইন এ ফ্ল্যাট', থিওডোর রীভ্সের 'ওয়েডিং ব্রেকফাস্ট' প্রভৃতি নাটকগুলির অভিনয়ও পেমব্রোক থিয়েটারেই প্রথম হয়। খ্যাত ও অখ্যাত নাট্যকারদের নাটক অভিনয় করে গিলবার্ট জনসাধারণের ভাল লাগার মানের এক নতুন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। আজ পেমব্রোক থিয়েটারের দর্শক কেবলমাত্র ক্রয়ডন থেকে আসে না, আসে ব্রাইটন থেকে, লণ্ডন থেকে—সারের দূরাগত অঞ্চলগুলি থেকে। ভাল নাটকের সুষ্ঠু অভিনয়ে পেমব্রোক থিয়েটার মাত্র কয়েক মাসে নিজের আসন গড়ে নিয়েছে, এটা কম শ্লাঘার কথা নয়। লণ্ডনের থিয়েটার মহলেও আজ পেমব্রোক থিয়েটারের বিশিষ্টতা স্বীকৃত হয়েছে। তাই কেবল ইংরেজই নয়, থিয়েটার-পাগল নানা-ভাষাভাষী, নানা-পোশাকাবৃত নানারঙের ও চামড়ায় ঢাকা বহু লোক পেমব্রোক থিয়েটার দেখতে আসেন।

কিন্তু সকলের এত আগ্রহ পেমব্রোক থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। গ্র্যাণ্ড ও ডেভিস থিয়েটার যে পথে গিয়েছে আর কয়েক মাসের মধ্যেই পেমব্রোক থিয়েটারকে সেই পথেই যেতে হবে। নতুন রাজপথ এগিয়ে আসছে, তার সামনে যা কিছু পড়ছে ধূলিসাৎ করা হচ্ছে। পেমব্রোক থিয়েটারের লক্ষ লক্ষ অনুগ্রাহী এই ক্রমবর্ধমান আধুনিকতার বিকাশকে বন্ধ করতে পারবে না। এই বছরে শীতকাল শুরু হবার আগেই পেমব্রোক থিয়েটার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেবল তার নামের আর কীর্তির স্মৃতি রূপকথার মত ঘুরে বেড়াবে।

আশার কথা এই যে, গিলবার্টের সমস্ত প্রচেষ্টা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে না। ক্রয়ডনের পৌরসভা নতুন শহরের পরিকল্পনার মধ্যে একটি থিয়েটার নির্মাণের প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। পেগী অ্যাসক্রফট্ থিয়েটার ন মে এই থিয়েটার তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ক্রয়ডন পৌরসভা গিলবার্ট এবং তার সহকর্মীদের হাতে এই থিয়েটারের সংগঠনের ভার দিয়েছেন। এখানে স্টেজ-ইন-দি রাউণ্ড এবং চিরাচরিত প্রসেনিয়াম মঞ্চ থাকবে। প্রয়োজনমত যে-কোন মঞ্চ ব্যবহার করা যাবে। এই আনন্দ সংবাদে আমরা আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু পেমব্রোক থিয়েটারের জন্যে ব্যথাবোধকেও উপেক্ষা করতে পারি না। শীতের দেশে এক ঝলক গ্রীষ্মের রোদের মত তার আগমন, ক্ষণিকের হলেও ব্যাপ্তিময় আনন্দসঞ্চরণ আর স্মৃতিচয়ন ফুরতে না ফুরতে তার বিলুপ্তি।

অগাস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ

সুদূর উত্তরের হিমশীতল অঞ্চল থেকে যে ত্রয়ী প্রতিভাধর নাট্যকার পৃথিবীর নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গ তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। স্ট্রীণ্ডবার্গ স্টকহলম সহরে ২২শে জানুয়ারী, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইবসেনের জন্ম হয় ১৮৩৮ সালে এবং জরেনসন জন্মান ১৮৩২এ। এরা উভয়েই ছিলেন নরওয়ের অধিবাসী স্ট্রীণ্ডবার্গ সুইডিশ।

স্ট্রীণ্ডবার্গের সমস্ত জীবন নাটকীয় ঘটনায় সমৃদ্ধ। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বারবার যেমন তাঁর নাট্যপ্রতিভার বিদ্যুৎ চমকে সকলকে আশ্চর্য করেছেন, তাঁর নিজের জীবনও তেমনি ছিল অদ্ভুত ঘটনার সমষ্টি। স্ট্রীণ্ডবার্গের জীবনে নাটক সুরু হয়েছিল তাঁর জন্মের আগে থেকে। ব্যবসায়ী বাপ সাধারণ পানাগারের এক সেবিকার দেহবল্লরী দেখে মুগ্ধ হলেন। এক সাথে বসবাস করতে করতে একে একে তাঁদের দুটি সন্তান জন্মাল। তৃতীয় সন্তান অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গের জন্মের মাত্র দু মাস আগে তাঁরা আনুষ্ঠানিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। বাপমায়ের মনের এই হঠাৎ আসা কোমলতা স্ট্রীণ্ডবার্গকে অবৈধতার কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়ে দিল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্ট্রীণ্ডবার্গ মাতৃহারা হলেন। নাগর পিতা কালবিলম্ব না করে বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তেরবছরের মধ্যে অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। এই তের বছরের মধ্যে যে নাটক তাঁর চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হল—তা তাঁর সমস্ত জীবনকে সমাচ্ছন্ন করেছে। অসুস্থ মাতাকে লুকিয়ে পিতার অন্য নারীগমন—মৃতা মায়ের স্মৃতিকে অপমান করে পিতার বিবাহলোলুপতা, মানবচরিত্র সম্পর্কে স্ট্রীণ্ডবার্গের মনে যে ছাপ রেখে গেল, সারা জীবনেও তা মুছল না। কামনা তাই স্ট্রীণ্ডবার্গের জীবনের ও রচনার গতিকে চরমভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গের পাঠ সুরু এবং শেষ হয়। কেবলমাত্র মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ লাভ করেছিলেন। নিজের ধীশক্তির বলে তিনি অর্জন করেছিলেন বৃত্তি— মাইনে না দিয়ে পাঠ করবার অধিকার। কিন্তু শুধু বৃত্তি তাঁর সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারেনা। পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হলে বই কেনা প্রয়োজন—তার জন্যে লাগে অর্থ, প্রচণ্ড শীতে বরফ জমা ঠাণ্ডার হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে

প্রয়োজন আগুনের। আগুন জ্বালাতে হলে চাই কাঠ—প্রচুর কাঠ। প্রচুর কাঠ কিনতেও লাগে অর্থ। অর্থকষ্টে জর্জরিত হয়ে স্ট্রীণ্ডবার্গ ভিক্ষাবৃত্তি সুরু করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই অনুভব করলেন যে উপবাসী দেহে শীতের প্রকোপ বেশী। সহজ সমাধান করলেন স্ট্রীণ্ডবার্গ—তিনি প্রচণ্ড মদ্যপান সুরু করলেন। খাবার চিন্তা ঘুচল, শরীর গরম হল কিন্তু পাঠে মন সংযোগ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। স্ট্রীণ্ডবার্গের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করতে এসে অধ্যাপক দেখলেন খাতা ভর্তি খালি কবিতা আর নাটক—পাঠ্যপুস্তকের খোঁজ করতে গিয়ে খুঁজে পেলেন সারি সারি খালি মদের বোতল। ১৮ বছর বয়সে অছাত্রসুলভ ব্যবহারের জন্য স্ট্রীণ্ডবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতারিত হলেন।

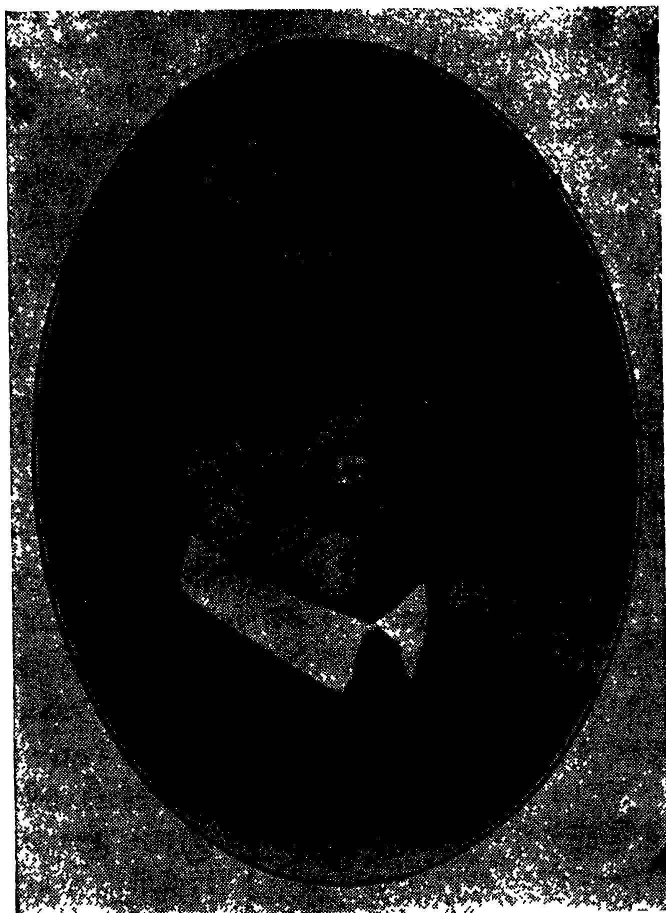
আবার অনশন। হঠাৎ একটি স্কুলে চাকরি পেলেন স্ট্রীণ্ডবার্গ। ডেনদেশের এক স্থপতির জীবন নিয়ে লেখা একাঙ্কিকা রয়েল থিয়েটারে অভিনীত হল। সুইডেনের বিদগ্ধ সমাজ এই তরুণ প্রতিভা সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক আউট্ ল (বিদ্রোহী), প্রকাশিত হবার পর সুইডেনের রাজা পঞ্চদশ চার্লস স্বয়ং তাঁকে ডেকে পাঠালেন। রাজানুকুল্যে স্ট্রীণ্ডবার্গ আবার উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গেলেন। মাসোহারা, পুস্তক সাহায্য, বিশেষ রাজানুগ্রহ এবং সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা হল। অর্থকষ্ট যাতে এই প্রতিভাধর যুবকের উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত না ঘটায় তার সব ব্যবস্থাই রাজা পঞ্চদশ চার্লস করেছিলেন। কিন্তু তখন স্ট্রীণ্ডবার্গের শিক্ষার সময় পার হয়ে গেছে। তাঁর অপূর্ব প্রতিভা তখন প্রচণ্ড অশান্ততায় মাথা তুলছে। প্রকাশের ব্যথায় তাঁর ব্যক্তিত্ব অধীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধ্য কি তখন তাঁকে ধরে রাখে। স্ট্রীণ্ডবার্গের প্রশ্নবানে শিক্ষকগণ অতিষ্ঠ, তাঁর দুরন্ত ব্যবহারে অধ্যাপকগণ জর্জরিত—সহপাঠিগণ ভীত সন্ত্রস্ত, চকিত। তবুও যতদিন পঞ্চদশ চার্লস জীবিত ছিলেন--বাধ্য হয়ে সকলে স্ট্রীণ্ডবার্গকে সহ্য করতেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যখন সমস্ত সাহায্য বন্ধ হয়ে গেল—স্ট্রীণ্ডবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে আবার মহানন্দে স্টকহলম সহরে ফিরে এলেন। কালক্ষেপ না করে স্ট্রীণ্ডবার্গ এক ব্যবসায়ী পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণ করলেন, সন্ধ্যায় হলেন পেশাদারী অভিনেতা—রাতে চিকিৎসাশাস্ত্রের মেধাবী ছাত্র। স্ট্রীণ্ডবার্গ সারাজীবনে কখনও কোন কাজ ধীরে বা ক্রমান্বয়ে করেননি। লোভীর মতো ছিল তাঁর পানাহার—আর এই পানাহারের প্রচণ্ড শুদ্ধতায় তিনি সব কিছু করেছেন। প্রচণ্ডতায়—প্র আর চণ্ডতা তাঁর

জীবনের প্রধান ভাব উপলব্ধি এবং সব থেকে স্পষ্ট ধারা।

১৮৭২-এ দ্বিতীয় নাটক মাষ্টার ওলাফ প্রকাশিত হল। তিনি ভেবেছিলেন যে, এই নাটকের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্টকহল্‌মে দারুণ আলোড়ন সুরু হবে। তাঁকে হতাশ হতে হল। সাহিত্য সমাজ পরম উদাসীনতায় মাষ্টার ওলাফ আর তার রচয়িতাকে উপেক্ষা করলেন। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ স্ট্রীণ্ডবার্গ ঝাঁপ দিলেন দার্শনিক শাস্ত্রসমুদ্রে। ইংরাজী, ডেন ও জার্মান দর্শন গোগ্রাসে অধ্যয়ন করতে সুরু করলেন। কিছুই বাদ গেল না তাঁর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত থেকে। অবশেষে তিনি স্থির করলেন যে, বকল, কিয়েরকেগার্ড, সুইডেনবার্গ ও হাটম্যানের বক্তব্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। তারপর ডুব দিলেন জার্মান ও ফরাসী সাহিত্য সাগরে। দুটি মাণিক আবিষ্কার করলেন, এমিল জোলা আর ভিক্টর হুগো। জোলার প্রতিভাকে নমস্কার জানিয়ে—হুগোর অসম্পূর্ণতায় ক্ষুব্ধ হলেন স্ট্রীণ্ডবার্গ।

এই সময় থেকে স্ট্রীণ্ডবার্গের জীবনে প্রেমের আনাগোনা সুরু হল। তাঁর প্রথম প্রণয়ী তাঁকে বিবাহ করবার জন্য তাঁর পূর্ব স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করলেন। নাট্যকারের গৃহ আনন্দ ও সুখে পূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু তা মাত্র ক্ষণিকের জন্য। এই প্রচণ্ড প্রতিভাধর ব্যক্তি কথনো তাঁর জীবনে শান্তিকে স্থায়ী আসন দিতে পারেননি। সব কিছুকে তিনি তাঁর প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে বারবার জয় করেছেন—কিন্তু সুখ তাঁর জীবনে চিরকাল ক্ষণস্থায়ী হয়েছে। বিবাহের পরে তাঁর দুটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। প্রথমটির নাম সুইডিস পিপ্‌ল (সুইডেনের অধিবাসী), দ্বিতীয়টির ম্যারেজ (বিবাহ)। এই বই দুটিতে স্ট্রীণ্ডবার্গ নির্দয়ভাবে সুইডেনের সমাজের আত্মকেন্দ্রিকতাকে আক্রমণ করলেন। সামাজিক ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিয়ে তার নীচতা আর অজ্ঞতাকে নগ্ন করে দিলেন। অর্থনৈতিক কাঠামোর ব্যক্তিরূপের পেছনে যে লোভ হিংসা আর স্বার্থপরতা সুইডেনের জাতীয় জীবনকে তিলে তিলে হত্যা করছে—তার চরম প্রকাশ হল প্রবন্ধ দুটিতে। রক্ষণশীল সমাজ নবীন লেখকের এই দুঃসাহসে অবাক হলেন। প্রত্যাঘাত আসতে দেরী হল না। অশ্লীলতার দায়ে ম্যারেজ (বিবাহ) বইটি অভিযুক্ত হল। প্রকাশকের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা হল। বিবাহের মধুচন্দ্রিকা অসম্পূর্ণ রেখে সুইজারল্যাণ্ড থেকে দেশে ফিরে এলেন স্ট্রীণ্ডবার্গ। সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন প্রকাশককে মুক্ত করার জন্য। একরাত্রে সুইডেনের সমস্ত আইনের বই পড়া শেষ করে তিনি প্রকাশকের জায়গায় নিজেকে বাদী বলে স্বীকার করে

নিলেন। তারপর নিজে মামলার সওয়াল করলেন। জুরী তাঁকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে মুক্তি দিল!—আর সমস্ত সুইডেনের যৌবন এই নবীন প্রতিভা'কে প্রণাম জানাল তাদের নেতা বলে—আধুনিক জগতের নয়াচিন্তার বাহক বলে, তাদের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা বলে।



স্ট্রীণ্ডবার্গ

কিন্তু এই সব ঘটনার প্রতিঘাত স্ট্রীণ্ডবার্গের ভেতর বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। এই পরিবর্তন প্রথম উপলব্ধি করা গেল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গল্প সংকলন রিয়াল য়ুটোপিয়াতে (সত্যিকারের আজব দেশ)। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে

ম্যারেজ বইটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তিনি নারী আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। নিজেকে তিনি স্ত্রীজাতির প্রধান সমালোচক ঘোষণা করলেন এবং আজীবন এই বিষয়ে তাঁর মতের পরিবর্তন করেন নাই। তিনি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার নৈতিক ও ব্যবহারিক অসাম্যকে চিরকাল ঘৃণা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন নাটক ও রচনা আজও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

স্ট্রীণ্ডবার্গের নাটকগুলিকে তিনটি প্রতিভাপূর্ণ যুগে ভাগ করা চলে। প্রথম যুগ ১৮৭০ থেকে ১৮৮৫-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় যুগ সুরু হল ১৮৮৭-তে ফাডরেন (জনক) নাটক লেখার সাথে সাথে। এই অপূর্ব নাটকটিতে স্ট্রীণ্ডবার্গ নরনারীর চিরকালীন দ্বন্দ্ব ভালবাসাকে মূর্ত করেছেন। গ্রীক ইডিপাস নাটকের প্রশ্ন নিয়ে রচনা করেছেন জগতের নাট্যসাহিত্যের এই উজ্জ্বল রত্নটিকে। ইডিপাস নাটকে মা পড়েছিলেন ছেলের প্রেমে, স্ট্রীণ্ডবার্গের প্রতিভা আরো জটিলতর প্রশ্নকে তুলে ধরল, স্ত্রীর মধ্যে মাতৃত্ব জেগে উঠে তাকে স্বামীঘাতী করে তুলল। ফাডরেন নাটকের শ্রেষ্ঠত্বের একটা বড় কারণ যে এই নাটক যুগমানসকে অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছে। গার্হস্থ্য জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে পুরুষের নারীর কাছে পরাজয় বরণ স্ত্রীবিদ্বেষী স্ট্রীণ্ডবার্গ সংঘাতের মধ্যে দিয়ে যত চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন, স্ত্রী আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থনকারী ইবসেন তা কখন পারেননি। তাঁর নারী চরিত্র বিদ্রোহী কিন্তু বিজয়িনী নয়। স্ট্রীণ্ডবার্গের এই সাফল্যের পেছনে তিন বছরের পরিশ্রমের ইতিহাস আছে। এই সময় তিনি এক অদ্ভুত কাজ করলেন—সমসাময়িক সমস্ত সাহিত্য দর্শন পড়ে ফেললেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে এডগার অ্যালেন পোর অসম্ভব গল্পগুলিই ওঁর সব থেকে ভাল লাগল। আধিভৌতিক রহস্যপূর্ণ, আশঙ্কাময় রচনাগুলি ওঁর মনে গভীর ছাপ রাখল। এই উৎকণ্ঠিত অনিশ্চয়তা উনি নাটক লেখার কাজে ব্যবহার করেছেন। যার ফলে দৃশ্যান্তর সর্বদা দর্শককে পরবর্তী ঘটনার জন্য সজাগ করে রাখে। পোর মতো অন্য কেউ স্ট্রীণ্ডবার্গকে প্রভাবিত করেননি যদিও নিৎসে, ডসটয়েভস্কি, ডিকেন্স ও মার্ক টোয়েনের কাছে তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন। ফাডরেনের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন স্ট্রীণ্ডবার্গ সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হলেন। আত্মকেন্দ্রিক এই নাট্যকার প্রচণ্ডভাবে দেখা দিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পূজারী হয়ে। একই ভাব নিয়ে প্রকাশিত হল আরো দুটি বিখ্যাত নাটক—দি

কমরেডস (ভাই সব) আর লেডি জুলী (কুমারী জুলী)। এই সময় থেকে সুরু করে ১৮৯১ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে স্ট্রীণ্ডবার্গ লিখে চললেন—নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক কথিকা আর একাঙ্কিকা। তাঁর প্রতিভা প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো একের পর এক উদ্গার করে চলল। প্রতি রচনা বিশিষ্টতা, মাধুর্য আর মানব চরিত্রকে পর্যবেক্ষন ক্ষমতায় অপূর্ব। স্ট্রীণ্ডবার্গের দৃষ্টিশক্তি চিরকালই অত্যন্ত প্রখর—কিন্তু এই সময়ে যেন দ্রষ্টার ক্ষমতা নিয়ে তিনি লিখে চললেন। তাঁর রচনায় ত্রাণ পেল হাজার হাজার নরনারী। তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস দি বণ্ড উওম্যানস্ সান (দাসীর ছেলে) এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

দীর্ঘ গার্হস্থ্য অশান্তির পর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রীণ্ডবার্গ বিবাহ বিচ্ছেদ করে জার্মানী চলে গেলেন। সুইডেন এই প্রচণ্ড প্রতিভার রচনাভারে জর্জরিত হয়ে স্ট্রীণ্ডবার্গের বিরাটত্ব সম্পর্কে তখনও মনস্থির করতে পারেনি, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই জার্মানী এই প্রতিভাকে বুঝতে পেরেছিল। জার্মানী তাই স্ট্রীণ্ডবার্গকে সানন্দে অভিনন্দন জানাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে। জার্মানী থেকে ফ্রান্স। তিনি ফ্রান্স পোঁছবার আগেই তাঁর প্রতিভার খবর ফ্রান্সকে উত্তাল করে তুলল। তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য ফ্রান্স যা করল তা পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য হয়ে আছে। প্যারিসের সমস্ত নাট্য গৃহ একে একে স্ট্রীণ্ডবার্গের নাটক অভিনয় করতে লাগলেন। শেষে এমন অবস্থা হল যে, প্যারিসের সমস্ত নাট্যগৃহতে কেবল স্ট্রীণ্ডবার্গের বিভিন্ন নাটক অভিনয় হতে থাকল। কেবল তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য বা তাঁর ফরাসী দেশে বাসকে সরল করার জন্য এ ঘটনা ঘটেনি। কারণ তিনি ফ্রান্স ছেড়ে যাবার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত নাটকগুলির অভিনয় চলেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কখন হয়নি। এই সময় ইম্প্রেশনিষ্ট আর্টিষ্টকুলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। গঁগার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সুদূর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নিয়েও গঁগা এই একটি মাত্র বন্ধুর সঙ্গে পত্রালাপ রেখেছিলেন। প্যারিস থেকে বের্লিনে ফিরে গেলেন স্ট্রীণ্ডবার্গ। বের্লিনে তাঁর ভাগ্য এক অষ্ট্রিয়ান মহিলা লেখিকার রূপ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। বয়সের অসাম্য সত্ত্বেও স্ট্রীণ্ডবার্গ তাকে বিবাহ করলেন।

নূতন জীবন সুরু হল। এখন আর লেখা নয়—স্ট্রীণ্ডবার্গ দেখা দিলেন বৈজ্ঞানিকরূপে। নানারকম যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে তিনি তাঁর গবেষণাগার গড়ে তুললেন। রসায়ন শাস্ত্র চিরকালই তাঁর ঔৎসুক্য জাগাত। সুযোগ

পেয়ে বিভিন্ন রসায়ন নিয়ে তিনি পরীক্ষা সুরু করলেন। নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে তিনি এমন মেতে উঠলেন যে শরীরের দিকে নজর দেবার প্রয়োজন থাকল না। জীবনহানির আশঙ্কা সত্বেও বিপজ্জনকভাবে পরীক্ষা চলতে লাগল। একবার এক দারুণ বিস্ফোরণে তিনি আহত হলেন। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকা সত্বেও তাঁর গবেষণার ইচ্ছা একটুও কমল না। এই সময় থেকে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যও ক্ষয় হ'তে সুরু করল। ভাববাদী বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে তাঁর মন সরে গিয়ে ক্রমে রহস্য বিশ্বাসী প্রেতবাদী হয়ে উঠল। অবশেষে অবক্ষয় এমন পর্যায়ে চলে গেল যে তাঁকে এক স্বাস্থ্য নিবাসে দীর্ঘদিন চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য আবার পুনরুদ্ধার করলেন।

১৮৯৭ থেকে আবার সাহিত্যকর্ম সুরু হল। প্রথমেই তিনি তাঁর প্রেতবাদী জীবনের অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসে রূপ দিলেন। ইনফারনো (নরক) জগতের উপন্যাস সাহিত্যের এক অপূর্ব রচনা। কেবলমাত্র ভাব ভাষা বা বস্তুতান্ত্রিকতায় এই রচনাটি স্ট্রীণ্ডবার্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তি। অসাধারণ মনস্তত্বের ছাত্রদের কাছে এই উপন্যাসটির দাবী ভিন্নরকম। স্ট্রীণ্ডবার্গের মতো প্রতিভাধর শিল্পীর অবদমিত মনের প্রকাশ যে অত্যন্ত প্রভাময় হবে—একথা বলা বাহুল্য মাত্র। সাহিত্য জগতে এই উপন্যাস নূতন আশার সঞ্চার করল। আনন্দে অভিভূত হয়ে তাঁরা দেখলেন যে অস্বাস্থ্য এই প্রতিভাকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। বরঞ্চ দ্বিগুণ তেজে তাঁর প্রতিভা জ্বলে উঠল। টিল ডামাস্কাস (ডামাস্কাসের পথ) নামে ১৮৯৪ তে তিনখণ্ডে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করে নাট্যজগতে আলোড়ন আনলেন। এই ত্রয়ী নাট্যরচনার মধ্য দিয়ে স্ট্রীণ্ডবার্গ মানবজীবনের অনিশ্চয়তাকে ফুটিয়ে তুললেন। নাটকের উপসংহারে আবেদন করলেন—আমরা যা হতে এসেছি পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে তা যদি হতে না পারি, তাহলে আমাদের ঘৃণা কোরনা, দয়া কোরনা —শুধু তোমাদের একটুখানি সহানুভূতি দিও।

এই সময়েই তিনি রচনা করলেন ডেনষ্টারকার (জোর), ক্রডসিজার (পাওনাদার) প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক। শতাব্দীর পরিবর্তনের সঙ্গে স্ট্রীণ্ড-বার্গের মধ্যে এল আরো পরিবর্তন। নূতন শতকের সূর্য স্ট্রীণ্ডবার্গের জীবনের তৃতীয় যুগকে প্রকাশ করল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পরের নাটকগুলিতে হতাশা কায়েম হয়েছে। আশার স্পন্দন সম্পূর্ণ ভাবে মুছে গেছে। মৃত্যুর পদক্ষেপে এই রচনাগুলি অশান্ত। ক্ষীয়মান জীবনের কঙ্কাল কদর্যরূপে প্রকাশিত।

দেয়ার আর ক্রাইম এ্যাণ্ড ক্রাইমস, ক্রীস্টমাস, ইস্টার, কৃষ্টিনা, তৃতীয় গুস্তাভ, পারিয়া (অন্ত্যজ) প্রভৃতি নাটক উত্তরিত হল স্ট্রীণ্ডবার্গের বিখ্যাত সৃষ্টি ডস্ ডানসে (মৃত্যু নৃত্য) নাটকে। বস্তুতান্ত্রিকতার সঙ্গে সাংকেতিকতা মিশে এই নাটকটিকে স্ট্রীণ্ডবার্গের শ্রেষ্ঠ কীর্তিই কেবল করল না—ভবিষ্যতের নাট্যকারদের কাছে স্ট্রীণ্ডবার্গের আবেদনকে চিরন্তন করে দিয়ে গেল। এই অর্ধোন্মাদ প্রতিভা এই নাটকে যে কি অপূর্ব মুন্সীয়ানা প্রকাশ করেছেন—তা লিখে প্রকাশ করতে গেলে স্ট্রীণ্ডবার্গের সমপ্রতিভাধর প্রয়োজন। আজকে নাটকের যে সব সংজ্ঞা স্বীকৃত হয়েছে—স্ট্রীণ্ডবার্গের এই নাটকে রেখে গেছেন তার সবগুলির জ্বলন্ত উদাহরণ। অবাক সত্যি হতে হয়। অসম্ভব লাগে চিন্তা করতে কি করে একই নাটক নির্দেশক, প্রকৃতিবাদী এবং অনুভাবক হতে পারে। একজন নাট্যকার কি করে প্রকটনশীল, বাস্তব ও অতিবাস্তববাদী হতে পারেন। কি করে সংগোপনতাবাদ আর অস্তিত্ববাদকে একই সঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব।

স্ট্রীণ্ডবার্গ প্রতিভা—এক প্রচণ্ড অসম্ভাব্যতা। কিছুই তাঁর কাছে সাধারণ ছিল না—তাই তাঁর প্রতিভা সাহিত্যের যে দিককে স্পর্শ করেছে তাকেই অসাধারণত্ব দিয়ে গেছে। তাঁর রচিত প্রবন্ধ সাহিত্য যেমন সংখ্যায় তেমনি পরিধিতেও বিরাট। তিনটি বিরাট খণ্ডে তাঁর ব্লু বুক্স প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং রসায়ন সম্পর্কিত প্রবন্ধ, দার্শনিক চিন্তা, প্রবচন এবং মতামত, ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্নকে তর্কশাস্ত্র মাধ্যমে প্রকাশ এবং তার নানা সূত্র ও কারিকা। এ ছাড়া সেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকের বিশ্লেষণ করে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক সামাজিক ও সাহিত্য জগৎকে কেন্দ্র করে তাঁর শ্লেষাত্মক রচনাগুলি এই সময় যেমন মুখরোচক তেমনি ভীতির কারণ হয়েছিল। কোন ঘটনা বা ব্যক্তি তাঁর কলমের খোঁচা থেকে রেহাই পায়নি। নোবেল পুরস্কার সমিতিকে উপলক্ষ্য করে তাঁর প্রবন্ধ কয়টি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি হৃদয়ভেদী। এমন কি সুইডেনের রাজাকে ব্যাঙ্গ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। গণতন্ত্র সম্মত শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য বারবার তাঁর লেখনী চালিত হয়েছে। অভিনয় শিক্ষা এবং দৃশ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধগুলি নাট্যামোদীদের চিন্তার খোরাক জোগাবে।

তাঁর সমস্ত সাহিত্য কর্মকে এক জোট করলে দেখা যায় যে, ৬৩ বছর জীবনের মধ্যে তিনি ৪৯ খানি নাটক রচনা করেছেন। তার মধ্যে একখানি

তিনখণ্ডে ও একখানি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। উপন্যাস ও ছোট গল্পের সবশুদ্ধ ১৬ খানি বই প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একখানি দুইখণ্ড। এছাড়া সাতখানি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস এবং নয়খানি প্রবন্ধ পুস্তক—তার মধ্যে একটি তিনখণ্ডে প্রকাশিত। যে কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই কেবলমাত্র সংখ্যার দিক থেকে এই সাহিত্য কীর্তি শ্লাঘার বস্তু।

কেবলমাত্র সাহিত্য কর্মই স্ট্রীণ্ডবার্গের জীবনের একমাত্র কীর্তি নয়। নাট্যজগতের ইতিহাস, অভিনয়শিল্পে স্ট্রীণ্ডবার্গের দান স্মরণ না করলে, এ জীবনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তৎকালীন অভিনয় শিল্পের উন্নতির জন্য ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্টকহল্‌ম সহরে স্ট্রীণ্ডবার্গ স্বয়ং কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় ইন্টিমা টিয়েটারেন বা Intimate Theatre স্থাপনা করেন। এই প্রেক্ষাগৃহকে এমন ভাবে তৈরী করা হল যাতে আসন মাত্র দুইশত থাকে। নাটক নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে এই নাট্যগৃহকে তৈরী করা হল। এখানে নাট্যরচনা পদ্ধতির বিভিন্ন শৈলীর যেমন পরীক্ষা চল্‌ত, দৃশ্য ও মঞ্চ পরিকল্পনাকেও তেমনি নানা নূতনভাবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হত। স্ট্রীণ্ডবার্গ স্বয়ং লিখেছেন যে, লেডি জুলীর অভিনয়ের সময় ইমপ্রেশনিষ্ট শিল্পের অনুকরণে দৃশ্য পরিকল্পনা করা হয়। এ ছাড়া ঘরের অংশ বিশেষ দেখাবার জন্য আসবাবের অর্দ্ধেকটুকু খালি ব্যবহার করার পদ্ধতি চালু করা হয়। মাতাল নায়কের দৃষ্টিতে নাটক প্রযোজনা করতে গিয়ে সমস্ত দৃশ্যটাকে বাঁকা-ভাবে উপস্থাপনা করা হল এবং অভিনেতৃগণ সর্বদা বাঁকাভাবে অভিনয় করতে বাধ্য হলেন। কোন দৃশ্যপট ব্যবহার না করে কেবলমাত্র বিভিন্ন রং এর পর্দা ব্যবহার করে সাংকেতিক প্রযোজনাতেও স্ট্রীণ্ডবার্গ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বৈজ্ঞানিকসুলভ মনোভাবের জন্য তিনি এই পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার মধ্যে অভিনেতা ও প্রযোজকদের যে উপদেশগুলি দিয়ে গেছেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান এবং একশত বছর পরেও নাট্যশিল্পে সমানভাবে প্রযোজ্য। স্ট্রীণ্ডবার্গের বিরাটত্বের প্রধান কারণ এই যে, ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমসাময়িকের মতোই সহজ ও স্বচ্ছ। এই পরীক্ষামূলক নাট্যগৃহতে স্ট্রীণ্ডবার্গ দশ বছরে নিজের উনত্রিশখানি নাটক প্রযোজনা করেন।

জীবনের সায়াহ্নে এই নাট্যপ্রযোজনা তাঁর প্রধান বৃত্তি হয়ে দাঁড়াল। স্ট্রীণ্ডবার্গ তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু বধূ স্থায়ী হলেন না—মাত্র তিন বছর পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রীণ্ডবার্গ আবার একাকীত্ব বরণ করে নিলেন। তাঁর শেষ কীর্তি প্রকাশিত হল ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে—দি

অরিজিন অফ আওয়ার মাদার টাংগ (মাতৃ ভাষার উৎপত্তি) এবং বিবলিকাল প্রপার মেনস্ (বাইবেলের স্থান ও ব্যক্তির নাম)। এর পর আর কিছু তিনি লেখবার চেষ্টা করেন নি। মনে হয় যেন নিজের জীবনের ওপর নিজের হাতেই পর্দা টেনে দেওয়া হল। ১৯১১ থেকেই নানা ছোটখাট অসুস্থতা তাঁকে শয্যাশায়ী করে ফেলল। মাঝে মাঝে সুস্থ হলেও—প্রায় সারা বছরই তাঁকে শুয়ে থাকতে হয়। অবশেষে ১৪ই মে ১৯১২তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নাটক যেমন তাঁর জন্মের আগে সুরু হয়েছিল—তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেও তেমনি শেষ হল না। তাঁর মৃত্যু একাধারে যেমন তাঁর বিরাট প্রতিভাকে স্তব্ধ করল —তেমনি তাঁর ঘৃণা, শ্লেষ আর ব্যাঙ্গের অবসান করে তাঁর অপকীর্তিরও ছেদ টেনে দিল। সুইডেন তার এই দামাল সন্তানের খারাপ দিকটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁর মৃত্যুকে যে সম্মানে ভূষিত করলেন তা পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যিকই উৎসুক মনে কামনা করে।

স্ট্রীণ্ডবার্গের মৃত্যুর দিনকে জাতীয় শোকের দিন ঘোষণা করা হল। তাঁর শেষ কৃত্যকে দেওয়া হল রাষ্ট্রীয় সম্মান। এই চরম বিদ্রোহীর সমাধি পাশে সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন রাজার প্রতিনিধি হিসাবে স্বয়ং যুবরাজ, সমস্ত মন্ত্রীমণ্ডলী, বিধানসভা বা রিক্সট্যাগের সমস্ত সদস্য এবং দেশের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি। হাজার হাজার নরনারীর পুরোধায় উপস্থিত হলেন দেশের সমস্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীরা, বুদ্ধি ও জ্ঞানজীবীরা। একে একে ছাত্র সংসদের পতাকাগুলি শ্রমিক ইউনিয়নের পতাকার সঙ্গে একসাথে মিলিত হয়ে নীরবে অবনমিত হল। কেবলমাত্র স্টকহল্‌ম নয়—সমস্ত সুইডেনে এবং সেই সঙ্গে জার্মানী ফ্রান্স গভীর শোকে হল নিমজ্জিত। বোধহয় কোন সাহিত্যিকের মৃত্যু এমন ইতিহাস কখন সৃষ্টি করতে পারেনি।

আধুনিক সুইডিস ভাষাকে স্ট্রীণ্ডবার্গ দিয়ে গেছেন অপূর্ব শক্তি আর সৌন্দর্য। সুইডিস সাহিত্যের ভাষাকে আধুনিক জগতের উপযোগী করে দেওয়ার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁরই। আজ যে ভাষায় সুইডেনের সাহিত্য রচনা হয় তা স্ট্রীণ্ডবার্গের দান। অদ্ভুত দূরদৃষ্টিতে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারতেন কোন ঘটনা জাতি ও সাহিত্যকে কালের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখতে সাহায্য করবে—এবং কোন ঘটনা উত্তপ্ত জগতের বুকে ক্ষণিকের বুদবুদ। কালক্ষমী ক্যাসানকে কশাঘাত করেছেন রূঢ়ভাবে, অথচ সুসম ঘটনাকে রক্ষা করার প্রানপণ চেষ্টা করেছেন ঘোর বিরোধিতার মধ্যেও। উনবিংশ শতাব্দীর

শেষপাদে ইমপ্রেশনিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ এমনি এক ঘটনা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে নবজীবনের মন্ত্র এই শিল্পীগোষ্ঠী শোনাচ্ছেন তাই হবে স্থায়ী, পথ করবে উন্নততর শিল্পপ্রতিভার। শিল্পীরা সেদিন স্ট্রীণ্ডবার্গের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে স্ট্রীণ্ডবার্গ বিংশশতাব্দীর নাট্যকার। এই সম্মান যে কেবল উপাধি নয়—স্ট্রীণ্ডবার্গ তা সমস্ত জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন।

আধুনিক যুগের প্রথম ত্রয়ী নাট্যপ্রতিভার সর্বকনিষ্ঠ স্ট্রীণ্ডবার্গ সর্বপ্রথম আধুনিক নাটকের পথ তৈরী করে দিলেন—তাকে জনপ্রিয় করে তুললেন। তাঁর প্রতিভার প্রচণ্ড স্পর্শে মানুষের মনের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা জেগে উঠল। পাহাড় পর্বত বিস্ফোরকে ফাটিয়ে দিয়ে তিনি আধুনিক নাটক আসার পথ তৈরী করলেন। সেই পথ বেয়ে ইবসেনের নাট্যধারা যখন এল তখনই, একমাত্র তখনই, তা সাধারণ মনে গ্রহণীয় হল—জনপ্রিয় হল। ইবসেন যদি আধুনিক নাটকের জাহ্নবী, স্ট্রীণ্ডবার্গ তাহলে ভগীরথ—কারণ তিনি তাঁর প্রকট মনীষাকে পথকাটার কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু ইবসেন ও স্ট্রীণ্ডবার্গের রচনার মধ্যে তফাৎ প্রায় স্ত্রী পুরুষের মতো। একজন রমণীয় কোমল অন্য জন পরুষ কঠোর। স্ট্রীণ্ডবার্গের বক্তব্য দেহকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনুভব করা যায় তাঁর শক্তির প্রাবল্য, ইবসেন প্রভাবিত করেন মন, চিন্তায় বুদ্ধিতে রয়ে যায় দীর্ঘস্থায়ী পরশ। স্ট্রীণ্ডবার্গের কীর্তি দেখলে মনে হয় মত্ত মাতঙ্গের মতো বিরাট পরিধি নিয়ে তাঁর জ্ঞান বিচরণ করেছে। প্রচণ্ড মননশীলতার সঙ্গে অত্যন্ত অধৈর্য হয়েছে তাঁর জীবনের বিশেষত্ব। তিনি বিপজ্জনক গবেষণায় নিজেকে যেমন বারবার অসুস্থ করেছেন, তেমনি নিজের জীবনকে গবেষণাগারের রসায়নের মতো ব্যবহার করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন। জীবনটাকে একতাল মাটির মতো তিনি ভেঙেছেন, গড়েছেন, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন আবার তুলে এনে ব্যবহার করেছেন। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশেছে প্রখর মেধা, প্রচুর শক্তি এবং অসম্ভব প্রতিভা—ফলে তাঁর রচনা তাঁর জীবনের মতোই হয়েছে অনিয়ন্ত্রিত অনিয়মিত এবং অনির্দিষ্ট।

স্টকহলমে স্ট্রীণ্ডবার্গের অত্যন্ত সাধারণ কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাই মনে হয় এখানে একজন ব্যক্তি নয় একটা গোটা যুগ মাটির নীচে চিরনিদ্রায় মগ্ন।

নাট্য প্রযোজনা প্রসঙ্গে

আজকে আমরা নাট্য প্রযোজনা বলতে যা বুঝি তাকে রুশ প্রযোজক স্ট্যানিস্লাভস্কির দান বলতে আমার দ্বিধা নাই। ইতিহাসের প্রকৃতিই এমন যে, কোন ঘটনার সূত্রকে একটা তারিখে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। রুশ বা ফরাসী বিপ্লব ঘটবার কতো আগে তার কারণগুলি ধীরে ধীরে তৈরী হয়েছে। এইস্কাইলাসকে পৃথিবীর প্রথম নাট্যকারের সম্মান দেওয়া হয়—তার কতো আগে থেকে এইস্কাইলাসের আবির্ভাব সূচিত হয়েছে—নিখুঁতভাবে বলা সহজ নয়। স্ট্যানিস্লাভস্কিকে যখন প্রযোজনা-স্রষ্টার সম্মান দিচ্ছি—তখন আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, যা ছিল তাই তাঁর হাতে রূপ পরিগ্রহ করল, নামাঙ্কিত হল, ব্যাকরণের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। নূতন কোন কিছু তিনি আবিষ্কার করেন নি, সৃষ্টিও করেন নি। যা ছিল তারই পরিধি নিরূপণ করে—উন্নতির সূত্র রেখে গেছেন, নিয়মবদ্ধতার মাধ্যমে প্রযোজনা কি ভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে তার বিশ্লেষণ রেখে গেছেন।

এইবার প্রযোজক কথাটির অর্থভেদ করা যাক। আমেরিকায় প্রযোজক তাঁকেই বলা হয় যাঁর অর্থানুকুল্যে নাটক উপস্থিত হচ্ছে। সিনেমার লাইনে সম্ভবত সর্বত্রই এই মানেই চলিত হয়ে গেছে। আমরা যাকে পরিচালক বলি যুক্তরাজ্যে তাকেই প্রযোজক বলা হয়। আমেরিকা ও ফ্রান্স ডিরেক্টর কথাটিই পছন্দ করে। কিন্তু নাটক উপস্থাপিত হলে আমরা বলি প্রযোজিত হল বা অমুকের প্রযোজনায় নিবেদন। পরিচালক বা ডিরেক্টর বলে প্রযোজককে অভিহিত করলেও নাটকের উপস্থাপনার বিষয়ে যুক্তরাজ্যের 'প্রোডিউসার' কথাটির সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক বেশী—সেজন্য নাট্য প্রয়োগ-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নাটক উপস্থাপনা বিষয়েই আলোচনা করতে চাই।

একটা ধরাবাঁধা দিক থেকে সুরু করা যাক—অর্থাৎ স্ট্যানিস্লাভস্কি থেকে। প্রশ্ন উঠবে—তিনি নাটক প্রযোজনায় কি দিলেন? তাঁর আগেও ভাল নাটক হয়েছে। অভিনয় হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের অভিনেতা-ম্যানেজারের যুগ ও ফ্রান্সের কলাপরিচালকের যুগ বহু শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রযোজনার গৌরব করতে পারে—তাহলে স্ট্যানিস্লাভস্কিকে কেন আমরা আধুনিক নাট্য প্রযোজনার বেদব্যাস বলে মনে করি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রযোজনা কি তা জানতে হবে। এলেন

টেরির পুত্র ও আধুনিক নাট্য জগতের প্রাচীনতম শিল্পী যিনি একাধারে অভিনেতা, দৃশ্য পরিকল্পক, নাট্যশাস্ত্রী এবং স্ট্যানিস্লাভেস্কির সহকর্মী সেই গর্ডন ক্রেগ খুব সহজ ভাষায় প্রযোজকের কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন প্রযোজককে হতে হবে শ্রেষ্ঠ দর্শক ও সমালোচক আর তাকে জানতে হবে নাটকের প্রত্যেকটি বিভাগের রূপ ও নিয়ম। কোন বিষয়ে মহাপণ্ডিত না হলেও সমগ্র কার্যকারণ সম্পর্কে যাঁর যত ভাল জ্ঞান তিনি তত সহজে প্রযোজনায় সিদ্ধিলাভ করবেন যদি শ্রেষ্ঠ দর্শক হিসাবে তিনি নাটকের সামগ্রিক আবেদনকে প্রকাশ করতে পারেন। নাটকের স্থানকালপাত্র এবং নাটক যেখানে অভিনীত হচ্ছে, সেখানকার স্থানকালপাত্র বুঝে নির্দেশ দিতে হবে। নাট্য প্রযোজনায় সব আগে জানা দরকার যে যাঁরা এই নাটক দেখবেন তাঁদের মানসিক বৃত্তির মান কতটুকু—সেই মতো নাটকের অভিনয় ও অন্যান্য আঙ্গিকের সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে নাট্য প্রযোজনার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম বা ধারা নেই। একই নাটক, একই দল, একই প্রযোজকের অধীনে কাজ করেও ভিন্নভাবে প্রযোজনা করতে পারেন, কখনো নিজেদের ভিন্নপথে হাঁটবার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য, কখনো স্থানকালপাত্র এবং দর্শকের আনন্দ উপভোগের জন্যে। অর্থাৎ প্রযোজককে জানতে হবে কারা নাটক দেখবেন এবং সেই মতো প্রযোজনা করতে হবে। যদি অভিনয় দেখা দর্শক হয়, নাটক দেখা দর্শক হয়, তাহলে নাটকের বক্তব্যের অভিনয় মাধ্যমে প্রকাশের ওপর জোর দিতে হবে। আর যদি ম্যাজিক দেখা দর্শক হয় তাহলে অন্ধকারে কঙ্কালের নৃত্য করতে হবে।

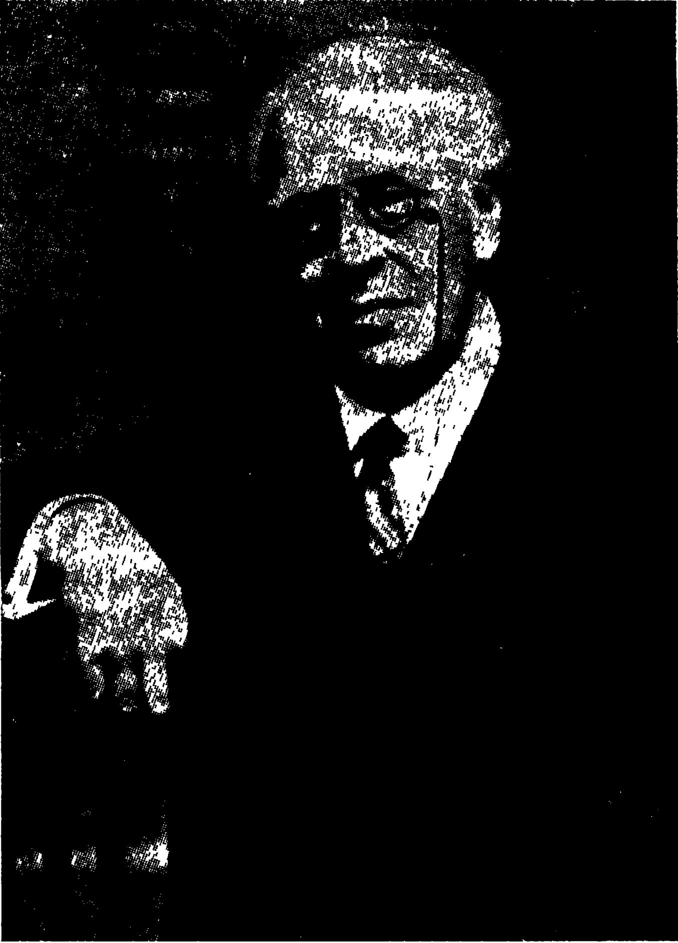
স্ট্যানিস্লাভেস্কি আমাদের শিখিয়েছেন যে প্রত্যেক নাটকের নিজস্ব গুণাগুণ আছে। প্রথমে অনুধাবন করে সেই গুণগুলি কি জানতে হবে। ধীরে ধীরে ব্যবচ্ছেদ করে তার প্রত্যঙ্গের রূপ সম্পর্কে সমস্ত মোহকে নাশ করতে হবে। তারপর এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সমন্বয় করে সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্তাধীনে সমগ্র রূপটিকে গড়ে তুলতে হবে। তার একটা পরিপূর্ণ সত্তাকে প্রকাশ করতে হবে।

যে কোন নাটককে ঠিকভাবে প্রযোজনা করতে হলে, কিভাবে ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রতিটি চরিত্রের আগমন ও নিষ্ক্রমণকে একটা নিয়মে বাঁধতে হবে। কিভাবে প্রতিটি চরিত্রের মঞ্চে দাঁড়ানো, হাঁটা-বসাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে এই শিক্ষা স্ট্যানিস্লাভেস্কি আমাদের দিয়ে গেছেন। বাচনভঙ্গী ও স্বরবিস্তারকে

কিভাবে পারস্পরিক করতে হবে, বিভিন্ন কণ্ঠস্বরকে কেমন করে সুরেলাভাবে ব্যবহার করতে হবে তা জানা আজকের প্রযোজকের অবশ্য কর্তব্য। আলোক-নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে আবহ সংগীতের, দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে পশ্চাৎপটকে মিলিয়ে নিয়ে একটা পরিপূর্ণ রূপ প্রযোজক ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন। প্রধান সেনাপতির ব্যূহরচনা প্রণালীর সঙ্গে ব্যায়াম-শিক্ষকের ধৈর্য আর নিষ্ঠাকে যোগ করে, সেরা-দর্শক, প্রযোজক, বহু দর্শকের জন্য নাটক উপস্থাপনা করেন। অভিনেতাদের পূর্ণ শক্তি প্রযোজক প্রকাশ করতে যেমন সাহায্য করবেন তেমনি তাঁদের দুর্বলতাকেও সযত্নে ঢেকে রাখতে হবে। গুণগুলোকে চড়া রঙে রাঙিয়ে যিনি দোষগুলোকে দর্শক চক্ষুর অন্তরালে রাখতে পারবেন তিনিই সার্থক প্রযোজক। আবার বলছি স্ট্যানিস্লাভেস্কির আগে থেকেই এই নিয়মতান্ত্রিক প্রযোজনা পদ্ধতি যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে চালু ছিল—স্ট্যানিস্লাভেস্কি কেবল তাকে স্বীকৃতি দিলেন—তিনি বৈয়াকরনিক হলেন, যেমন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আগেও বাংলা ভাষা ছিল—কিন্তু বর্ণপরিচয় ও ব্যাকরণ-কৌমুদীর সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর।

প্রযোজকের কাজের পেছনে একটা আদর্শের টান আছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রযোজক বিভিন্নভাবে সেটা অনুভব করেন। এই আদর্শবাদই তাঁর নাটক নির্বাচন ও প্রযোজনা-পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। নাটকের সুরকে নাটকের ধর্মানুযায়ী কোন্ তালে লয়ে বাঁধতে হবে তা প্রযোজকের চরিত্র আর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। সার্থক প্রযোজনা তখনই হবে যখন প্রযোজকের কীর্তির ফল শিল্পসম্মত হয়ে সমাদৃত হবে। তবে প্রযোজনাকে শিল্পসম্মত করবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম বা ছক এখনও তৈরী হয় নি। চরম কমেডীর মধ্যে একটু ট্রাজেডীর সুর কিংবা ট্রাজেডীর জমজমাট আবহাওয়ায় একটু ফার্সের গন্ধ যদি নাটকের ক্ষতি না করে বক্তব্যের প্রকাশের হানি না করে সাহায্য করে তাহলে তা দিতে বাধা নেই। অবশ্য কঠিন কঠিন ল্যাটিন, ইংরেজী, ফরাসী সংস্কৃত শব্দ জুড়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে কাগজের ওপর এই নিয়মের ভ্রান্তি প্রমাণ করতে পারেন।

গ্রন্থকীটরা তাদের চিরাচরিত জ্ঞানকেই অবশ্য সর্বদা বড় বলে মনে করেন। শিল্পকলার ক্ষেত্রে নূতন চিন্তাধারাকে তাঁরা ঢুকতে দিতে চান না সহজে। মনে করেন চিরাচরিতই একমাত্র সত্য—তাই ব্যতিক্রমকে ঠেকাবার দারোয়ানি দায়িত্বে তাঁরা সজাগ। তবু তাঁদেরও প্রয়োজন আছে। রক্ষণশীলরা আছেন বলেই প্রগতি এগিয়ে যেতে পারে। তাই তো ঘটে নিত্য-নূতন



স্ট্যানিস্লাভস্কি

পরীক্ষা! যে আগুনের আবিষ্কারে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা একদিন আনন্দে অধীর হয়ে গিয়েছিল—দেশলাই-বদ্ধ সেই আগুনই আজ থাকে আমাদের পকেটে। তার জন্য কোন শিহরণ অনুভব করি না। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে নাট্য প্রযোজনার ধারাও তেমনি নিত্য নব দিকে, নবরূপে, নবছন্দে প্রবাহমান। আজ ময়ূর পেখম মেলেছে—শত তরঙ্গভঙ্গে নাট্যধারা প্রযোজনার শিখরে শিখরে নেচে চলেছে। দেশে দেশে নূতন প্রযোজনাধারা নিয়ে গবেষণা চলেছে। সার্থকতা তো ভবিষ্যতের—তাই ভবিষ্যতের হাতেই থাক বিচারের ভার। নাটকের প্রযোজনাকে সার্থক করা যায় কিন্তু সমসাময়িককাল কি মানুষকে সার্থকতা দেয়? এই চিরকালীন প্রশ্নই প্রসঙ্গের ছেদ টানুক।

পিরানদেল্লো ও ইটালীয় নাটক

ইটালী আধুনিক নাটকের ইতিহাসে নাট্যকার পিরানদেল্লোর জন্ম বিখ্যাত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পিরানদেল্লোর আগে ও পরে আর কখনই ইটালী থেকে ভাল নাটক আসেনি। আপাত দৃষ্টিতে এটা খুব অদ্ভুত লাগে। কারণ ইটালী অপেরার জন্ম বিখ্যাত। ইটালীয়দের রচিত বহু বিখ্যাত অপেরা যেমন আমরা পেয়েছি—তেমনি পেয়েছি অপেরার গায়ক-গায়িকা এবং সুরকার। অপেরা লেখকগণ যে খ্যাতনামা গীতিকার হবেন তা বলাই বাহুল্য। অপেরা যে দেশে এত সমৃদ্ধ, সে দেশে নাটক নাই কেন, এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। যদি কেউ বলেন যে, অভিনয় শিল্প যথেষ্ট উন্নত নয়, তাহলে ভুল হবে। গত পঞ্চাশ বছরে বহু খ্যাতনামা অভিনেতা এবং অভিনেত্রী ইটালীতে জন্মেছেন। গত বিশ বছরের হলিউডের ইতিহাস ঘাঁটলে অনেক খ্যাতনামা ইটালীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দর্শন পাওয়া যাবে। এমন কি আজকেও যে সব ইটালীয় অভিনেত্রী ও অভিনেতা সর্বজনমান্য, তাঁরাও তাঁদের জীবন সুরু করেন মঞ্চ নাটকে। সেখান থেকে ক্রমোন্নতি হয় ইটালীর সিনেমায় এবং চরমোন্নতি হলিউডে। নাট্য প্রযোজক ও পরিচালকের অভাব যে নেই তাও ইদানীং-এর ইটালীয় সিনেমা প্রমাণ করেছে। সামগ্রিকভাবে নাটকের রূপারোপেও যে ইটালীয়গণ পারদর্শী তার প্রমাণ আমরা পাই দীর্ঘস্থায়ী সেক্সপীয়রের নাটকে, ইবসেনের অনুবাদে এবং আধুনিক ফরাসী ও ইংরেজী নাটকের পরিচালন সাফল্যে, তাদের জনপ্রিয়তায়। কিন্তু মূল প্রশ্নের কোন সমাধান হচ্ছে না। ইটালীয় নাট্যকারের লেখা নাটক যথেষ্ট সফলতা লাভ করছে না।

গত দেড়শত বছরের ইতিহাস নাড়াচাড়া করলে দেখতে পাই একমাত্র পিরানদেল্লো একা—একক শৃঙ্গী পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে। সুতরাং ইটালীর ইতিহাসে ভাল নাটকের দুর্ভিক্ষের ইতিহাসই—পিরানদেল্লোর সাফল্যের ইতিহাস। একমাত্র পিরানদেল্লো কি করে দুস্তরগিরি লঙ্ঘন করলেন এটা অনুধাবন করতে পারলে আমরা ইটালীয় নাট্যরচনার অপারগতার কারণ খুঁজে পাব।

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভক্ত ইটালীতে ১৮০৩ সালেও কোন উল্লেখযোগ্য মিলনাত্মক নাটক ছিল না। হতাত্মক নাটক ছিল, পুরোণো অপেরা নীতিতে

লেখা। কেবল গানের জায়গায় কথা বসিয়ে এই নাটকগুলির সৃষ্টি হয়। এই নাটকগুলির শেষে বইত রক্তের নদী। সেই রক্ততরঙ্গে নাটক, নাট্যকার, অভিনেতা, দর্শক মায় গৃহাধিকারী পর্য্যন্ত ভেসে যেতেন। কাউকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই অজুহাতে অত্যন্ত উষ্ণরক্ত ভূমধ্যসাগরীগণ প্রায়ই প্রেক্ষাগৃহের ভেতরেই শক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত হতেন এবং হতাহতের সংখ্যা অনুসারে নাটকের পুনর্ভিনয়ের ব্যবস্থা হোত।

ভিনসেঞ্জো মার্টিনী ১৮৫৩ সালে লিখলেন মিলনাত্মক নাটক। পিয়েট্রো কোসা ঐতিহাসিক নাটকে নূতন দিগদর্শন করালেন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এই সময়কার সব থেকে ভাল নাটক এল পাওলো ফেরারীর কাছ থেকে। ফরাসী নাট্যপ্রবাহে প্রভাবান্বিত হয়ে ১৮৫৬ থেকে ১৮৮৮র মধ্যে তিনি লিখলেন একাধিক থিসিস নাটক। নাটকে ভাববাদ ও বক্তব্য প্রকাশকে প্রধান আসন দেওয়া হোল। সামাজিক অন্যায়ের প্রতি ফেরারী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। রক্ত ও হত্যা বাদ দিয়ে ইটালীয় ট্রাজেডীকে নূতন পথে প্রবাহিত করলেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী একীভূত হোল। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলির যোগ-সাধন করে এক সার্বভৌম রাজনৈতিক একতায় জাতি বাঁধা পড়ল। অবশ্যম্ভাবী-ভাবে নাট্য রচনার ক্ষেত্রেও এই রাষ্ট্রীয় একতা প্রধান আসন নিল। আমরা দেখতে পাই যে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নাটকগুলিতে আঞ্চলিকতার প্রাধান্য। আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক রাজনীতি, আঞ্চলিক দুঃখ-আনন্দ, বীরত্ব-সাহসিকতার কাহিনী দীর্ঘদিন ইটালীর নাট্য সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করে রাখল। কিছু সুফলও ফলল। ইটালীর সিনেমায় যে অতিমাত্রায় realism ইদানীং-কালে আমাদের মুগ্ধ করেছে, তার জন্ম হোল এই আঞ্চলিক স্বাভাবিকতা প্রকাশের পরাকাষ্ঠার ভেতর থেকে। ভাল নাটক রচনায় নাট্যকারগণ যত অপারগ হতে লাগলেন—প্রযোজকগণ উৎকৃষ্ট পরিবেশনের মাধ্যমে ততো তা ঢেকে দিতে সুরু করলেন। এই সময় থেকে একদল আলোকশিল্পী, মঞ্চ-পরিকল্পক ও পরিচালকের সৃষ্টি হোল—যাঁরা তাঁদের বিশিষ্টতার গুণে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে গেলেন এবং আদৃত হলেন। আজও এঁদের উত্তরসাধকগণ ইউরোপে ও আমেরিকায় যোগ্য মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

বলা বাহুল্য, নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকের দীনতা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। ইবসেনের আধুনিকতার তূর্য্যধ্বনি ইউরোপকে জাগানমাত্র ইটালী তাকে গ্রহণ করল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্স সহরে ইবসেনের

'গোষ্ঠ' নাটকের অনুবাদ অভিনীত হোল। সৃষ্টি হোল ইবসেনপন্থী নাট্যকারের। এনরিকো বুট্টি ও রোবার্টো ব্যাকো. প্রাণপণে ইবসেনের মতো নাটক লিখতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন।

প্রত্যেক ঘটনাক্রমেরই দুই দিক থাকে। ইবসেনের উগ্র আধুনিকতার সম্পূর্ণ বিপক্ষাচরণ করলেন গেব্রিয়েল ডি' অনুনৎজিও। কাব্য রসাশ্রিত রোমান্স ও প্রেমের সুরভিতে ভরা তাঁর নাটকগুলি আজ তাদের কাব্যরসের জন্য বিখ্যাত হয়েছে। গেব্রিয়েল ছিলেন কবি--নাটক রচনার ক্ষেত্রে ইবসেনের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি কেবল নিজের শক্তিই নাশ করলেন। তাঁর নাটকে কাব্যের প্রাধান্য দেখে মনে হয় নিছক কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর কাছে অনেক কিছু আশা করার ছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে (১৯৩৮) তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন একথা। তিনি বলেছেন হোমার ও ভারজিলের অনুসরণে তাঁর উচিত ছিল বৃহৎ বাগানের সৃষ্টি করা—অসি নিয়ে যুদ্ধ করা নয়।

এই ব্যর্থতার পথ বেয়েই এলেন পিরানদেল্লো। ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে, ব্যর্থতাকে অপূর্বভাবে প্রকাশ করে তিনি হলেন ব্যর্থতার কবি—তাঁর নাটকে প্রকাশ করলেন মানব-জীবনের ব্যর্থতার দুরপনের ইতিহাস, তার নিত্য কলঙ্কিত জীবনের ব্যর্থ সঞ্চরণ।

উপন্যাস ও গল্প লিখে সুনাম অর্জন করে পরিণত বয়সে পিরানদেল্লো এলেন নাটকের জগতে। পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার পর তিনি নাটক লিখতে সুরু করলেন। একাধারে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে, ভাববাদের বিরুদ্ধে এবং ইবসেনের প্রদর্শিত চিরাচরিত সত্যের বিরুদ্ধে। পিরানদেল্লো শোনালেন—সত্য বলে কিছু নাই। কারণ সত্য স্থান ও কাল ভেদে পাল্টায়। যে সত্য আছে তা মানুষের তৈরী, সুতরাং মানুষের মনের ভুলে রঙীন। ভাববাদ বলে কিছু নাই, সুবিধাবাদী মানুষের কল্পিত ভাববাদ তোষণ নিষ্পেষণে ও শক্তির মদমত্ততায় বার বার বদলে যায়। স্বাভাবিক বলে কিছু নাই। কারণ তার কোন নির্দিষ্ট মান নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই। লোক ভেদে, দেশভেদে যেখানে স্বাভাবিকতার তারতম্য ঘটে সেখানে কিছুই শাশ্বত এবং প্রামাণ্য নয়। চার্বাক দর্শনের অপরূপ বাণী এল ইটালীয় মনীষীর কাছ থেকে। তিনি বল্লেন, পরিপূর্ণ সত্য বলে কিছু নাই—জীবনেও নাই ব্যবহারেও নাই—তাহলে নাটকে সম্পূর্ণ সত্য কি করে থাকবে? তাঁর নাটকে তাই এল সত্যের সঙ্গে কল্পনা, মিথ্যার উপদ্রবের

মধ্যে আশার প্রশান্তি। চিন্তার দৃঢ়তার সঙ্গে কর্মের অমনোযোগ। যে পূর্ণ flux and uncertainty পিরানদেল্লো নিজের জীবনে ভোগ করেছেন তা বহু গুণে বর্দ্ধিত হয়ে তাঁর নাটকে প্রকাশিত হোল। নাটকের মাধ্যমে অ-নাটক রচনায় সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম। বেরটোল্ট ব্রেখট, স্যামুয়েল বেকেট, ইউজঁ ইউনেস্কো, হ্যারল্ড পিন্টার এবং এন এফ সিম্পসন প্রভৃতি বর্ত্তমানের খ্যাতনামা নাট্যকারগণের ওপর পিরানদেল্লোর প্রভাব অনস্বীকার্য্য —তবে কতটুকু তা গবেষণার বিষয়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমে পিরানদেল্লো আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন এবং কিছুদিন পরেই নাটুকে দল নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করেন। ১৯২৩ সালে 'লেখকের সন্ধানে ছয়টি চরিত্রের' অনুবাদ প্যারীতে অভিনীত হয় এবং পিরানদেল্লো অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মানে ভূষিত হন। পরে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাটকটির সফল অভিনয় হয়। পিরানদেল্লোর নাটকে আমরা মানুষের চিরাচরিত ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে মুখোমুখী হই। মানুষের মনের বিভিন্ন অলিগলির ব্যাঁকাচোরা পথে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠি। বিয়োগান্ত নাটক হয়ে দাঁড়ায় মনঃশুদ্ধির পাঠ, জীবন দর্শনের মন্ত্র। সব থেকে অবাক হয়ে যেতে হয় যখন দেখি এক মুহূর্তের জন্যেও পিরানদেল্লো নাটক রচনার মূল নীতি থেকে প্রক্ষিপ্ত হননি। অপূর্ব মুন্সিয়ানায় তিনি নাটকের নিয়মতান্ত্রিকতা মেনে চলেও নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। বার্নার্ড শ' প্রয়োজনের তাগিদে নাট্য রূপায়ণকে বারবার ভেঙ্গে গড়ে নিয়েছেন। পিরানদেল্লোর নাটকের অভিনবত্ব সত্ত্বেও তিনি কখনও নিয়মের পরিধি বৃদ্ধির প্রয়োজন বোধ করেননি। পিরানদেল্লোর প্রভাব এই জন্যে সুদূরপ্রসারী। যে প্রশ্ন তাঁর নাটকে জেগে ওঠে তার সমাধান জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও সমাহিত, কিন্তু সুগম বা সুস্পষ্ট নয়। তাই নাটকের জগতে নূতন জীবন দিলেন পিরানদেল্লো। প্রবল ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন নূতন পথের জয়যাত্রায়। অস্বাভাবিকতার সঙ্গে স্বাভাবিকতাকে মিলিয়ে দিয়ে নন্দিশঙ্করের অর্গলবদ্ধ পথ খুলে দিলেন।

ঘটনাপ্রবাহে এই নূতন পথ বেয়ে যাঁরা এলেন প্রকৃতির পরিহাসে তাঁদের কেউই ইটালীয় নাট্যকার নন।

পিরানদেল্লোর মৃত্যুর পর (১৯৩৬) এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে আমরা দেখতে পেলাম মৃতপ্রায় ইটালীয় নাটক কোন রকমে জীবনধারণ করে চলেছে। ১৯৫০ সালে ত্রিধা বিভক্ত নাট্যধারার মাধ্যমে পিরানদেল্লীয়

ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার সামান্য সফল হোল। তখন নাটকের জগতের আবহাওয়া আবার সেই একশ বছর আগেকার মতো। মঞ্চের উন্নতি হয়েছে সামগ্রিকভাবে, বিখ্যাত নাটকের অনুবাদ ও অভিনয় নিয়মিত হয়ে চলেছে। ব্রেখট, ও কেসী, জিরদো প্রভৃতি সমাজনীতিবিদ নাট্যকারগণের নাটক অত্যন্ত সমাদৃত, কিন্তু ইটালীয় নাটক অপাংক্তেয়।

ইটালীতে পিরানদেল্লোর অনুসরণ করে সামাজিক সচেতনতায় যাঁরা নাট্য রচনা করছেন, তাঁদের মধ্যে উগো বেট্টি খ্যাতিলাভ করেছেন। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র তাঁর নাটক ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে অনূদিত এবং অভিনীত হয়েছে। বেট্টির নাটকে ঘটনার জোর থাকা সত্ত্বেও বক্তব্যের প্রকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন। বর্ত্তমান ইটালীয় ফিল্ম জগতের দেহবাদের প্রভাবে তার চরিত্রায়ণে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাধান্য প্রায়ই নাটকের বক্তব্যকে দৈনন্দিনের গতানুগতিকতার উপরে উঠতে দেয় না। কারলো টেরোন, সিলভিও গিওভানিনেট্টি ও ভ্যালেন্টিনো বোম্পিয়ানী ইটালীর সামাজিক চেতনা ও দায়িত্ববোধকে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। প্রেম ও অপরাধ এই নাট্যকারদের নাট্যবস্তুর প্রধান উপকরণ।

'ক্যাথলিক' নাট্যকারগণ দ্বিতীয় ধারাকে বহন করছেন। দিয়াগো ফাব্রী এবং তাঁর অনুবর্ত্তীগণ ক্যাথলিক ধর্মের অনুবর্তনে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সুবন্দোবস্তের স্বপ্ন দেখছেন। আমাদের 'আত্মদর্শন' নাটকের মতো দয়া, ধর্ম, হিংসাকে নাট্য চরিত্ররূপে নিয়ে এসে নাটক রচনার প্রয়াস হয়েছে। তৃতীয় ধারাটি অবশ্যম্ভাবীভাবে দ্বিতীয় ধারার পরীপন্থী। মার্কসবাদী নাটক রচনা এবং থিয়েটার সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছেন আর একদল নাট্যকার। এই দুই দলের রেষারেষির কাহিনী অবলম্বন করে গিয়োভানি গুয়ারেস্কচী অপূর্ব গল্প সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন। এই গল্পগুলির প্রধান নায়ক পাদ্রী ডন ক্যামিলো প্রায় ডনকুইকজোটের মতই জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। ইংরেজী ভাষার অনুবাদেও ডনক্যামিলো গল্পগ্রন্থগুলির ২৮টি সংস্করণ শেষ হয়েছে অথচ যাঁরা এই অপূর্ব প্রেরণার উৎস, তাঁদের কাছ থেকে একখানিও উল্লেখযোগ্য নাটক পাওয়া যায়নি। অথচ এই গল্পগুলি অবলম্বন করে আমেরিকায় অপূর্ব হাসির নাটক সৃষ্টি হয়েছে। আজ বালক বৃদ্ধ যুবক ডনক্যামিলো নাটক হবে শুনলে কি থিয়েটারে, রেডিওতে বা দূরদর্শনে দল বেঁধে ভীড় করে।

মার্কসবাদী দলের মধ্যে ফ্রেডারিকো জারডি, গুসেপ ডেসি এবং লুইগি স্কোয়ারজিনার নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে শেষোক্ত জনের নাটিকাগুচ্ছ



পিরানদেল্লো

১৯৫৭ সালে কিছু আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদী নাটকের সাফল্যের পথে নানা অসুবিধা। রাষ্ট্রের পূর্ণ বিরোধিতা, অভিনয়ের অসুবিধা এবং রাষ্ট্রদ্রোহী হবার ভয়ে প্রকাশকের অভাব যেমন একদিকে এই নাটকগুলিকে পঙ্গু করে তেমনি বাঁধাধরা নিয়মানুবর্ত্তী সামাজিক নীতিবোধ এবং মার্কসীয় দর্শন প্রকাশ করতে গিয়ে নাটকের বক্তব্য সীমিত হয়ে যায়।

চতুর্থ একদল নাট্যকার দেখা দিয়েছেন। তাঁরা যেমন কোন বিশেষ দলের নন—তেমনি কোন বিশেষ রচনা সংজ্ঞাও এঁদের নেই। জীবনের নানা ক্ষেত্রে বসে এঁরা বিচ্ছিন্নভাবে নাটক লিখছেন। এঁদেরই একজন সেরজিও পাগলিসের একটি নাটক মাত্র কিছু দিন আগে রোমের থিয়েটারের জগতে ইতিহাস সৃষ্টি করল। রোমের থিয়েটারে নাটকটি দীর্ঘ দিনতো চললই, উপরন্তু এর মধ্যে বারোটি ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভিনীত হয়েছে। এমন কি, মাত্র কিছু দিন আগে কলম্বো রেডিও থেকে এই নাটকটি প্রচারিত হয়েছে।

সুতরাং আমরা আশা করতে পারি যে, পিরানদেল্লো যে মহীরুহ তৈরী করে গেছেন, বসন্ত বাতাসে তা আবার মঞ্জরিত হবে। ফুলে ফলে বর্ণে সৌষ্ঠবে ইটালীর নাটক আবার জগৎসভায় নূতন বাণী শুনিয়ে পিরানদেল্লোর ঐতিহ্যকে চিরকাল জাগরূক রাখবে।

স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডাল

আমরা যখন বিদেশে যাই স্বভাবতঃই আধুনিক নাটক দেখার ঝোঁক থাকে। আধুনিক নাট্যকারের বক্তব্য নূতনতম প্রয়োগ পদ্ধতি মারফত দেখে অনেক কিছু শিখতে পারব আশা করি। সেজন্য যেদিন বৃটিশ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আমাকে হেমার্কেট থিয়েটারে শেরিডনের স্কুল অব স্ক্যাণ্ডাল নাটক দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হল সন্তুষ্ট হতে পারিনি। নিমন্ত্রণ জানাতে যে মহিলাটি এসেছিলেন তিনি প্রায় সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতেই বললেন যে, অন্ততঃ একশ' বছরের পুরোণ না হলে কোন নাটকই সংস্কৃতি বাহকের সরকারী স্বীকৃতি পায় না। তবে তিনি এটাও জানাতে ভুললেন না যে, এই নাটকটি দেখতে হয়তো আমার খারাপ লাগবে না।

মনে পড়ল ছাত্রাবস্থায় যখন সেক্সপীয়ারের পরবর্তী যুগের বিখ্যাত ইংরেজ নাটকগুলি পাঠ করছি, তখন জনসনের ভোলপোন, কনগ্রেভের দি ওয়ে অব দি ওয়ার্লড, গোল্ডস্মিথের সী ষ্টুপ্‌স টু কংকার-এর সঙ্গে শেরিডনের স্কুল অব স্ক্যাণ্ডালও পড়েছিলাম। এলিজাবেথীয় যুগের পরে এই চারখানি নাটকই বিখ্যাত ইংরেজী কমেডির অন্যতম।

কাগজ খুলে এই প্রয়োজনার সঙ্গে বিখ্যাত অভিনেতারা যুক্ত আছেন দেখে আশ্চর্য্য হলাম। স্যার জন গিলগুড নাটকটির পরিচালনা করেছেন। স্যার রালফ রিচার্ডসন, জন নেভিল এবং মার্গারেট রাদারফোর্ড বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যাঁরা ইংলণ্ডের থিয়েটার জগতের সামান্যতম খবর রাখেন তাঁরা জানেন, স্যার জন গিলগুড এবং স্যার লরেন্স অলিভিয়ারকে ইংলণ্ডের অভিনয় জগতের "রাজা" বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এঁদের উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য। গিলগুডের আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বর, অপূর্ব্ব আবৃত্তি সবে মিলে তাকে এক প্রচণ্ড অভিনেতা করেছে। অন্যদিকে স্যার লরেন্স তাঁর চরিত্রচিত্রণ ও স্বরক্ষেপণে বিরাট সুনামের অধিকারী। স্কুল অব স্ক্যাণ্ডাল প্রয়োজনা করতে বসে স্যার জন গিলগুড একমাত্র আলোকসম্পাত ছাড়া আর কোন রকমের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন নি। দেখে আশ্চর্য্য হলাম যে, পুরোণ পন্থায় covered ও uncovered রীতিতে দৃশ্য পরিবর্ত্তন করে তিনি অভিনয়কে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। রাস্তার দৃশ দেখাবার সময় প্রায় ষ্টেজ প্রসিনিয়ামের ওপরেই অভিনয় করা হল। কিছুদিন আগে গিলগুড

জানিয়েছিলেন যে, ভাল ক্যামেরায় যেমন ভাল ছবি ওঠবার নিশ্চয়তা থাকে না অর্থাৎ আনাড়ীর হাতে ভাল ক্যামেরার যেমন মর্যাদা নেই, পুরাতন ক্যামেরা দিয়েও তেমনি ভাল ছবি তুলে সবাইকে চমক লাগান যায়। সুতরাং দেখা যাবে যে প্রাচীন পন্থায় নাটকের প্রযোজনা যদি যথাযথ হয় তাহলে সে প্রযোজনা দর্শক উপভোগ করবেন। স্কুল অব স্ক্যাণ্ডালের প্রযোজনায় এই সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই নাটকটিতে সেই যুগের পোষাক-পরিচ্ছদ পরে পাত্রপাত্রীরা বিচরণ করলেন। সকলের অভিনয়কে এমন এক বিশেষ ধরণের রীতিতে বাঁধা হল যা স্বাভাবিকতার খুব কাছ ঘেঁষে চলে। নাটকের নির্ব্বাক চরিত্র থেকে প্রধান চরিত্র পর্য্যন্ত সকলে এই ষ্টাইল অনুসরণ করার ফলে সমস্ত নাটকটি অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দর হয়ে দেখা দিল। কোন সময়ই একথা আমাদের মনে হয়নি যে কোন সৃষ্টি ছাড়া নাটক দেখছি। নিজেদেরকে সেই যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরে হাস্যরসের সম্পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছি।

সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে, বিয়োগান্ত নাটক চিরকালীন হয় কিন্তু হাসির নাটক কালের পদক্ষেপে ক্ষীণ হয়ে যায়। সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয়ে গিলগুডের নাটকীয় অভিভঙ্গী, চোখের মুখের ভাবপ্রয়োগ যেমন অননুকরণীয়, তেমনি অলিভিয়ারের চাপা ভাবপ্রবণতা, বুদ্ধিপ্রবণ ব্যঞ্জনা এবং চঞ্চল দেহসঞ্চার সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজত্বের খবর আনে। একে অপরের যেমন বিপরীত তেমনি পরিপূরক। আধুনিক অভিনয়রীতি মনে হয় এই দু'জনকে আশ্রয় করে সম্পূর্ণ হয়েছে। কলকাতার বৃটিশ কাউন্সিলে এঁদের উভয়ের কণ্ঠে সেক্সপীয়ার আবৃত্তি শুনলে এঁদের অভিনয়রীতির বিভিন্নতা সম্পর্কে নাট্যরসিকদের মনে কোন সন্দেহ থাকবে না। স্যার জন গিলগুডের পক্ষে সেইজন্যে স্কুল অব স্ক্যাণ্ডাল নাটকটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করা কেবলমাত্র সঙ্গত নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং শেরিডনের এই নাটকটিও যে সময়ের ব্যবধানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েবে—এটাই সকলে মনে করেছিলন। কিন্তু দেখা গেল যে, স্যার জনের প্রতিভার ছোঁয়ায় নাটকের প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয় আমাদের সামনে প্রকাশিত হল। যার ফলে আমরা সে যুগের দর্শকের মতই এ যুগেও নাটকটিকে অত্যন্ত উপভোগ করলাম। সব থেকে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই নাটকটি প্রযোজনা করবার জন্যে নাটকটির ওপর ছুরি চালাতে হয়নি। আধুনিক যুগের মনকে ধরবার জন্যে নাটকের এতটুকু অঙ্গহানি না করে গিলগুড স্কুল অব স্ক্যাণ্ডালের প্রযোজনা করলেন।

নাট্যবস্তু গিলগুডকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চাশোর্দ্ধ নাট্যরসিকদের কাছে স্কুল অব স্ক্যাণ্ডালের গল্প নূতন করে না বললেও চলবে। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক এবং ছাত্রগণও এই নাটকটি সম্পর্কে অনেক খবরই দিতে পারবেন। তবু যাঁরা স্কুল অব স্ক্যাণ্ডাল পড়েন নি তাঁদের জন্যে গল্পের প্রধান ঘটনাগুলি জানাই।

স্যার পিটার টিজেল অভিজাত ঘরের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। দীর্ঘদিন অবিবাহিত থাকার পর প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত হবার আগে তিনি অত্যন্ত সাধারণ ঘরের একটি রূপসী কন্যাকে বিবাহ করলেন। অভিজাত ঘরের মহিলাদের মধ্যে কেচ্ছার আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল লেডী স্নিয়ারওয়েল ছিলেন তার মক্ষীরানী। এই বিধবার বসার ঘরে ইংলণ্ডের সমস্ত কুৎসা এসে জমায়েত হত এবং সেখান থেকেই তার প্রচার হত। স্যার পিটার টিজেলের নববিবাহিতা স্ত্রী প্রাণপণে অভিজাত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তার ফলে লেডী স্নিয়ারওয়েলের সভায় তাঁর গতি নিয়মিত হল। স্বামীর নিষেধ অমান্য করে তিনি কুৎসার ব্যবসাতে নিজেকে মজিয়ে দিয়ে সত্যিকারের অভিজাত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সভাকে ঠাট্টা করেই নাট্যকার নাটকের নামকরণ করেছেন স্কুল অব স্ক্যাণ্ডাল। এই সভার সদস্যরা পরস্পরের কুৎসাও করতেন এবং দীর্ঘ দিন মুখরোচক কুৎসা না পেলে নূতন কেলেঙ্কারী ঘটাবার জন্যে সাহায্য ও ষড়যন্ত্র করতেন। পিটার টিজেলের সুন্দরী বিদুষী যুবতী স্ত্রী যে স্বামীর ভালবাসায় সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করবেন এটা তাদের সহ্য হল না। লেডী স্নিয়ারওয়েল তাঁর অন্যতম প্রেমিক লম্পট যোশেফ সারফেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন যে, লেডী টিজেলের সুনাম নষ্ট করে তাঁকে দ্বিচারিণী করবার চেষ্টা করতে হবে। সরল লেডী টিজেল ভেবেছিলেন যে, কেবলমাত্র কুৎসার আদানপ্রদান করলেই তিনি অভিজাত মহিলা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবেন। কিন্তু এই সমাজের গতি কত নীচু সে সম্পর্কে তার মনে কোন ধারণাই ছিল না। কাজেই তিনি সরল মনে যোশেফ সারফেসের কথায় মুগ্ধ হয়ে ভাবলেন যে, সত্যই বুঝি সে তাঁর প্রতি আসক্ত। এর পর নাটকের গতি দ্রুত! সারফেসের লেডী টিজেলকে নষ্ট করবার চেষ্টা, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণে লেডী টিজেলের পরিত্রাণ এবং স্বামীর ভালবাসায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা এই গল্পের মিলনাত্মক পরিণতি। শেরিডন এই ঘটনাগুলি অবলম্বন করে তীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে অপূর্ব্ব হাসির নাটকের সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ নাটকের চরম মুহূর্ত্তগুলিতে

অপূর্ব্ব মুনসীয়ানার ছাপ পাই। যোশেফ সারফেসের ঘরে লেডী টিজেল অবশেষে যেদিন এলেন তার কিছুক্ষণ পরেই পিটার টিজেলও সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পর্দ্দার আড়ালে যোশেফ সারফেস লেডী টিজেলকে লুকিয়ে রাখলেন। পিটার টিজেল যখন ঘরে একটি মহিলার উপস্থিতি বুঝতে পারলেন, তখন সারফেস জানালেন যে, একটি সাধারণ মহিলাকে তিনি উপভোগের জন্যে নিয়ে এসেছেন এবং পিটার টিজেলকে সেই মহিলাটি উপহার দেবার প্রস্তাবও করলেন। এই করুণ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে শেরিডন যে অপূর্ব্ব হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন, তাতে তিনি যে কত বড় নাট্যকার তা বুঝতে দেরী হয় না। নাটকের শেষে যোশেফ সারফেসের সমস্ত কীর্ত্তি একটার পর একটা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে তখনও এই হাস্যরসের ধারাটি অব্যাহত থাকে এবং প্রাচীন নাটকের নিয়মে 'ভিলেন' তার অপকীর্ত্তির জন্যে শাস্তি পাওয়া সত্ত্বেও নাটকের ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস কোথাও ব্যাহত হয় না।

স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডাল নাটকটি আলোচনা করতে আরম্ভ করে শেরিডন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা না বললে অন্যায় হবে। শেরিডন ছিলেন একজন অভিনেতার ছেলে। তার মা ফ্রান্সেস শেরিডন ঔপন্যাসিক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন সহরে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে শেরিডনের জন্ম হয়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে তিনি হ্যারো স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করে আইনজীবির পরীক্ষা পাশ করেন। তার মাতাপিতার যুগ্ম প্রতিভার অধিকারী হওয়ায় তিনি আইনকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারলেন না, নাটক লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথম জীবনে নাটক লিখেই তাঁকে জীবিকা উপার্জন করতে হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যেই একজন খ্যাতনামা নাট্যকার হিসাবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডাল ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ড্রুরিলেন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। স্বয়ং গ্যারিক এই নাটকের প্রস্তাবনা লিখে দেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শেরিডন নাট্যচর্চ্চা করেন। এর মধ্যেই তার জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন এল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং পার্লামেন্টের সদস্য হন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছিলেন তাদের মধ্যে শেরিডন ছিলেন অন্যতম। পরে তিনি অধ্যবসায় এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কয়েকবার তাকে প্রধান মন্ত্রী করবার কথাও আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু কর্ম্মমুখর রাজনৈতিক জীবন তাকে নাটক রচনা থেকে আটকে রাখতে পারেনি। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা গ্রিমাল্ডি হঠাৎ

অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি একরাত্রির জন্তে রঙ্গমঞ্চে তার ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন। সুতরাং একথা বলে চলে যে, অভিজাত শ্রেণীর কীর্তিকলাপ দেখবার এবং জানবার তিনি যে সুযোগ পেয়েছিলেন তা পরিপূর্ণভাবে স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডাল নাটকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এবার আবার অভিনয়ের কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডাল নাটকটি কালের গতিকে উপেক্ষা করে বর্ত্তমানের দর্শক সমাজকে আনন্দ দিতে পেরেছে তা একটু আগে বলেছি! কিন্তু কেউ কেউ এই তর্ক তুলতে পারেন যে, ইংলণ্ডের দর্শক তাদের পুরাতন সংস্কৃতিকে ভালবাসেন। সুতরাং তাঁদের কাছে বিগত দিনের এই নাটক যে আদৃত হবে সেটা খুব আশ্চর্য্য ঘটনা নয়। স্যার জন গিলগুড সম্ভবতঃ এই রকম মতামত আশা করেছিলেন। তাই তিনি তার দল নিয়ে আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরে আধুনিকত'র কেন্দ্রভূমি ব্রডওয়েতে উপস্থিত হলেন। যোসেফ্ সারফেসের ভূমিকা-অভিনেতা নিউ-ইয়র্ক সহরের অভিনয়ে যোগদান না করায় তিনি স্বয়ং যোসেফ্ সারফেসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

এরকম ঘটনা প্রায়ই দেখা গেছে যে, লণ্ডন সহরে সমাদৃত নাটক ব্রডওয়ের



সারফেসের ভূমিকায় গিলগুড

কাছে মোটেই কোন সমাদর পায়নি। তার প্রধান কারণ, আমেরিকার দর্শকের সংস্কৃতি এবং নাট্যঐতিহ্য ইংলণ্ডের দর্শকের থেকে ভিন্নধর্মী। সুতরাং

স্যার জন গিলগুডের স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডাল করবার ইচ্ছাকে অনেকেই দুঃসাহসের কাজ বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রথম রাত্রের অভিনয় হতেই এই নাটকটি জনসাধারণের সমাদর লাভ করল। এমন কি উন্নাসিক সমালোচকগণ, যারা শেরিডনের নাটক অভিনীত হবে শুনেই তাদের বিরূপ মতামত ঘোষণা করে ছিলেন তারাও স্বীকার করলেন যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রযোজকদের মধ্যে গিলগুড যে অন্যতম স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডালের প্রযোজনা তার প্রমাণ। তিনি প্রাচীন পন্থাতে নাট্যপ্রযোজনা করে দেখালেন যে, প্রাচীন অথবা আধুনিক যে কোন নাটকই ভাল প্রযোজনায় সফলতা লাভ করতে পারে। আধুনিক রীতিতে যেমন ভাল প্রযোজনা করা সম্ভব তেমনি পুরাতন রীতিতেও ভাল প্রযোজনার যথেষ্ট সুযোগ আছে। পুরাতন রীতিতে স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডালের প্রযোজনা এই কথাটাই সপ্রমাণ করল যে, রীতি মুখ্য নয়, নাটকই মুখ্য। নববিধানের প্রযোজনা খারাপ হলে যেমন দর্শকের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, পুরাতন রীতির প্রযোজনা তেমনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে দর্শক-সমাদর লাভ করবে।

গত বছরের (অর্থাৎ মে, '৬২ থেকে এপ্রিল, '৬৩তে যে বছর শেষ হয়েছে) মত খারাপ সময় ব্রডওয়ের জীবনে দীর্ঘকাল আসেনি। ঐ সময়ে একাধিক নাটক মাত্র একটি দু'টি অভিনয়ের পর বন্ধ হয়েছে এবং জনসাধারণের সমাদর অতি অল্প নাটকই লাভ করেছে। তার ফলে বহু প্রযোজককে প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এ বছরে আগের বছরগুলির তুলনায় কম নাটক অভিনীত হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাগরপারে যাতায়াত করবার খরচশুদ্ধ আর্থিক সৌভাগ্য বিচার করলে স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডালের সফলতার বিরাটত্ব বুঝতে পারা যায়। শুধু তাই নয়, ব্রডওয়ের সমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, গত বছরের সমস্ত নাটকগুলির মধ্যে স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডাল অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক এবং উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার নাট্যকারদের লেখা যে সব নাটক অভিনীত হয়েছে তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডালের সাফল্য স্যার জন গিলগুডের পরিচালক জীবনের এক উজ্জ্বল স্বীকৃতি। এই বিরাট অভিনেতাটি প্রায়ই পরিচালকের কাজ গ্রহণ করতে চান না। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন তখন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে নাট্যপ্রযোজনা করেন। তার অভিনেতা জীবনের মতই তার প্রযোজক-জীবন যে অপূর্ব্ব সম্ভারে নাট্য ইতিহাসকে পূর্ণ করেছে তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করা চলতে পারে যে, স্যার জন

গিলগুড চমক লাগান প্রযোজনা ধারার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। অভিনয়-ধারার মতো তার প্রযোজনাধারাও স্বাভাবিকতাকে আশ্রয় করে চলে। কিন্তু সে স্বাভাবিকতা অন্যান্য আধুনিক প্রযোজকদের সহজ স্বাভাবিকতা নয়। সে স্বাভাবিকতায় একটা রং থাকে, একটা সৌন্দর্য্য থাকে এবং সময় সময় ভাব-প্রবণতাও থাকে। তার প্রযোজনাধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিকতার যে তফাৎ সেইটা অনুধাবন করতে হবে। শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিকত্ব ধুলোমুঠি হিসাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিকত্ব সেই ধুলোমুঠিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্ভারে পূর্ণ করেছে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে এ-রীতি উচিত কি অনুচিত তার বিচার পণ্ডিতেরা করবেন, কিন্তু দর্শক হিসাবে একথাই আমার মনে হয়েছে যে শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের রচনাকেই আমরা যে রকম সশ্রদ্ধ মনে স্বীকার করে নিয়েছি, উভয়ের রচনাতেই আমাদের মন যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, সেই-ভাবেই গিলগুডের প্রযোজনার রীতিও আমাদের ভাল লেগেছে, আমাদের অভিভূত করেছে।

ওল্ড ভিক

লণ্ডনের বিখ্যাত থিয়েটারগুলির মধ্যে 'দি ওল্ড ভিক থিয়েটার' অন্যতম। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে এই থিয়েটার গৃহটি রয়েল কোবার্গ থিয়েটার নামে জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হয় এবং বর্তমানের খ্যাতনামা ব্যারীমুরদের পিতামহ উইলিয়াম ব্যারীমুরের 'হেভেন ডিফেণ্ড দি রাইট' নামক নাটক প্রথম অভিনীত হয়। যদিও জোন্স নামে সারে থিয়েটারের মালিক এই থিয়েটারটির সৃষ্টি করেন, কিন্তু রাজকুমারী শারলট এবং স্যাক্সকোবার্গের রাজকুমার ৪২ হাজার পাউণ্ড অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু কিছুকাল যেতে না যেতেই নিদারুণ অর্থ-সঙ্কটে থিয়েটারটি বন্ধ হবার উপক্রম হয়। নৃত্যনাট্য এবং সস্তা মেলোড্রামা দেখিয়েও জনসাধারণের উৎসাহ জাগাতে পারা গেল না। অবশেষে জোসেফ গ্লসপ নামে সোহোর একজন ব্যবসায়ী অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তাঁর অর্থানুকূল্যে থিয়েটারটিকে সম্পূর্ণভাবে নূতন করে তৈরী করা হল। বিখ্যাত স্থপতি রুডল্ফ কাবানেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই নূতন থিয়েটারটি সংস্কৃত হল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই থিয়েটারের দায়িত্ব জর্জ ডাভিজ গ্রহণ করেন এবং তাঁর সময়ে প্রথম, বিখ্যাত অভিনেতা এডমণ্ড কীন ১৮৩১ সালে এই থিয়েটারে অভিনয় করেন। ১৮৩৩ সালের ১লা জুলাই থিয়েটারটিকে আর একবার সংস্কার করা হল এবং তার নাম পাল্টিয়ে রাখা হল 'রয়েল ভিক্টোরিয়া থিয়েটার।' ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত যদিও এটি লণ্ডনের 'নাবালক' থিয়েটারের অন্যতম ছিল, কিন্তু ইটালীয় বিখ্যাত পাগনিনী এবং এলিজাবেথ ভিনসেণ্ট এই থিয়েটারেই দর্শকের কাছ থেকে সুনাম লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড ওসপালডিসটন এই থিয়েটারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই থিয়েটারে সেক্সপীয়ারের নাটক অভিনয় করবার অনুমতি লর্ড চেম্বারলেনের কাছ থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু ওল্ড ভিকের জীবনে তখনও অনেক দুর্গতি বাকী। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথ ভিনসেণ্ট স্বয়ং কর্তৃত্বভার গ্রহণ করলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে থিয়েটারের মধ্যে আগুন লাগার গুজব ছড়িয়ে পড়ায় আত্মরক্ষার জন্য পালাতে গিয়ে বহু লোক আহত হন এবং ১৬ জনের প্রাণনাশ হয়। শ্রীমতী ভিনসেণ্ট ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত থিয়েটারটিকে ভালভাবে চালাবার চেষ্টা করেন। তারপর কয়েকবার দ্রুত হাত বদল হয়ে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে থিয়েটারটি বন্ধ হয়ে যায়।

জে. টি. রবিনসন প্রচুর অর্থব্যয়ে থিয়েটারটির পুনঃসংস্কার করেন এবং 'রয়েল ভিক্টোরিয়া হল ও কফি ট্যাভার্ণ' নামে তার দরজা আবার খুলে দেন। ১৯১৪ সালের আগে পর্যন্ত এই থিয়েটারটি লণ্ডনের আরও বহু থিয়েটারের মতো কোন রকমে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ১৯১২ সালে শ্রীমতী লিলিয়ান বেইলিস এই থিয়েটারটির কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি কারনেগী ট্রাষ্টের সাহায্য নিলেন। তারপর নিজের সবকিছু সঞ্চয় ঢেলে দিয়ে এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের অর্থানুকূল্যে ১৯১৪ সালের অক্টোবরে ইংল্যাণ্ডের থিয়েটারের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সাহসিকতার কাজ করলেন। সেক্সপীয়ারের নাটকের তখন দৈন্য দিন, বিশেষ কোথাও সেক্সপীয়ার অভিনীত হত না এবং অভিনয় হলেও টিকিটের হার যা করা হত তাতে সাধারণের পক্ষে সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয় দেখা সম্ভব হত না। শ্রীমতী বেইলিস তার থিয়েটারে কেবল সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলেন না, প্রবেশমূল্য অত্যন্ত কম রেখে জনসাধারণকে সেক্সপীয়ারের নাটক উপভোগের সুযোগ দিলেন। তখন থেকেই এই থিয়েটার সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গেল। সাধারণ লোক এই থিয়েটারটিকে এত ভালবেসে ফেলল যে বাড়ীর লোকের মত তাকে আদর করে ছোট নামে ডাকতে সুরু করল। 'ভিক' বা 'ভিকী' বলতে তখন এই থিয়েটারটির কথাই সকলের মনে জাগত। তারপর ১৯১৮ সালে এই থিয়েটার গৃহটির শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাণী মেরী উপস্থিত হলেন। জনসাধারণ সবিস্ময়ে জানল যে তাদের আদরের থিয়েটারটি নবযৌবনা রূপসী নয়, শতবয়সী সুন্দরী। সেদিন ভিক নামের সঙ্গে আর একটি বিশেষণ যুক্ত হল 'ওল্ড' এবং তখন থেকেই এই নাম কেবল ইংল্যাণ্ডে নয়, ইংল্যাণ্ডের পরিধি অতিক্রম করে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকে ওল্ড ভিক মানেই সেক্সপীয়ার এবং সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয় মানেই ওল্ড ভিক। ১৯১৪ সাল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত ওল্ড ভিক সেক্সপীয়ারের অভিনয়ের যে বিরাট ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, যে অপূর্ব কর্মতৎপরতায় পৃথিবীর থিয়েটারের ইতিহাসে নিজের আসন করে নিয়েছে তা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বস্তু নয়।

এই পর্যন্ত ওল্ড ভিক সম্বন্ধে ১৭ খানা বই লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে মেরী ক্লার্ক লিখিত 'স্ক্র্যাপ বুক অব দি ওল্ড ভিক' (১৯৫৩—৫৮) পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত। আজকে এমন অভিনেতা নেই যিনি জীবনের কোন না কোন সময়ে ওল্ড ভিকে অভিনয় করেননি, এমন কোন পরিচালক নেই যিনি তাঁর

কর্মের স্বাক্ষর ওল্ড ভিকে রাখেননি। ওল্ড ভিকের সব থেকে বড় কীর্তি এই যে সেখানে সেক্সপীয়ারের ছোট বড়, খ্যাত অখ্যাত সমস্ত নাটক অভিনীত হয়েছে। পৃথিবীর আর কোন থিয়েটার আজ পর্যন্ত এ গৌরব দাবী করতে পারে না। ১৯৩৭ সালে শ্রীমতী লিলিয়ান বেইলিসের মৃত্যু হয়। তার কিছুদিন পরেই যুদ্ধের জন্ত এই থিয়েটারটি বন্ধ করতে হয়। বোমায় বিধ্বস্ত হওয়ায় যুদ্ধের পর নূতন করে গঠনকার্য সুরু হয় এবং সেই সময় এখানে ১০০৩টি আসনের ব্যবস্থা করা হয়। একটি বোর্ড অফ ট্রাষ্টীজ জনসাধারণের সম্মতিক্রমে ওল্ড ভিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত হয়ে ওল্ড ভিক তার দরজা উন্মুক্ত করে এবং জনসাধারণের আদরের নামকে স্বীকৃতি দিবার জন্ত সেদিন অন্ত সমস্ত নাম মুছে থিয়েটারের মাথাতেও লেখা হয় ‘ওল্ড ভিক’।

নব সংস্কৃত ‘ওল্ড ভিক’ ১৯৫০ সাল থেকে কেবল অভিনেতা অভিনেত্রী বা পরিচালক সৃষ্টি করে যায়নি, জনসাধারণের মনে ওল্ড ভিক, জাতীয় থিয়েটাররূপে কল্পিত হয়েছে। আজকে যখন জাতীয় থিয়েটার তৈরী হবার কথা হচ্ছে তখন ওল্ড ভিকের পরিচালকগোষ্ঠীর পরিচালনার রীতি-নীতি জাতীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবেন বলে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ মনে এমন স্থায়ী আসন নিয়েছে যে, অন্ত কোনভাবে জাতীয় থিয়েটারের পরিকল্পনা করা আর সম্ভব নয়। ওল্ড ভিকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হলে তবেই জাতীয় থিয়েটার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই জাতীয় অভিনেতা দল যখন সংগঠিত হল তখন নূতন নাট্যশালা টেমসনদীর পারে তৈরী হচ্ছে। তখন জাতীয় নাট্যদল লর্ড লরেন্স অলিভিয়ার নেতৃত্বে এই ওল্ড ভিকেই অভিনয় সুরু করল। ওল্ড ভিক পেল অল্প দিনের জন্ত হলেও জাতীয় নাট্যশালার মর্য্যাদা। কিন্তু তারপর এই দল যখন নূতন নাট্যশালায় স্থানান্তরিত হল তখন শেষ প্রদীপটি নিভে গেল। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার হাত বদল হল। এবার কিনলেন এক আমেরিকান ব্যবসায়ী। ভেতর বাইরের অবয়ব পাল্টে দিলেন তিনি। যাকে বলে খোল-নলচে পাল্টান তাই হল। তারপর ১৯৮৪ তে আবার অভিনয় সুরু হয়েছে। বিভিন্ন দল বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে নামকরা নাটকের অভিনয় করছেন কিছুকালের জন্ত। এর পর ওল্ড ভিকের ভাগ্য কোথায় যায় তা ভবিষ্যৎ কালই দেখবে।

ব্রেথটের নাটকের প্রযোজনা

ব্রেথটের নাটক ১৯৫৬ সালের পর থেকে ইংলণ্ডে নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। বহু পেশাদার এবং অপেশাদার এগুলি প্রযোজনা করছেন। ব্রেথটের নাটকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৫৯ সালে। ইংলণ্ডের বহু নাট্য শিক্ষালয়ের মধ্যে রোজ ব্রুফোর্ড ড্রামা ট্রেণিং স্কুল লণ্ডন সহরের বাইরে অবস্থিত। মফঃস্বলে অবস্থিত স্কুলগুলির মধ্যে এই স্কুলটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুনাম অর্জ্জন করেছে। বৃটিশ কাউন্সিলের সৌজন্যে এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি কিছুদিন ধরে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তখনই দেখলাম এঁরা তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্যে ব্রেথটের ককেশীয় চক সার্কেল তৈরী করছেন। এঁদের মহলা নিয়মিত দেখতে দেখতে ব্রেথটের নাটকটি সম্পর্কে চরম কৌতূহল জেগে উঠল—একদিন এক ছাত্র অভিনেতার বইখানা ধার নিয়ে সমস্ত নাটকটি পড়ে ফেললাম। পড়ে মুগ্ধ হলাম। সব থেকে আশ্চর্য্য লাগল যে, ব্রেথট সমস্ত নাটকের মধ্যে একটা কঠিন কথা, একটা গুরু-গম্ভীর শব্দ ব্যবহার করেননি। অথচ সমস্ত নাটকের মধ্যে দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে এমন সুচারুভাবে প্রকাশ করেছেন যে, বোধ হয় বক্তৃতা করেও এর থেকে প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝান যায় না।

মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক যে প্রীতির এবং একের সঙ্গে অন্যের সৌভাত্র যে বহু অসাধ্য সাধন করতে পারে, এ কথা ব্রেথট সহজেই আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন এক সুপ্রাচীন ককেশীয় রূপকথায় গল্প বলে। ব্রেথট দেখিয়েছেন যে, স্নেহ, মমতা ভালবাসা মানুষের অন্তরের সম্পদ, তার বিনিময় বাহ্যিক ধনসম্পদের নিয়ম রক্ষা করে চলে না। ঐশ্বর্য্যশালী শাসনকর্ত্তাকে বিদ্রোহীরা যেদিন মেরে ফেলল, বর্ষার ডগায় তার ছিন্ন শিরকে প্রাচীরের ওপর স্থাপন করল, সেদিন সবাই ভয়ে বিহ্বল হয়ে পালিয়ে গেল। পালাবার সময় কেউ নিয়ে গেল অর্থ, কেউ নিল নিজের মূল্যবাদ সম্পদ, শাসনকর্ত্তার স্ত্রী তাঁর গহনা ও মূল্যবান জামা-কাপড় নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় ভুলে গেলেন যে, এক বৎসরের শিশুপুত্র একলা ঘরে পড়ে রইল। রন্ধনশালার সাহায্যকারিণী গ্রুসা সেই ছেলেটিকে তুলে নিল। তার কুমারী হৃদয় এই সহায়হীন শিশুটির জন্যে কেঁদে উঠল। এদিকে সৈন্যরা খবর পেল যে, শাসনকর্ত্তার উত্তরাধিকারী জীবিত। তাকে খুঁজে বের করার জন্যে চারিদিকে লোক ছুটল। কোন নিরাপদ স্থানে, পুত্রহীন কোন দম্পতির কাছে ছেলেটিকে রেখে যাবার সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত

গ্রুসার থাকল না। শাসনকর্তার উত্তরাধিকারীকে আশ্রয় দিয়ে কে বিদ্রোহীদের রোষ মাথায় নেবে। শিশুর দামী আভরণ ফেলে দিয়ে গ্রুসা তাকে চাষার ছেলের আভরণে সাজাল। নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতে দিতে কবে যে সে সত্যি করে শিশুর মায়ের আসন নিয়েছে, তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। এক দিকে বিদ্রোহীদের তাড়না, অন্য দিকে কুমারী মাতৃত্বের লাঞ্ছনা মাথায় করে গ্রুসা তার সন্তানকে বড় করতে লাগল। তাকে কথা শেখাল, হাঁটতে শেখাল, পড়তে শেখাল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে, তুষার, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি মাথায় করে গ্রুসার জীবনের একমাত্র সাধনা হল তার ছেলেকে মানুষ করা। ক্রমে সে তার নিজের সব কিছু হারাতে সুরু করল। তার পরিজনরা তাকে ত্যাগ করল, তার বাগদত্ত স্বামী তাকে দ্বিচারিণী বলে ত্যাগ করল। নিজের আর ছেলের ভরণপোষণের জন্যে শেষে এক মৃত্যু-পথযাত্রীকে বিবাহ করতে হল।

এর মধ্যে দীর্ঘদিন কেটে গেছে। বিদ্রোহীদের দমন করার পর ন্যায়-বিচারের সময় এসেছে। শাসনকর্তার ছেলেকে অপহরণ করার জন্যে গ্রুসা আর তার ছেলেকে রাজধানীতে বিচারকের সামনে হাজির করা হল। বিচারক সাদা খড়ির বৃত্ত এঁকে তার মধ্যে ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দুই মাকে দু'হাত ধরে টানতে বললেন। যে ছেলেকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারবে, ছেলে তার। শাসনকর্তার স্ত্রী এ প্রস্তাবে আপত্তি করলেন। চাষার মেয়ের গায়ের জোর বেশী, এতো সবাই জানে, কিন্তু গ্রুসা ছেলের হাত ধরে টানতে পারল না। বার বার পুনরাবৃত্তি করা হল। প্রতিবারেই শাসনকর্তার স্ত্রী ছেলেকে নিজের দিকে টেনে নিলেন। তাঁর পক্ষের সকলে উল্লসিত হল; কারণ এই ছেলেটিই শাসনকর্তার বিরাট সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। বিচারক গ্রুসাকে বললেন, তুমি হেরে গেছ। জোর দিয়ে টানলেই জিতে যেতে। গ্রুসা কেঁদে ফেলে বলল, যে ছেলেকে রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে মানুষ করেছি, মাথার ওপর যখন আচ্ছাদন জোটেনি, তখন বুক দিয়ে যাকে আড়াল করে রেখেছি, আজ সে সম্পত্তি পাবে বলে টানাটানি করে তার হাতে কি আমি একটুও ব্যাথা দিতে পারি? বিচারক ছেলেকে গ্রুসার বলে ঘোষণা করলেন—বললেন, কোন কিছু পেতে হলে তা পাবার যোগ্য হতে হবে। প্রেম আর ভালবাসার অধিকার আইনের অধিকারের থেকে অনেক বেশী জোরদার।

রোজ ব্রুফোর্ড স্কুলের ছাত্ররা আট ভাগে বিভক্ত একটি সেটেই সমস্ত

নাটকখানি অভিনয় করলেন। বিভিন্ন দৃশ্যে একই সেটের এক এক অংশকে বিভিন্নভাবে বার বার ব্যবহার করে তাঁরা নাট্যগতিকে একটুকুও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। তাঁদের নিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকের রূপ ও রস চমৎকারভাবে পরিবেশিত হল। গ্রুসার ভূমিকাভিনেত্রী থিয়েটারের নূতন নায়িকাদের বি বি সি থেকে যে পুরস্কার দেওয়া হয়, তার প্রথম পুরস্কারের অধিকারিণী হলেন। রোজ ব্রুফোড স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্বে অবাক হয়েছিলাম, অস্বীকার করব না। নাটক প্রস্তুতির সময় থেকে দেখলাম কি বিরাট পরিশ্রম এঁদের করতে হয়েছে। কেবল অভিনয়ের মহলায় যে দৈনিক ছয় থেকে আট ঘণ্টা সময় দেওয়া হত তাই নয়, প্রতিটি পোষাক প্রতিটি আসবাব, গহনা, অস্ত্র, ব্যবহৃত সেট, নেপথ্যে আওয়াজ, বিশেষ আলো—সমস্তই এঁদের নিজের হাতের সৃষ্টি। জুতো সেলাই থেকে আলপিন পোঁতা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ কাজ এঁরা নিজের হাতে করেছেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে না বলে পারছি না যে, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে, আলো তৈরী এবং আলোক নিয়ন্ত্রণের কাজে নিযুক্ত শতকরা একশজনই মহিলা।

রোজ ব্রুফোড স্কুলের প্রযোজনা দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে ব্রেখটের নাটক প্রযোজনা করতে হলে কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। ব্রেখটের নাটককে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে কেবলমাত্র প্রযোজনার ধারা নয়, সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে অত্যন্ত আধুনিক ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সেজন্য এঁদের এই প্রযোজনার সঙ্গে দর্শক হিসেবে যুক্ত থেকে যে শিক্ষা লাভ করলাম, তা পাঠ্য পুস্তকের পাতায় কখনও শিখতাম কিনা সন্দেহ। দু' বছর পরে যখন লণ্ডনের পেশাদার মঞ্চে ব্রেখটের এই নাটকটির সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় দেখলাম, তখন তাঁদের সেই কৃতিত্বের পূর্ণতা কতখানি অনুধাবন করতে পেরেছিলাম, সেকথা এবার বলব।

আজকাল ব্রেখটের নাটকের প্রসঙ্গ উঠলেই নানা থিওরির আলোচনা করা হয়। ব্রেখট নিজে এই থিওরিগুলি কতখানি ব্যবহার করতেন বা ব্যবহার করে কতটুকু সফলতা লাভ করেছিলেন কিংবা যে ভাবে ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে তাঁর থিওরির কোন পার্থক্য ছিল কিনা এবং থাকলে কতটুকু ছিল এ বিষয়ে এখনও বিভিন্ন মহল থেকে নানা রচনা অনতি ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাব বলে আশা করছি। কিন্তু থিওরির তর্কের বহু ঊর্দ্ধে ককেশীয় চক সার্কেলের যে অপূর্ব্ব প্রযোজনা পরিচালক পিটার হলের নেতৃত্বে রয়েল সেক্সপীয়ার মেমোরিয়াল থিয়েটার করলেন তা বহুকাল নাট্যামোদীরা মনে

রাখবেন। কেবল ব্রেখটের নাটকের অপূর্ব্ব প্রযোজনার জন্তে নয়, ঘূর্ণায়মান মঞ্চকে নূতন ভাবে ব্যবহার করে, তাকে আধুনিক প্রযোজনার ক্ষেত্রে মর্য্যাদার আসন দেবার জন্তেও ককেশীয় চক সার্কেলের প্রযোজনা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

একটু বিশদভাবে বলা যাক্। ঘূর্ণায়মান মঞ্চকে আধুনিক প্রযোজকরা বাতিল করে দিয়েছিলেন। ঘুরে ঘুরে তিন খাঁচার খুপরিওয়ালা ঘর দর্শককে বিশেষ ঠকাতে পারে না, এটা বেশ কিছুদিন যাবত বোঝা গেছে। ওয়াগন ষ্টেজ বা পুরা দৃশ্যটাকে ঠেলে দেওয়া বা টেনে নেওয়া (যেমন আমাদের ষ্টার থিয়েটারে মাঝে মাঝে দেখা যায়) কিছুদিন চলে ছিল। কিন্তু Fly away বা ওপরে দৃশ্যকে টেনে তুলে নেবার পদ্ধতি চালু হবার পর থেকে—দৃশ্য পরিবর্ত্তনের ওটাই শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করা হয়। আমাদের জাতীয় নাট্যশালা রবীন্দ্র সদনের অবয়ব এবং উর্দ্ধগতি দেখে মনে হয় যে ওখানেও এই পদ্ধতিতেই দৃশ্য পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই ঘূর্ণায়মান মঞ্চকে ককেশীয় চক সার্কেলের প্রযোজনার জন্যে ফিরিয়ে আনা এবং নূতন করে ষ্টেজ বানিয়ে স্থাপনা করা বেশ সাহসের কাজ হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষ যত দোষ নন্দ ঘোষের মতো—কোন কারণে নাটক যদি সাফল্যমণ্ডিত না হয় তাহলে ঐ ঘূর্ণায়মান মঞ্চকে দায়ী করা হবে এবং এই পুরাতন পন্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পিটার হলকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হবে।

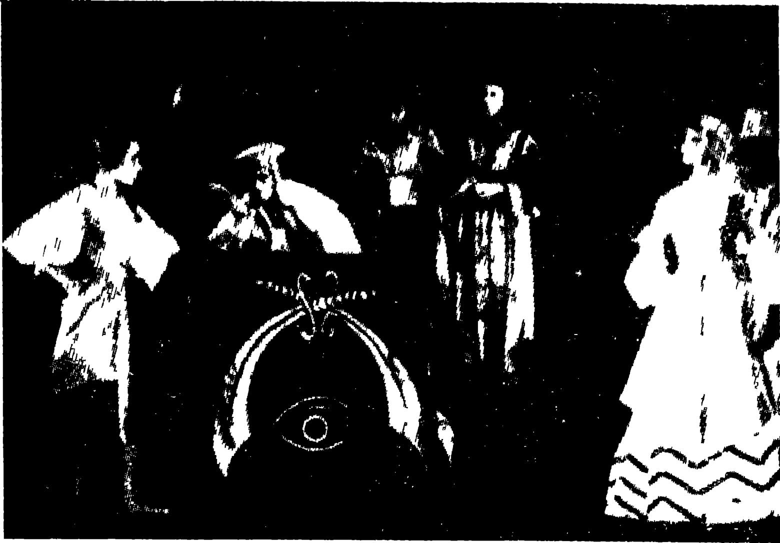
লণ্ডনের পুনর্গঠিত মঞ্চে এই বিখ্যাত পেশাদারী দলের অভিনয় দেখে বিস্মিত হলাম। বিশেষ যাঁরা সেক্সপীয়ারের নাটকের অনুশীলনে খ্যাতিমান হয়েছেন, তাঁরা ব্রেখটের নাটকও 'যে এত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করবেন ভাবতে পারি নি। বিখ্যাত নাট্যসমালোচক ট্রেউইন পথে লণ্ডন নিউজের পাতায় লিখে ছিলেন—ব্রেখটের নাটকের এমন অপূর্ব্ব প্রযোজনা ব্রেখট দেখলে কি বলতেন জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি দেখতে পাবেন না বলে আমরা সত্যি দুঃখিত।

অবাক হয়েছিলাম গ্রুসাকে দেখে। সুন্দরী কোন নায়িকা এ ভূমিকায় নির্বাচিত হননি। দৈহিক সৌন্দর্য্যহীন যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী এক অখ্যাত অভিনেত্রীকে এই বিখ্যাত ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে সূপকারের সহকারিণী ছাড়া সত্যি আর কিছু মনে হয় না। তার প্রেমিক সৈনিক—সেও চব্বিশ বছরের সুন্দর যুবা নয়, বয়স্ক সাঁইত্রিশ বছরের কর্ম্মঠ শক্তিমান এক পুরুষ। আরো অনেকগুলি নূতনত্ব দেখে আশ্চর্য্য হলাম।

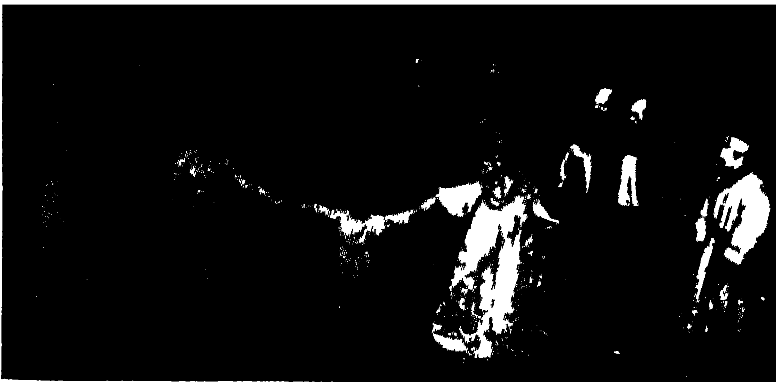
উপর মহলের লোকেরা সকলেই কপাল থেকে নাক পর্য্যন্ত মুখোশ পরে অভিনয় করলেন। সাধারণের থেকে তাঁরা পৃথক তা ঐ মুখোশের ব্যবহারেই স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হল।

আমাদের দেশে ষ্টেজ ঘোরে অভিনয় শেষ হবার পর, দৃশ্য পরিবর্ত্তন উপলক্ষ্যে। হল ষ্টেজ ঘোরালেন নাটকের মাঝে নাটকের গতিবেগকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। পূর্ণ আলোর ঘূর্ণায়মান মঞ্চ অভিনয়কে সাহায্য করল, নাটকের প্রায়োজনকে পূর্ণ করল। প্রমাণ করল অন্ধকারে মঞ্চ ঘোরাবার দিন শেষ হয়েছে। বিদ্রোহের সূচনা থেকেই ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ব্যবহার সুরু হল। সমস্ত মঞ্চটিও সম্পূর্ণ খালি রাখা হল। এমন ভাবে আলোগুলিকে যথাস্থানে বসাবার পর ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে মঞ্চ ঘুরতে থাকে যাতে আলোগুলিও চতুর্দ্দিকের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছায়ার সঙ্গে ঘুরতে থাকে। ঠিক সেই সময়ে দর্শক দৃষ্টির ওপরে স্থাপিত একটি গোলাকৃতি বহুমুখবিশিষ্ট আয়নার বল এবং সম্ভবতঃ আরো দুটি আলোক-মালাকে ষ্টেজ যেদিকে ঘুরছে তার বিপরীত দিকে একই গতিতে ঘোরান হয়। তার মাঝে স্বল্পালোকে অভিনয় চলে, আওয়াজে আর অভিনেতাদের দৌড়াদৌড়িতে বিদ্রোহবিহ্বল সহরের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। যখন মঞ্চ ঘোরা থামে, দিনের স্পষ্ট আলোয় ছায়ার নৃত্য যখন বন্ধ হয়, তখন দর্শকের মনও যেন গ্রামাঞ্চলের সহজ বাতাসে নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। গ্রুসার দীর্ঘ পদযাত্রা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ দিয়ে বোঝান হয়। মঞ্চ যে দিকে ঘোরে গ্রুসা তার বিপরীত দিকে হেঁটে চলে, ফলে গতিশীল অঙ্গসঞ্চালন ও সত্যি করে হাঁটা সত্বেও দর্শকের ঠিক সামনে থেকে কিছুদূরে সরে যেতেও বেশ সময় লাগে। কেবল গ্রুসা নয় স্বয়ং বিচারকও এই মঞ্চকে গতিশীলতার জন্যে ব্যবহার করেন। কাঠের ঘোড়ার ওপর চেপে গ্রামাঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি মঞ্চের গতির সঙ্গে ঘুরে যথাস্থানে নেমে পড়েন। এইভাবে তিনি যে একজায়গা থেকে অন্যত্র চলে এলেন তা স্পষ্ট বোঝান হয়। ঘূর্ণায়মান মঞ্চকে সব থেকে সফল ব্যবহার করা হয়েছে মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে। একই সেটের সামনের দিক ও পেছন দিক দুই দৃশ্যের জন্য তৈরী করা হল। সেটটি যখন মঞ্চের ডানদিকে ছিল তখন দেখতে ছিল একরকম, কিন্তু ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সঙ্গে ঘুরে সেটি যখন বাঁদিকে এল তখন আগের সেটটিরই কেবল পেছনের দিক আমাদের চোখের সামনে এল এবং এটি আগের সেটটির থেকে বা এই সেটেরই সামনের দিকের থেকে একেবারেই ভিন্নভাবে তৈরী। উদাহরণ দি—ষ্টেজের বাঁদিকে থাকাকালীন

হয়তো এটা ছিল কোন চাষী দম্পতীর দু'কামরা বিশিষ্ট আস্তানা, ঘুরে যখন বাঁদিকে এল তখন হয়ে গেল হয়তো গ্রুসার দাদার এক কামরাবিশিষ্ট খাবার ঘর। অর্থাৎ একই সেটের দু' দিকই সাজান রয়েছে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের সুবিধার জন্যে। এই রকম ছোট ছোট সেটে এই নাটকের অভিনয় চয়েছে,



বিচারের দৃশ্য। রোজ ব্রুফোর্ড স্কুলের অভিনয়ে।



বিচারের দৃশ্য। অলডুইচ থিয়েটারে

খুব বড় সেট কখনই ব্যবহার করা হয় নি। সব থেকে বড় দ্বিমুখী সেটটিও ঘূর্ণায়মান মঞ্চের এক চতুর্থাংশের বেশী নয়। আর ঘূর্ণী চৌকির চারপাশে সাড়ে চার ফুট থেকে ছয় ফুট পর্য্যন্ত (সামনে ও পেছনে) জায়গা রাখা হয়েছে অভিনয়ের সুবিধার জন্যে। ষ্ট্র্যাটফোর্ড অন অ্যাভনে সেক্সপীয়ারের টেমিং অফ দি শ্রু নাটকের সেটেও এ দ্বিমুখী মঞ্চ পরিকল্পনায় ঘূর্ণী মঞ্চের ব্যবহার দেখেছিলাম। তবে সেখানে বিরাট দ্বিতল সেট ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ঠিক মাঝখান দিয়ে শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। কখন এক দিক কখন অন্য-দিককে নাটকের প্রয়োজনে দর্শকের সামনে আনা হচ্ছিল। সমস্ত নাট্য ঘটনা এই দু'টি সেটেই সীমাবদ্ধ ছিল। ককেশীয় চক সার্কেলের বেশীর ভাগেই বহু ছোট ছোট সেট ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকের গতিকে ব্যাহত না করে, নাটককে এক মুহূর্ত্তের জন্যে বন্ধ না রেখেও যে প্রতি দৃশ্যের উপযোগী বিভিন্ন সেট ব্যবহার করা যায়, এ নাটকটি না দেখলে তা কখনও জানতে পারতাম না।

অলডুইচ থিয়েটারে ককেশীয় চক সার্কেলের অভিনয় সব দিক থেকে একটি পরিপূর্ণ প্রযোজনা।। পরিচালক পিটার হল এবং রয়েল সেক্সপীরিয়ান নাট্যগোষ্ঠী যে সফলতা লাভ করেছেন তা কেবলমাত্র অভিনয়ের জন্যে হয়নি, কিংবা সেটের নূতনত্বের জন্যও হয়নি—অভিনয়, সেট, আলো সমস্ত একসঙ্গে মিলিয়ে ব্রেখটের বক্তব্যের প্রকাশ এই নাট্য প্রযোজনার শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি। ইংলণ্ডের দর্শক এই নাটক যে ভাবে গ্রহণ করলেন, তাতে ব্রেখটের রচনার উৎকর্ষই আবার প্রমাণিত হল। তাঁর রচনা যে আধুনিক যুগের নাট্যকারদের ওপর সব থেকে বেশী প্রভাব বিস্তার করবে, সে বিষয়ে রয়েল সেক্সপীরিয়ান থিয়েটারের প্রযোজনা দেখে আমার মনে আর কোন সন্দেহ থাকল না। স্পস্ট বুঝলাম ভবিষ্যতে নাটক ব্রেখটের প্রদর্শিত পথের অনুগামী হবে।

ব্রেখট সম্বন্ধে একটি চিন্তা

আজকাল বেরটোল্ট ব্রেখট সম্পর্কে প্রায়ই নানা আলোচনা শোনা যায়। বিদেশের আধুনিক থিয়েটার মহলে ব্রেখটের নাম জানা কিম্বা তাঁর সম্পর্কে দু'চার কথা বলা প্রায় ফ্যাসানের পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এদেশেও সে চিন্তাতরঙ্গ এসে পৌচেছে। ব্রেখটের রাজনৈতিক মত, তাঁর চিন্তা, তাঁর কীর্ত্তি সম্পর্কে প্রচণ্ড তর্কে মেতে ওঠার লোক এ দেশেও দেখেছি। সেজন্য ব্রেখটের সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলার তাগিদ অনুভব করছি।

ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে, মাত্র সেদিন ১৯৫৬ সালে ব্রেখট মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যু নিয়ে এ দেশে বিশেষ শোকাশ্রুবর্ষণ হয়নি। সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বলেও মনে পড়ে না। হলেও সেটা বড় খবরের পর্য্যায়ে পড়েনি, অথচ নবনাট্য আন্দোলন তখন সরবে আগিয়ে চলেছে। আরো এক ঘটনা ব্রেখটের সম্পর্কে এই ঔদাসীন্যকে প্রকাশ করল। ১৯৬০ সালে অ্যালবের ক্যামুর মৃত্যু হল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সম্পর্কে নানা প্রবন্ধে ও রচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্যকে সম্মান জানান হল। তাঁর জীবনী আলোচনা করে তাঁর কীর্তির মূল্যায়ন করা হল, তাঁর অকাল মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ যথাযোগ্যভাবেই করা হয়েছিল। এই জন্যেই আরো আশ্চর্য্য লাগে যখন দেখি ব্রেখট তাঁর ৫৮ বছরের জীবনের অধিকাংশ কালই নাটকের রচনায় ও প্রযোজনায় কাটালেন অথচ তাঁর সম্পর্কে আমরা খোঁজ রাখিনি কেন না ইউরোপের নাটকের জগতে কি ঘটছে তা জানাবার কোন উপায় না থাকাই প্রধান কারণ। ইউরোপের নাট্যসমাজ ব্রেখটের নাটকের উৎকর্ষ স্বীকার করলেও ব্রেখট নামের লোকটিকে ভয় করে এসেছে। তাই যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন তাঁকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে—তাঁর নাটকের প্রশংসা করতে ভয় পেয়েছে। তাঁর জীবন, তাঁর মতামত, তাঁর রাজনীতি, তাঁর অশান্ত সঞ্চরণ বিভিন্ন দেশে দেশে—নাট্যকার ব্রেখটের সামাজিক জীবনের পূর্ণ প্রকাশকে বার বার ব্যাহত করেছে। তারপর যেদিন ব্যক্তির মৃত্যু হল কেবল তাঁর কীর্ত্তি বেঁচে রইল তাঁর শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিসৌধ হয়ে, সেদিন আর তাঁর নাটকের সম্পর্কে কিছু না বলে রেখে দেবার প্রয়োজন হল না, সেদিন প্রশংসার বাণীকে আগলে রাখার কারণ থাকল না।

এদিক থেকে ব্রেখট, বার্ণাড শ'র ঠিক বিপরীত। বার্ণাড শ'র জীবদ্দশায়

তাঁর নাটক নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। এমন কথাও কেউ কেউ বলতে সাহস করেছেন যে নাটক সৃষ্টির শেষ শিক্ষা বার্ণাড শ' দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত গতি সুরু হয়ে গেল। তাঁর নাটক, প্রবন্ধ, বক্তব্যকে শুধু মাত্র কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল না—কেউ কেউ এ কথাও বললেন যে, বার্ণাড শ'র কোন দিন নাটক লিখতে জানতেন না—তাঁর লেখা নাটকগুলি—ওই নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। একেই বোধহয় ষোলকলা পূর্ণ হওয়া বলে। ব্রেখটের ভাগ্যদোষে তাঁব জীবনে কোন সুনাম এল না কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে অনেকে তাঁকে অভিহিত করেছেন।

গত এক বছরের মধ্যে শুধুমাত্র লণ্ডন সহরের পেশাদারী মঞ্চগুলিতে তাঁর পাঁচখানি নাটক দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত হয়েছে। নিউ ইয়র্কে ব্রেখ্টজ্বর অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিল তার ফলে তাঁর অর্দ্ধ-সমাপ্ত, অসমাপ্ত নাটকগুলি পর্য্যন্ত অভিনীত হতে লাগল। আট নয়খানি নাটক বা 'ট্রায়াল অফ লুকুলুস' বাদে ব্রেখটের সমস্ত নাটক গত দু'বছরে নিউইয়র্ক মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। প্যারিসেও গত এক বছরে চারখানি নাটকের অভিনয় হয়েছে। ব্রেখট অনুরাগীগণ এতেও তৃপ্ত হলেন না। ব্রেখটের নানা রচনা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ থেকে সঙ্কলিত এক নাট্যরূপের নাম দেওয়া হল 'ব্রেখট অন ব্রেখট' বা ব্রেখ্টের সম্পর্কে ব্রেখ্ট। ব্রেখটের বিধবা মাদাম লটি লেন্যা—লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক ও প্যারিসে এই 'মনোলগ'টি অভিনয় করলেন।

ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে ব্রেখটকে নিয়ে এই যে হৈ চৈ চলছে তার পেছনে কতখানি উচ্ছ্বাস আর কতখানি প্রশংসা তা বিচার করবার দিন এখনও আসেনি। আজকে আমবা মাত্র গুটিকতক স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌচেছি। ব্রেখটের চিন্তা এবং ব্রেখটের নাটক ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক নাট্যকারদের সব থেকে বেশী প্রভাবিত করেছে। ব্রেখটের নাট্যআঙ্গিক অর্থাৎ দৃশ্য পরিবর্ত্তনে জন্যে অযথা সময় নষ্ট না করে অভিনয়কে অবিরাম গতি দেওয়া, পুরাতনপন্থী নাট্যপ্রযোজকদেরও গ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁরা সেক্সপীয়রের সময়কার প্রযোজনাধারার দোহাই দিয়ে এই অতি আধুনিক রীতিকে ব্যবহার করছেন। ব্রেখটের সৃষ্ট নাট্যগোষ্ঠী, 'বের্লিনের আনসাম্বল' দলগত অভিনয়ের যে ঐতিহ্য তৈরী করেছে—পৃথিবীর বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী তা পরমশ্রদ্ধায় অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। চিচেষ্টাব থিয়েটারে অভিনয়ের ফাঁকে নাটকশিক্ষা বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল। আগে হতে

পরিচয় থাকায় একসঙ্গে কফি খেতে বসে তার কাছে 'বের্লিনের' আনসাম্বলে'র গল্প শুনলাম। অভিনয়ের ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় তাদের অভিনয় ছেলেটির মনঃপূত হয়নি—কিন্তু দলগত অভিনয়ে তারা ইংলণ্ডের যে কোন দলকে হারিয়ে দেবে একথা তিনি স্বীকার করলেন। বিখ্যাত পরিচালক পিটার ব্রুক এই দলটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—যে 'একঘরে একদল লোককে বন্দী করে রেখে যদি অত্যন্ত পরিমিত খাবার দেওয়া যায় এবং সেই খাবার যদি সকলে মিলে দিনের পর দিন মিলেমিশে ভাগ করে খায়; যদি মাত্র পাঁচটি বিছানায় ত্রিশজন লোককে দৈনিক রুটিন মাফিক বছরের পর বছর ঘুমুতে বাধ্য করা হয়—কেবলমাত্র তা হলেই দলগত অভিনয়ে এমন শৃঙ্খলা আসা সম্ভব।' কাজেই বের্লিনের আনসাম্বলের সৃষ্টি যে ব্রেখটের মহৎ কীর্ত্তির অন্যতম এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কীর্তি মহত্তর মনে হবে ব্রেখটের জীবনী আলোচনা করলে।

প্রথম মহাযুদ্ধে ষোল বছরের তরুণ ব্রেখট হলেন ডাক্তারের সাহায্যকারী। ব্রেখট লিখেছেন—'তখন আমায় কেবল হুকুম তামিল করতে হত।" 'পা কেটে ফেল বললেই পা কেটে বাদ দিতাম। ট্রেপ্যানিং করার হুকুম পেলেই তার খুলির মধ্যে তুরপুন ঢুকিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতাম।' কৈশোর থেকে যৌবন এল যুদ্ধের মাঝে, রক্ত, হিংসা আর মানুষের জীবনের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের চরম ঔদাসীন্যের মধ্যে, কিন্তু জার্মাণী বেশীদিন ব্রেখটের সহ্য হল না। ১৯৩৩ সালে হিটলারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী ব্রেখট দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। তারপর সুদীর্ঘ পনের বছরের বিদেশে বসবাসের ইতিহাস। কখন আমেরিকায়, কখন সুইজারল্যাণ্ডে, কখন স্ক্যাণ্ডেনেভিয় দেশগুলিতে ব্রেখটের সময় কাটল। ১৯৪৮ সালে অস্ট্রীয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও তিনি পূর্ব্ব বের্লিনে স্থায়ী বাসের ঘর বাঁধলেন। এখানেই সুরু হল 'বের্লিনের আনসাম্বল' গঠনের কাজ—এখানেই তাঁর নাটক প্রযোজিত হতে থাকল। ব্রেখট সাম্যবাদী ছিলেন কিনা এ নিয়ে আজও বিবাদের অন্ত নাই। চুলচেরা বিচার করে কেউ কেউ বলেছেন যে, ব্রেখটের মনের বিশ্বাস সাম্যবাদী ছিল না, যদিও রাজনীতিতে তিনি সাম্যবাদী মতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। সূক্ষ্মতম বিচার করে কেউ দেখিয়েছেন যে, ব্রেখটের সাম্যবাদ এত উচ্চ পর্য্যায়ের ছিল যে প্রচলিত দৈনন্দিন সাম্যবাদের সঙ্গে তার মিল পাওয়া কঠিন। সহজ ভাষায় বলা যায় যে, রাজনৈতিক মতবাদে সাম্যবাদকে পছন্দ করলেও সাম্যবাদী বলতে আমরা যা বুঝি, তা তিনি ছিলেন না। তিনি

ছিলেন কবি, ছিলেন মানবদরদী নাট্যকার, ছিলেন সত্যাশ্রয়ী দ্রষ্টা। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিতে সাম্যের বক্তব্য মানবপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে, কৃষকের ব্যথা দরদী কবির লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে, সংগ্রামের বাণী ভবিষ্যতের অসৌজন্যকে সাবধান করে দিয়েছে। ব্রেখট যে কত বড় প্রতিভা ছিলেন আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি তাঁর নাটক দেশকালপাত্রকে অতিক্রম করে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্যালিলিওর জীবন অবলম্বনে লেখা নাটক জ্ঞানের প্রকাশের বিরুদ্ধে কুসংস্কারের প্রতিপত্তির চিরাচরিত ইতিহাস। ককেশীয় চক সার্কেল সহজ ভালবাসার সঙ্গে অর্থের আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব। ব্রেখটের শ্রেষ্ঠতম এই নাটক দুটি বাংলা ভাষায় অতি শীঘ্র অনূদিত হয়ে অভিনীত হলে আনন্দিত হব। কারণ, ব্রেখটের নাটক যে কোন দেশে যে কোন সময়ে অভিনীত হতে পারে এটাই তাঁর রচনার বিশেষত্ব, এটাই তাঁর রচনার বিরাটত্ব।

ব্রেখট আধুনিক নাট্যকারদের সব থেকে বেশী প্রভাবিত করেন; তার প্রধান কারণ আধুনিক যুগের চিন্তাধারা ব্রেখটকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। গত শতাব্দীতে নাট্যকার ষ্ট্রীণ্ডবার্গ যেমন তাঁর সময়ের শিল্প, বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তাকেই নাটক সৃষ্টির সহায়ক করেছিলেন ব্রেখটও তেমনি তার কালের শ্রেষ্ঠতম চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছিলেন। ষ্ট্র্যাভিনিস্কি, ককটো, ক্লডেল ও মিলস্টেনদের বিভিন্ন শিল্পকর্ম্ম ব্রেখটের মনকে ছুঁয়েছিল। পিরানদেল্লো, হিণ্ডেমিথ ও চার্লি চাপলিন, পিকাসো ও ম্যাটিসে, মার্কস ও কিয়েরকাগ্রাড, সিনেমা ও ফটোগ্রাফির প্রত্যক্ষ প্রভাবের সংমিশ্রণে যে নাটক ব্রেখট সৃষ্টি করলেন, তা কাব্যসুষমায় যেমন ভরপুর, বক্তব্য প্রকাশে তেমনি বলিষ্ঠ, অভিনয় উপযোগিতায় তেমনি সতেজ। ইবসেন ও বার্ণাড শ' উভয়েই মূলতঃ ছিলেন গদ্যলেখক তাই তাঁদের বক্তব্যের প্রকাশ হয়েছে প্রচণ্ড সজীবতার মধ্যে। ব্রেখট মূলতঃ কবি—তাই তাঁর নাটকের বিরস প্রকাশও অপূর্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত। মাদার কারেজের মা, থ্রিপেণি অপেরার ডাকাত সর্দ্দার, আর দি গুড উম্যান অফ সেটজুনের মহিলা—সকলেই প্রচুর অন্যায় কাজ করা সত্ত্বেও কখনই আমাদের সমবেদনা লাভে বঞ্চিত হননা। উপরন্তু প্রচলিত নিয়মে তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরে দর্শক ক্ষুণ্ণ না হয়ে আনন্দিত হন। কোন সমালোচক এমন কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ব্রেখটের কবিসত্তার কাছে তাঁর রাজনৈতিক সত্তা বার বার পরাজিত হয়েছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে হার-জিতের কোন প্রশ্নই নাট্যকারের মনে আসেনি। বক্তব্যের সুষ্ঠু

প্রকাশের জন্য তাঁর কাব্যাশ্রয়ী মন উপযুক্ত প্রকাশ ভঙ্গিমা বেছে নিয়েছে— যার ফলে আমরা আধুনিক যুগের কয়েকখানা শ্রেষ্ঠ নাটক তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। রোমান্টিক নাটকের কবরে চরম ও বৃহত্তম কাঁটা ব্রেখট মারলেন। বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী বক্তব্যধর্মী নাটকের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে তিনি নূতন নাট্যযুগকে ত্বরান্বিত করলেন, স্বাগত জানালেন।

এই পথ বেয়ে নূতন নাট্যকার এলেন তাঁদের নূতন নাটক নিয়ে। এলেন আরডেন, বোণ্ট, হুইটিং ও শাফার, সকলে নাট্যকার, এলেন লিটলউড পিটার হল প্রভৃতি পরিচালকগণ। এদের নাটক রূপে, ভঙ্গিমায়, বক্তব্যে আগেকার নাটকের থেকে এত পৃথক যে দর্শক, সমালোচক ও প্রযোজক সকলেই প্রথমে দিশেহারা হয়ে গেলেন। পিকাসো ও ম্যাটিসে যেমন শিল্পকলাকে বুদ্ধিজীবীর চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন ব্রেখটও তেমনি দৃষ্টির দাসত্ব থেকে নাটকের মুক্তির কথা ঘোষণা করে গভীর চিন্তার ভিত্তির ওপর বিংশ শতাব্দীর নাটককে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন।

যুগ প্রবর্তক ব্রেখট

আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় বের্‌টোল্ট ব্রেখটের নাটক নিয়ে খুব হৈচৈ সুরু হয়েছে। বিশেষ করে লণ্ডন ও নিউইয়র্কে ব্রেখটের নাটক প্রায়ই অভিনীত হচ্ছে। প্রথমে স্বল্পজনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বার বার ভাল ভাল দল ব্রেখটের বিভিন্ন নাটক অভিনয় করেছেন। গত এক বছরের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে, শুধুমাত্র লণ্ডন সহরেই পেশাদারী দলগুলি তাঁর পাঁচখানি নাটক দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করেছেন। অপেশাদারী দলগুলিও পিছিয়ে থাকেননি তাঁরাও ব্রেখটের তিনখানি নাটক অভিনয় করেছেন। মাদার কারেজ, চক সার্কেল আর ত্রিপেণী অপেরাই ব্রেখটের জনপ্রিয় নাটকগুলির অন্যতম। নিউইয়র্কে ব্রেখট দেখা দিয়েছেন আধুনিকতম ফ্যাসানের রূপে। ব্রেখট সম্বন্ধে আলোচনা করতে না পারা বা ব্রেখটের নাটক অভিনয় না করে কেউই পিছিয়ে থাকতে চান না। এক বছরের হিসেবে তাই দেখি ব্রেখটের ট্রায়াল অফ্ লুকুলুস বাদে প্রায় সব, অর্থাৎ আট নয়খানি নাটক অভিনীত হয়েছে। ব্রেখট অনুরাগীগণ এতেও তৃপ্ত হলেন না। ব্রেখটের চিঠিপত্র, নানা রচনা ও প্রবন্ধ থেকে সংকলিত এক নাট্যরূপের নাম দেওয়া হল ব্রেখট অন্ ব্রেখট। নিউইয়র্ক ও প্যারিসে ব্রেখটের বিধবা মাদাম লটি লেন্যা এই একচরিত্র নাটকটি অভিনয় করলেন।

আমেরিকাতে ব্রেখটের জনপ্রিয়তা এখনও off Broadway তে সীমাবদ্ধ। লণ্ডনে যদিও রয়াল সেক্সপিরীয়ান দল ককেশীয় চক সার্কেলের অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন, এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী পেগী অ্যাসক্রফট গুড উইম্যান অফ সেটজুনের অপূর্ব রূপারোপ করেন তাহলেও ব্রেখটের নাম লণ্ডনবাসীর মনে আজও কোন অনুপ্রেরণার সূচনা করে না। কেবলমাত্র ব্রেখটের নাম শুনে অভিনয় দেখতে গেছেন এমন লোক ইংলণ্ডের নাটুকে মহলে নিশ্চয় আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তার ওপর নির্ভর করে দীর্ঘদিন অভিনয় চালান যায় না। সেণ্ট জোয়ান অফ স্টকইয়ার্ডের অসাফল্যের পেছনে পাকা থিয়েটার দেখিয়েদের কুণ্ঠার ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

আজকে ভাবতে সত্যি অবাক লাগে যে, দশ বছর আগেও ব্রেখটের নাম নাট্যজগতে প্রায় অজানা ছিল। ইংলণ্ডে ব্রেখটের প্রথম নাটকের অভিনয়

উল্লেখযোগ্য ঘটনার পর্যায়ে পড়েনি। ১৯৪৭ সালে ওয়াশিংটনে ব্রেখটকে ডেকে পাঠান হল আন আমেরিকান এ্যাক্টিভিটি কমিটির প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য। এখানে ব্রেখটকে অতি সাধারণ ভদ্রতাও দেখান হল না। তিনি যে একজন খ্যাতনামা নাট্যকার এ খবর এই কমিটি জানতেন বলে মনে হয় না। এই প্রশ্নোত্তর আজ প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে জানতে পারি যে, ব্রেখটের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কমিটি তর্জন-গর্জন কম করেননি। অথচ ১৯৪১ সালে ক্যালিফোর্ণিয়াতে ব্রেখটের গ্যালিলিও নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। বিখ্যাত আমেরিকান নাট্যকার ওডেটসএর সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং ছায়াছবির নাটক লিখে দেবার জন্য খ্যাতনামা প্রযোজকগণ ব্রেখটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্বদেশের বাইরে ব্রেখট প্রতিভা অজানা ছিলনা। জীবদ্দশাতে ব্রেখটকে নাট্যসমাজ সম্মান জানাতে পারেননি এ কলঙ্ক দুরপনেয়। ১৯৫৬ সালে ব্রেখটের মৃত্যু প্রায় অজানা ঘটনা। এদেশে তো নয়ই বিদেশেও ব্রেখটের অভাবের তাৎপর্য বুঝতে সময় লেগেছিল।

এই সব ঘটনার অনুসন্ধানে একটা জিনিষ স্পষ্ট বোঝা যায়। ব্রেখট ছিলেন আগামী দিনের নাট্যকার এবং ভবিষ্যতের দিগনির্দেশক যুগগুরু। স্বভাবতঃই সমসাময়িকের দৃষ্টিতে তার প্রতিভাকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর অবর্তমানে তাঁর নাটক বেশী অভিনীত হচ্ছে, পঠিত হচ্ছে নাট্যজগৎ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছে যে, ব্রেখটের রচনায় ও নাট্যধারায় দেখা দিয়েছে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ, নয়াজীবনের নাটক, দিগনির্দেশক মশাল। ব্রেখটের গভীরে তাই ডুব দেওয়া সুরু হয়েছে। তাঁর বক্তব্য আর নাট্যরেখা নিয়ে সুরু হয়েছে আলোচনা। তাঁর প্রদর্শিত পথে অভিনয় হচ্ছে নাটক।

এই খানেই বার্ণাড শ'র সঙ্গে ব্রেখটের জীবনের সব থেকে বড় তফাৎ। শ'র তাঁর জীবদ্দশায় সুনামের শিখরে অবস্থান করেছেন কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর নাটকের ওপরও নেমে এসেছে গ্রহণ। ব্রেখট যতদিন বেঁচেছিলেন প্রতিভা হিসাবে স্বীকৃতি পান নাই। মৃত্যুর পর চলেছে তাঁর বিজয়রথ। ভাষার রাজত্বে শ' ছিলেন রাজা কিন্তু ভাবের রাজত্বে তাঁকে পুরাতন বিশ্বাস ও প্রচলিত নিয়ম মেনে চলতে হয়েছে। কাহিনীর দাসত্ব থেকে তাই শ' নাটককে মুক্ত করতে পারেননি। চরিত্র তাই তাঁর নাটকের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। অ্যারিস্টোটল নাটকের সংজ্ঞা নির্দেশ করে যে শৃঙ্খলে নাট্যলক্ষ্মীকে বাঁধলেন তা ভাঙবার সাহস এই বিশশত বছরে কারু হয় নাই।

মাঝে মাঝে ঘা পড়েছে শেকলে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক এই আরিস্টোটোলীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন কিন্তু কোন ব্যবস্থাই নাট্যশৈলীকে বন্ধনমুক্ত করে নাই।

ব্রেখটের anti-illusion থিয়োরী এই শেকলকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। illusion এর গণ্ডী থেকে ছাড়া পেয়ে নাট্যশিল্প ব্রেখটকে প্রণতি জানাল নূতন যুগের দিশারী বলে। ব্রেখট নাটকের illusion কে অস্বীকার করলেন। তিনি জানালেন, অভিনয় দেখতে এসে কেউ যদি ভুলে যায় যে, সেটা অভিনয় তাহলে অভিনয়ের প্রথম উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। তিনি তাঁর নাটক তাই এমনভাবে রচনা করলেন যাতে অভিনয়ের ভাবটা সর্বদা রক্ষিত হয়। ব্রেখট আরো বললেন যে নাটক একটা প্রয়োজনহীন ছেলেখেলা নয়, সেটা অবকাশ বিনোদনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও নয়। নাটক জীবনের এক প্রয়োজনীয় শিল্প। নাটক দেখতে এসে শ্রোতাদের নিজেদের সঙ্গে তর্ক করতে হবে। বিচার বিবেচনা করে সত্যকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে জীবনে ব্যবহার করতে হবে। ইলিউশান সৃষ্টির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যেমন অভিনয় শিল্প বেঁচে গেল তেমনি বেঁচে গেল নাটক। অভিনয়ের রীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন আঙ্গিকে নাটক রচিত হতে লাগল। দেখা গেল কাহিনীর দাসত্ব করা থেকে নাটক ছাড়া পেয়েছে। ব্রেখটের সঙ্গে এক নূতন যুগ সুরু হল।

সার্তরের অস্তিত্ববাদ দর্শন এই যুগের আর একটি স্পষ্ট চিহ্ন। সাহিত্য ও শিল্পজগৎকে সার্তরের দর্শন যে ভাবে নাড়া দিয়েছে তেমন আর কিছুতে দেয়নি। কিন্তু পুরাতন নাটকের আঙ্গিকের মধ্যে এই দর্শনের প্রকাশ সহজ ছিল না। ব্রেখটের এন্টিইলিউশান নূতন আঙ্গিকের মাধ্যমে অস্তিত্ববাদের প্রকাশকে সহজ করল। অভিধানের নিযুক্ত ধারাগুলি থেকে ছাড়া পেয়ে তাই নব নব ধারায় নাটকের গতি দেখতে পাই।

কেবলমাত্র নাট্যধারা এবং নাট্য আঙ্গিকে নয় বিষয়বস্তুতেও ব্রেখটের প্রভাব বর্তমানকালের ওপর সমধিক। ককেশীয় চক সার্কেলের অনুপ্রেরণা বিশিষ্ট ইংরেজ নাট্যকারদের মধ্যে বর্তমান। মাদার কারেজের প্রেরণায় সৃষ্টি হচ্ছে সাধারণ ব্যক্তি মানসের ক্ষমতা ও অধিকারবোধ, আমৃত্যু সংগ্রামের প্রচণ্ড প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সন্দেহ করে যে সব নাটক রচিত হচ্ছে, ব্রেখটের মেহগণি সহর তাদের ওপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। রাজনৈতিক নেতাদের ব্যঙ্গ করা নাটক অনস্বী-

কার্যভাবে ব্রেখটের হিটলার দ্বারা অনুপ্রাণিত। ব্রেখটের গ্যালিলিওর অপূর্ব সৌন্দর্য দীর্ঘকাল আগামী দিনের নাট্যকারদের সামনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো পথ দেখাবে। প্রমাণ করবে বারবার ব্রেখট কেবলমাত্র একজন দরদী নাট্যকার ছিলেন না, ছিলেন তিনি কবি, দৈনন্দিনের উর্ধ্বে ওঠা শিল্পী, ছিলেন সত্যাশ্রয়ী দ্রষ্টা। তাই তাঁর প্রতি নাটকে মানবপ্রেমের বিভিন্ন রূপান্তর দেখি, মায়ের ব্যথা তাঁর দরদী লেখনীতে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, সংগ্রামের বাণী তেমনি সাবধান করে দিয়েছে ভবিষ্যতের অসৌজন্যকে। আজ ব্রেখট প্রতিভার সাক্ষর দেশে দেশে পৃথিবীর সর্বত্র বিকশিত হয়েছে। বর্তমান যুগকে তাই ব্রেখটের যুগ বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি না। দুই হাজার বছর পর নাট্যজগতে এসেছে নবচেতনা, নবজাগরণ, যার স্রষ্টা ব্রেখট।

ব্রেখটের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর নাটক এবং তাঁর সৃষ্ট নাটুকেগোষ্ঠী বের্লিনের এনসাম্বল। পূর্ব জার্মাণীর অন্তর্গত পূর্ব বের্লিনে এই নাট্যগোষ্ঠী আজও তাঁর বিভিন্ন নাটকের অভিনয় করে চলেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যদল-গুলির মধ্যেও বের্লিনের এনসাম্বল অসামান্য। দলগত অভিনয়ের যে ঐতিহ্য এঁরা তৈরী করেছেন, তা পৃথিবীর অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠী পরম শ্রদ্ধায় অনুকরণ করে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পরিচালক পিটার ব্রুক লণ্ডনে বের্লিনের এনসাম্বলের অভিনয় দেখে লিখেছেন 'এক ঘরে একদল লোককে বন্দী করে রেখে যদি অত্যন্ত পরিমিত খাদ্য দেওয়া যায় এবং সেই খাবারকে যদি দিনের পর দিন সকলকে ভাগ করে মিলেমিশে খেতে হয়, মাত্র পাঁচটি বিছানায় দৈনিক রুটিন করে যদি ত্রিশজন লোককে বছরের পর বছর ঘুমুতে বাধ্য করা যায় কেবলমাত্র তাহলেই দলগত অভিনয়ে এমন শৃঙ্খলা আনা সম্ভব।'

ব্রেখটের কীর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। নাট্যজগতে এক নূতন যুগকে তিনি কেবল সৃষ্টি করেন নাই নিজের কর্মের ভেতর দিয়ে তাকে কায়েম করেছেন। আজ ব্রেখটের স্মৃতি কোন সৌধের অপেক্ষা রাখেনা। তাঁর নাটক যে জয়স্তম্ভ রচনা করেছে তা কালের গতিকে অস্বীকার করে অমরতা পেয়েছে। নাটকের ইতিহাসে ব্রেখটের নাম চিরকাল বড় হরফে লেখা থাকবে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কখনও মলিন হবে না। ভবিষ্যতের নাট্যকারদের কাছে ব্রেখটের কীর্তি চিরকাল হবে আগিয়ে যাবার স্বাক্ষর, নূতন পথ কাটবার প্রতিশ্রুতি।

আমাদের গুরু সার্ত্র

জর্জ বার্নার্ড শ' লিখেছিলেন—আলফ্রেড নোবেল ডাইনামাইটের আবিষ্কারক। ডাইনামাইট একটি অত্যন্ত তেজবান বিস্ফোরক। মানুষের হাতে ডাইনামাইট এক বিরাট শক্তি। ডাইনামাইটের আবিষ্কারে মানুষের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেবলমাত্র ধ্বংসের কাজে ডাইনামাইটের ব্যবহারই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নোবেল আর একটি বিশ্ববিখ্যাত কাজ করে গেছেন। তিনি নোবেল প্রাইজ সৃষ্টি করে গেছেন। একই পিতার সন্তান সমগোত্রীয় হওয়াই স্বাভাবিক। নোবেল প্রাইজ তাই ডাইনামাইটের চরিত্র পেয়েছে দেখে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নাই।—আজ এই নোবেল প্রাইজের আলোয় গুরু সার্ত্র-এর প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হচ্ছে এটা সত্যই অত্যন্ত লজ্জার কথা।

নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করা সার্ত্র-এর পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এটা তাঁর জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা নয়—তাঁর আজীবনের সুচিন্তিত নিয়মিত জীবন পদ্ধতি। অস্তিত্ববাদের ঋষিকে অর্থ কিংবা ক্ষমতার প্রলোভন দেখান কঙ্কালে করাঘাত। সার্ত্র এর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—আমি চাইনা লোকে ভাবুক যে জাঁ পল সার্ত্র আর নোবেল প্রাইজ পাওয়া জাঁ পল সার্ত্র এক ব্যক্তি নয়। সম্ভবতঃ সার্ত্রই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি স্বেচ্ছায় নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করলেন। বরিস পাসটারনাককে রাষ্ট্রীয় শাসন বাধা দিয়েছিল। জর্জ বার্নার্ড শ' যদিও প্রথমে বলেছিলেন—আমাকে কেন? কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কথার পরে পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। বলেছিলেন—পুরস্কার হিসাবে না নিলেও ওই অর্থপ্রাচুর্যের মূল্য আছে বৈকি, কারণ অর্থ নানা সৎ কাজে ব্যবহার করা যায়।

প্রত্যেক যুগসন্ধি এমন মনীষীর সৃষ্টি করে যাঁরা তাঁদের চিন্তা, মতবাদ এবং কর্মপন্থায় আগামী যুগের চিন্তাশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁদের কীর্তির প্রভাবে, কর্মের উদ্যমে, জ্ঞানের মহিমায় বুদ্ধিজীবিরা পরিপূর্ণভাবে নিজেদের আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতন হন এবং নিজেদের কর্ম ও চিন্তা পদ্ধতির ভেতর দিয়ে এই প্রভাবকে অনুভব ও প্রকাশ করেন। মানুষ এক যুগসন্ধি থেকে অন্য যুগসন্ধির দিকে যত এগিয়ে চলে তত তার চিন্তার পরিবর্তন হয়, জীবনধারণ পদ্ধতি নবচেতনা লাভ করে,

জ্ঞানের বিস্তার বটে। নানাভাবে জীবন দর্শনের নূতন অধ্যায় শুরু হয়ে যায়। যুগসন্ধির ঋষি হিসাবে আমরা পেয়েছি মহাত্মা আরিস্টোটল ও প্রাজ্ঞবর প্লেটোকে। কালের তরঙ্গ বেয়ে আধুনিক যুগে দেখেছি ডারউইন, কিয়েরকাগার্ড, নিট্সে, আইনস্টাইন, এঙ্গেলস, মার্কস প্রভৃতি পণ্ডিত প্রবরকে। বিংশশতাব্দীর গতি ক্ষিপ্রতর হয়ে একাধিক যুগকে ত্বরান্বিত করেছে। আণবিক যুগে পারমাণবিক 'ফিসান' এর উজ্জ্বলতায় আমাদের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে থাকাই স্বাভাবিক—ক্ষীণকণ্ঠ দার্শনিকের অনুজ্জ্বল বক্তব্য সহজেই হারিয়ে যায়। সমসাময়িকের দৃষ্টিতে তাই সার্ত্র সাধারণ ব্যক্তি, প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততায় অপ্রয়োজনীয়, জীবনের কর্মকাণ্ডে অযোগ্য। অস্তিত্ববাদের (Existentialism) যুক্তিতর্ক আমরা এড়িয়ে যেতে চাই। কেন না প্রত্যেক মানুষ অস্তিত্ববাদের সঙ্গে জোড়া। তার জীবন জন্মমৃত্যুর মাঝের সময়টুকু—কয়েক দশকের ক্ষণিক অস্তিত্বমাত্র।

ভবিষ্যতের দৃষ্টি নিয়ে সার্ত্র-এর দিকে তাকালে তাঁর বিরাটত্বে অবাক হয়ে যেতে হয়। বিরাট যুগান্তরপ্রহরী মহীরুহের মতো ধীরে ধীরে সার্ত্র তাঁর অস্তিত্ববাদের স্তম্ভকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পৃথিবীর বিদগ্ধমণ্ডলী অস্তিত্ববাদের ছায়াতলকে স্বীকার করে নিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আণবিক বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সচেতন মানুষ তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে--সাবধান হয়েছে, চিন্তা করতে শিখেছে—মর্যাদা দিতে শিখেছে অস্তিত্ববাদকে।

জড়ের সঙ্গে জীবনের যেমন প্রভেদ তেমনি প্রভেদ প্রকৃতি ও মানবে। প্রকৃতি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে গড়ে ওঠে—এই নির্দিষ্টতা থেকে সরে আসার ক্ষমতা প্রকৃতির নাই। যা প্রকৃতির নিয়মে অনির্দিষ্ট তাই অপ্রাকৃত। কিন্তু মানুষ নির্দিষ্ট নিয়মতন্ত্রে বন্দী নয়—তার নিজের জীবনকে গঠন করবার, বদল করবার ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা আছে, শক্তি আছে। এইখান থেকেই অস্তিত্ববাদ শুরু হয়েছে। সার্ত্র তাই বলেছেন—আমি মরে গেলে লোকে আমাকে ভুলে যাবে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মৃত মানুষের চিন্তা কি কখনও আমাদের মন থেকে দূরে থাকে? তাদের কর্ম ও চিন্তার ফলেই ত আমাদের জীবন আর কর্মক্ষমতা। নাম না জানা কত লোক আমাদের জীবনের মধ্যে বেঁচে আছে। আমিও তেমনি ভাবেই বেঁচে থাকব জীবিত মানুষের নিত্যকার প্রাণের স্পন্দনের মধ্যে। আমাকে ভোলা কঠিন হবে।

আজ অস্তিত্ববাদ পৃথিবীর বুকের ওপর স্পষ্ট ছাপ রেখেছে। স্বভাবতই

প্রশ্ন জাগবে অস্তিত্ববাদ কি ? সার্তর বলেছেন—দুঃখ দৈন্য হতাশা, আনন্দ সুখ পিপাসা, ব্যথা বেদনা প্রত্যাশার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে। এই বেঁচে থাকাটা সত্য এই কথাই সর্বদা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের জগতের একেশ্বর ভগবান। সেখানে তাকে সাহায্য করবার, সঙ্গ দেবার কেউ নাই—সে একা—সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ ভাবে সে একা। তাকে তার নিজের জীবনের লক্ষ্য বেছে নিতে হবে তারপর একা সেই পথ কাটতে হবে। সে বেঁচে আছে এই আশীর্বাদটুকু পাথেয় করে, বন্ধুহীন স্বজনহীন—তার নিজের স্পষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করতে হবে। অস্তিত্ববাদের বড় কথা তাই 'আমি আছি'। অয়ম্ ভো—এই যে আমি! অস্তিত্ববাদের সাধনা তাই আত্মানম্ বিদ্ধি, নিজেকে জান। কিন্তু ভারতীয় দর্শন শুধু ভাব দিয়েছেন। সার্তর ভাবকে দিয়েছেন রূপ—তাকে প্রতিদিন ব্যবহারের উপযোগী করেছেন।

সার্তর ঘোষণা করেছেন ধর্মের জায়গায় মানবতাকে বসাও। কতকগুলো শুকনো অনুষ্ঠানের দাসত্ব না করে বাঁচার মন্ত্র শেখ—নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। নূতন করে সোহং মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন গুরু সার্তর। আনুষ্ঠানিক ধর্মের অর্থে এ ডাক ধ্বনিত হয় নাই—হয়েছে কর্মের আহ্বানে। আমরা মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি; শিখেছি, আনন্দ দুঃখের মাঝে মানুষ মানুষই ; শিখেছি, ভাল মানুষ মন্দ মানুষ বলে বইয়ে পড়া কথাগুলো, কেবলমাত্র বইয়েরই। ভালমন্দ মিলে যে মানুষ, কর্মের অধীন যে মানুষ, পীড়িত, ব্যথিত, জড়াগ্রস্ত সকলেরই একটি মাত্র পরিচয় সে মানুষ, সে আছে। কিন্তু কেবলমাত্র বেঁচে থাকাটাই অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছে যারা তারা বেঁচে নাই। কোনক্রমে উচ্ছিষ্টান্নে যারা অন্যের দয়াতে জীবনধারণ করছে তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই। নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যে নিয়ত স্বেচ্ছায় সংগ্রাম করছে, সেই তার অস্তিত্বকে মর্য্যাদা দিচ্ছে, সেই মশালকে বহন করার অধিকারী। সার্তর অস্তিত্ববাদের সঙ্গে মানবতার নিবিড় সম্পর্ক বেঁধে দিয়েছেন। মানবতার সাথে একাকিত্ব—এককের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ সফলতার জন্য অনলস সংগ্রাম—অস্তিত্ববাদের অপূর্ব ছন্দময় অভিব্যক্তি। তাই আজ দিকে দিকে গুরু সার্তরের ডাক ছড়িয়ে পড়েছে। সাহিত্য-শিল্প জগতে অস্তিত্ববাদ বন্যার মত ছুটে চলেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী পিকাসোর ছবি আর নাটক থেকে সুরু করে ফরাসী সিনেমার হ্যাভেল

ভাগের রাজত্ব পর্যন্ত Existentialism এর পরিধি বিস্তার হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের সাহিত্যিকরা সার্ত্র নির্দিষ্ট পথে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁরা গুরুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছেন—মানুষ দুর্বল, মানুষ অদ্ভুত। কিন্তু সেই একমাত্র মানব সাধক, তাইত তাকে নিয়ে লেখা যায় এত উপন্যাস, গল্প, কবিতা, তাইত তার প্রতি পদক্ষেপে আছে এত নাটকীয়তা। তাকে যে ক্রমান্বয়ে মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যেতে হবে—তাকে যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবিশ্রাম পথ তৈরী করতে হবে।

সার্ত্র-চিন্তার পথ বেয়ে এলেন অ্যালবের ক্যামু, এলেন সার্ত্র জীবনসঙ্গিনী সিমোনে দ্য বুভোয়া (সেকেণ্ড সেক্স এবং সি কেম টু স্টে)। সংঘবদ্ধ মৃত্যুভয়, পারমাণবিক পরীক্ষার সাফল্যে যত প্রকট হতে লাগল তত মানুষ তার একাকিত্ব অনুভব করতে শিখল—অস্তিত্বকে ভালবাসতে শিখল। স্যামুয়েল বেকেটের ওয়েটিং ফর গডো যেন অস্তিত্ববাদের নিয়মতান্ত্রিক প্রকাশ। ডন-লেভির জিঞ্জারম্যান, ডুরেমার রমুলাস, ইউনেস্কোর গণ্ডার ও লেসন, সারোটের গোল্ডেন ফ্রুট—অস্তিত্ববাদের ধ্বজা তুলে ধরল। সেই পথ বেয়ে এসেছেন সালিঙ্গার, বারোস, মালামুড, গেলবার, সাদার্ন, নর্মান মেলার, বেলো, হেলার, মারডোক প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্য রথীগণ।

নাটকের জগতে অস্তিত্ববাদ দিগ্বিজয় করে ফেলেছে। ইংরেজ জন ওসবর্ণ, আমেরিকান টেনেসে উইলিয়াম্স থেকে শুরু করে ফরাসী ইউনেস্কো আর জেনে, জার্মানীর ফ্রিশ্চ, আমেরিকার অ্যালবি এবং ইংলণ্ডের পিটার সাফার প্রত্যেকে বিভিন্নভাবে তাঁদের নিজের পরিধির মধ্যে অস্তিত্ববাদকে প্রকাশ করেছেন। নাট্যকারগণ অস্তিত্ববাদকে প্রকাশ করেছেন তাদের নিজস্ব ভঙ্গীতে। কেউ তার পজিটিভ রূপ ব্যবহার করেছেন, কেউ নেগেটিভ রূপ প্রকাশ করেছেন। মুখহীন অনায়ক, জীবনের অস্তিত্বকে কিছুতেই ব্যবহার করতে পারছে না বা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে এ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। নানাদিক থেকে ব্যবহার করা যায় বলে সার্ত্র সমসাময়িক নাট্যজগতকে সবথেকে বেশি প্রভাবিত করেছেন। কেবল অস্তিত্ববাদ নয়, অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে সার্ত্রের নাটকও কি প্রচণ্ডভাবে সাহিত্য-শিল্পের গতি নিয়ন্ত্রণ করে সে সম্বন্ধে দু'একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। আমেরিকার বর্ণবৈষম্য নিয়ে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একাঙ্কিকা লাপুতান রেসপেকটুস নিগ্রো সমাজকে আলোড়িত করেছে, নিগ্রোদের অধিকারবোধকে জাগরিত করেছে। সার্ত্র নিগ্রোদের উদ্বুদ্ধ করলেন। দীর্ঘস্থায়ী অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সরব বিদ্রোহ

ঘোষিত হল। তারই ফলে যুগযুগের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ প্রকাশ পেল নিগ্রো সাহিত্যিক বলডুইনের অস্তিত্ববাদী উপন্যাসে। নিগ্রো সমাজ সাদা চামড়ার পীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল। ১৯৪৪-এ লেখা হুইক্লোজের বদ্ধতাকে অনুসরণ করে সালিঙ্গার তাঁর বৈপ্লবিক উপন্যাস রচনা করলেন। সালিঙ্গার ঘোষণা করলেন আমেরিকার প্রাচীনপন্থী সমাজব্যবস্থা সার্তরের হুইক্লোজের বদ্ধঘরের রূপান্তর মাত্র। এই বদ্ধ আবহাওয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশের পক্ষে দুর্গমগিরি। তিনি পরিবারের আবহাওয়াকে ভেঙ্গে দিয়ে এককের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। সমসাময়িক সাহিত্য জগতের যে কোন দিকে দৃষ্টি ফেরান যাবে—সেখানেই অস্তিত্ববাদের নিদর্শন পাওয়া যাবে—সার্তরের যুগান্তকারী প্রভাব অনুভূত হবে।

গ্রীক ওরেস্টেসের মাতৃহত্যার বিখ্যাত নাটক অবলম্বনে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সার্তর তাঁর প্রথম নাটক লে মুসে (বহু মাছি) রচনা করেন। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার হিসাবে সার্তরের প্রতিভা প্রতিষ্ঠা পেল। শুষ্ক দার্শনিক মতবাদ অবলম্বনে পুরাতন গ্রীক নাটকের সীমাবদ্ধতায় অস্তিত্ববাদের অপূর্ব প্রকাশ দেখে বিশ্ববাসী, দার্শনিক সার্তরকে নাট্যকার হিসাবে প্রণতি জানাল। তারপর সার্তরের জয়যাত্রা আর কখনও ব্যাহত হয় নাই। তিনি ১৯৪৪-এ হুইক্লোজ (বদ্ধঘর) ও লে মেঁ সালস (নোংরা হাত), ১৯৪৬-এ মর্ট সাঁস সেপালটুর (ছায়াবিহীন) ও লা পুতান রেসপেকটুস (বারাঙ্গনার সম্মান) এবং ১৯৫১তে লে ডায়েব্ল এ লে দিউ (ভগবান আর শয়তান) রচনা করলেন। শেষের নাটকে তিনি মানুষের সঙ্গে সর্বশক্তিমানের সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন। মার্টিন লুথারের সমসাময়িককালের জার্মানীতে এই নাটকের কাল স্থির করে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে অস্তিত্ববাদের আলোচনা করেছেন। এই নাটকের সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় ফরাসী নাটকের মানকে অত্যন্ত উঁচুতে তুলে দিল। বিশ্বনাটকের জগতে ফরাসী নাটকের এক নবশিখর সৃষ্টি করল। আজকেও এই নাটকটিকে সার্তরের শ্রেষ্ঠ নাটক বলা হয়। দু বছর পর ইংরেজ অভিনেতা কীনের জীবনী অবলম্বনে রচিত হল কীন। প্রথমে আলেকজাণ্ডার ডুমার কীন নামে এক অখ্যাত নাটককে অস্তিত্ববাদের রঙে রাঙিয়ে দেওয়া হল। তারপর জীবনের সমস্ত দিকে রিক্ত এই অভিনেতার মুখ দিয়ে সার্তর শোনালেন আশার বাণী। দেখালেন অভিনয় প্রতিভা তার অস্তিত্বের ছাড়পত্র। প্রতিভা লুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন শেষ হবে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্তরের প্রথম রাজনৈতিক স্যাটায়ার, নেকরাসোভ

প্রকাশিত হওয়া মাত্র আলোচনার তরঙ্গ বইতে শুরু করল। অবশেষে দার্শনিক সার্ত্র—মানুষের অস্তিত্ববোধের হোতা সার্ত্র, রাজনৈতিক পক্ষ অবলম্বন করেছেন—এর থেকে বড় খবর সেদিন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু দেখা গেল গুরু সার্ত্র তাঁর স্থানভ্রষ্ট হন নাই। আপন লক্ষ্যে তিনি অচঞ্চল। দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর ১৯৬০এ লে সেকুয়েস্ট্রেস দ্য আলটোনা প্রকাশিত হল। এই নাটকের পাত্রপাত্রীর ভেতর দিয়ে জগতের বর্তমান সংকট রূপ পেয়েছে। জীবনকে পায়ে দলা—আর জীবনকে স্বীকার করে নিতে না পারা—মানব অস্তিত্বের অদ্ভুত অসঙ্গতি। ক্ষমতা বা অর্থ যেমন মনুষ্যত্বের অধিকার দেয় না তেমনি দৈনন্দিনের তাগিদ থেকে পালিয়ে যেতে চাওয়াও মহাপাপ। সমরবিক্ষুব্ধ জার্মানীর জেগে ওঠার ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে সার্ত্র আত্মকেন্দ্রী মনুষ্যত্বের জয় গাইলেন। সার্ত্রের নাটককে কেন্দ্র করে ফরাসী থিয়েটার নূতন দিগ্‌দর্শনের রেখাপাত করল।

সব্যসাচী সার্ত্র, উপন্যাস ও গল্পের ক্ষেত্রেও নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। ১৯৩৭এ অস্তিত্ববাদী উপন্যাস লা নসী (বমিচ্ছা) ও ১৯৩৯ এ লে মুর প্রকাশিত হল। ১৯৪৫এ শুরু হল তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট উপন্যাস সেমা দ্যু লা লিবার্টি—স্বাধীনতার পথ। এই বিরাট উপন্যাস কেবল সার্ত্রের রচনা প্রতিভার সাক্ষ্য দিল না, প্রমাণ করল যে, উপন্যাসের প্রকাশ ভঙ্গীমায় ভাষা ও ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করলে কাব্যের সুষমা পাওয়া কঠিন হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, রচনার এক জায়গায় ফরাসী সরকারের বিজয়ী জার্মান সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের কাহিনীকে তিনি সমান্তরালভাবে বলে গেলেন একটি ফরাসী মেয়ের ধর্ষণের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে। এই ফরাসী মেয়েটিকে দুর্জনের কাছে বাধ্য হয়ে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে হল—তৎকালীন ফ্রান্সের মতোই। যে মুন্সীয়ানা মাধুর্য এবং সৌন্দর্যে এ উপন্যাস মণ্ডিত তা পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ। তিন খণ্ডের এই বিরাট উপন্যাসের প্রতিটি খণ্ডের প্রতি পরিচ্ছেদ সার্ত্রের রচনার সরলতা এবং অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব প্রমাণ। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই উপন্যাসের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮-এ লে এনগ্রাজ (জালবদ্ধ) এবং ১৯৫১-তে লে যো সন্ ফে (পাশার দান পড়েছে) রচনা করেন। এইটাই সার্ত্রের অদ্যতন লেখা শেষ উপন্যাস। উপন্যাস লেখার ফাঁকে ফাঁকে সার্ত্র প্রচুর ছোট গল্প রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে 'দেয়াল' (*Wall*) আর 'ঘনিষ্ঠতা' (*Intimacy*) এ দেশেও যথেষ্ট পরিচিত।

সার্ত্র যে একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার এ কথা বলাই বাহুল্য। অস্তিত্ববাদ

সম্পর্কে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'অস্তিত্ববাদ আর মানবতা' সব থেকে প্রসিদ্ধ। দার্শনিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সার্ত্রের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত। তার মধ্যে নাট্যকার জাঁ জেনেকে উপলক্ষ্য করে রচিত 'সন্ত জেনে' সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। সার্ত্র জানিয়েছেন যে, নাট্যকার জেনে এ যুগের একজন আসল সাধু পুরুষ কারণ তিনি তাঁর নিজের জীবনের অপকীর্তি লোকচক্ষু থেকে লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ করেছেন। তাঁর নাটকে অসহায় মানুষের বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। নাট্যকার জেনেকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার আখ্যা দিয়ে সার্ত্র এই বিরাট পুস্তকের ছেদ টেনেছেন।

অতি আধুনিক কালে সার্ত্রের আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড অনেক কথা (*Words*) প্রকাশিত হয়েছে। যাঁর প্রতি রচনা, আলোচনা সৃষ্টি করে, তাঁর আত্মজীবনী সকলকে চমকিত করবে এটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। সার্ত্র বলেছেন সমাজবদ্ধতাই মানুষের একমাত্র ভবিষ্যৎ নয়, পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান সত্যই একটা সমস্যা নয় যদি সে মায়ের ভালবাসা পেয়ে থাকে আর আনুষ্ঠানিক বিবাহবন্ধনের বাইরে যে স্ত্রীপুরুষ সুখের সংসার বাঁধবে না, এ কথা ভাবাও সমীচীন নয়। মানুষকে তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তাকে অর্থ আর ক্ষমতা লোভের উর্দ্ধে উঠতে হবে। তখনই সে বুঝতে পারবে যে প্রচলিত সমাজনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছাড়াও বহু উপায়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে—তার অস্তিত্বকে সফল করতে পারে।

সার্ত্রকে বোঝা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। বহু যুগ লাগবে এই অপূর্ব ধীশক্তিকে সমগ্রভাবে বুঝতে। সহজ কথা দিয়ে তাঁর কঠিন সমস্যা ঘেরা থাকে। কঠিন সমস্যাকে সহজ করে বলার ক্ষমতায় তিনি অদ্বিতীয়। লণ্ডনের এক ক্লাবে অস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন—'আমি চাই সবাই আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করুক—কঠিন সমালোচনা করুক। তাহলে আমার পক্ষে বোঝান সহজ হবে।'

নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সার্ত্র বলেছেন—'আমাদের ভাবনার মতোই আমাদের পার্থক্য। দ্য'গল যেমন লম্বা আমি তেমনি বেঁটে, কোন মিল নেই আমাদের। আমি না হেসে আদেশ করতে পারি না কখনও—তার মানে করবেন না যে আমি ক্ষমতা ভালবাসি না। মোটেই তা নয়। আসল কথা হল কোথাও কোন শাশ্বত নিয়মানুবর্তিতা আছে এটাই আমি স্বীকার করতে পারি না।' স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা করে, সার্ত্র কেমন মানুষ। তাঁর

ভাষাতেই জবাব দেওয়া যায়। সার্ত্র বলেছেন, 'আমি হতাশাব'দী নই। আমি মানুষকে তার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে বলি। নিজেকে ভয় পায় বলেই অনেক মানুষ আমার কথাকে ভয় করতে শিখেছে। সত্য কথা চিরকাল অপ্রিয়—এত সবাই জানে?' আর বলেছেন—'আমার হাড় পিজবোর্ড আর চামড়া দিয়ে তৈরী, আমার ত্বকে পার্চমেণ্ট আর আঠার গন্ধ, আমার মধ্যে একশ তিরিশ পাউণ্ড কাগজ। মানুষের হাত আমাকে নামিয়ে আনে, আমাকে টেবিলে রেখে খুলে ধরে—পাতা সমান করতে গিয়ে কখন আমার মধ্যে আওয়াজ তোলে, আমায় যত্ন করে, ফেলে দেয়, ছিঁড়ে ফেলে।...আমি একটা বই।'

এই যুগন্ধর ঋষি আমাদের যুগগুরু নাট্যকার জঁ'পল সার্ত্র।

দুটি নাট্যকার ও মৃত্যু

গত আগষ্ট মাস নাটকের ইতিহাসে যে কি বিরাট ক্ষতি করে দিয়ে গেল তার কথা আজও অনেকেই অবগত নন। এই আগষ্ট মাসে পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে আমরা হারিয়েছি। দু'জন নাট্যকারই সাম্প্রতিক কালে যাঁদের নাম প্রায়ই শোনা যাচ্ছে, তাঁদের দলভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের নাট্যকারগণ যাঁদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় এবং উৎসাহে আজ সুনাম করেছেন তাঁহারা উভয়েই ছিলেন সেই দলের পথিকৃৎ।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৩তে মাত্র ৫৭ বছর বয়সে আমেরিকাতে নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেটস পরলোকগমন করেছেন। ওডেটস সম্পর্কে এদেশে অনেকে খোঁজখবর রাখতেন। কিন্তু আধুনিক যুগের খ্যাতনামা নাট্যকারগণকে ওডেটস যে কি পরিমাণে উৎসাহিত করেছেন তা হয়তো অনেকের জানা নাই। ওডেটসের 'ওয়েটিং ফর লেফটি' পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক নাটক। কারখানার শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এত ভাল নাটক ওডেটসের আগে কেউ রচনা করেননি। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে যত নাটক রচিত হচ্ছে তা ওডেটসের এই 'ওয়েটিং ফর লেফটি' নাটকের কাছে ঋণী। মধ্যবিত্ত জীবনের শ্রেণী সংগ্রামকে ওডেটস তাঁর নাটকে প্রতিফলিত করেছেন। এই শ্রেণী সংগ্রামের মূল কেন্দ্র হল কারখানাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজ এবং ঐ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাঁদের শিল্পজীবনে এবং সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা। তাঁর বিভিন্ন নাটকের ভেতর দিয়ে ওডেটস দেখিয়েছেন যে, কারখানার কাজ করতে এসে মধ্যবিত্ত সমাজ শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছেন। যাঁদের প্রতিপক্ষ কেবলমাত্র পুঁজিবাদী কারখানার মালিকরা নন, শ্রমিক আন্দোলনের মুখোশ পরে সে সমস্ত অলস ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চান তাঁরাও। উভয় পক্ষের দ্বন্দ্বের মধ্যে শক্তির সংঘর্ষ প্রায়ই অবশ্য হয়ে পড়ে এবং সেই যুদ্ধে যে পক্ষেরই জয় হোক না কেন মধ্যবিত্ত সমাজ সর্ব্বদা পিষ্ট এবং ক্লিষ্ট হন। এই মধ্যবিত্ত সমাজের শিল্পবোধ, জীবনাদর্শ, মনুষ্যত্ব প্রকাশের সুযোগ না পেয়ে কিভাবে ধীরে ধীরে নিষ্পেষিত হয়েছে তা ওডেটস দেখিয়েছেন। ওডেটসের নাটকের মাধ্যমেই আমরা প্রথম আমেরিকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশনের পরিপূর্ণ চিত্র দেখতে পেলাম।

সর্ব্বপ্রথম জানতে পারলাম যে, আমেরিকার গুণ্ডা সমাজ বলে যে বস্তুটি রয়েছে তারা অর্থের লোভে বিভিন্ন পন্থের নোংরা কাজ কি ভাবে নিষ্পন্ন করে। 'এ্যাওয়েক এ্যাণ্ড সিং' নাটকে এই মধ্যবিত্ত সমাজের হতাশা অত্যন্ত প্রচণ্ড রূপ নিয়েছে। সময় সময় মনে হয়েছে যে, আমেরিকার এই সমাজের সঙ্গে আমাদের বাংলা দেশের সমাজের প্রচুর মিল রয়েছে এবং এই নাটকের বঙ্গীকরণের যে সুযোগ আছে, তাতে আমাদের সমাজ জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নই আলোচিত হতে পারবে। 'গোল্ডেন বয়' নাটকে ওডেটস দেখিয়েছেন যে, এক মধ্যবিত্ত ব্যক্তি একটি ছেলের বেহালা বাজাবার ক্ষমতা দেখে নিজের সর্ব্বস্বের বিনিময়ে তাকে বেহালা বাজান শেখালেন এবং ছেলেটি খুব ভাল বেহালা বাজিয়ে হয়ে শিল্পী সমাজে আদৃত হল। কিন্তু বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি আবিষ্কার করল যে, কেবলমাত্র বেহালা বাজিয়ে দারিদ্র্যের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি আসবে না। অন্য কোন ভাবে যথেষ্ট অর্থ রোজগার করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটি বক্সিং লড়বার জীবিকা গ্রহণ করল। বাপের অজ্ঞাতে দালালদের উৎসাহে সে মনে করল যে, বক্সিং লড়েই সে আর্থিক উন্নতিকে দ্রুততর করতে পারবে। তার প্রাথমিক সাফল্যকে কেন্দ্র করে এল পুঁজিবাদীর দল, এল বড় বড় দালালরা, এল স্ত্রীলোকেরা তাদের দেহসম্ভার বিজয়ীর পায়ে ঢেলে দেবার জন্যে। ছেলেটির উৎসাহদাতারা যেমন সহজ নারীসম্ভোগের ব্যবস্থা করলেন তেমনি তার সাফল্যের অর্থে দিনে দিনে স্ফীত হতে থাকলেন। তারপর একদিন যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটল। প্রচুরতর অর্থ রোজগারের জন্য এই পুঁজিবাদী এবং দালালরা স্থির করল যে, ছেলেটির সফলতাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। রূপজীবিনীদের স্পর্শে অসুর ছেলেটি তার জীবনের শেষ বক্সিং যুদ্ধে কেবলমাত্র হারলই না, হাত ভেঙে আহত অবস্থায় বাড়ী ফিরে এল। শেষ দৃশ্যে ভাঙ্গা হাতে বেহালার ছড় টানবার চেষ্টা আর্ত্তনাদের মতো দর্শকের কানে এসে থাকে।

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ওডেটসের এই ধরণের আধুনিক নাট্যপ্রচেষ্টা আমেরিকাতে আদৃত হল না। বামপন্থী সন্দেহে তাঁর নাটক ক্রমেই জনসাধারণের বিরূপ সমালোচনা লাভ করল, এমন কি ওডেটস্ স্বয়ং আন-আমেরিকান এ্যাক্টিভিটি সমিতির দ্বারা বারবার সতর্কিত হতে লাগলেন। ব্রেখট যখন জার্ম্মাণী থেকে পলায়ন করে আমেরিকাতে অবস্থান করেছিলেন সেই সময় ওডেটসের সঙ্গে গ্রুপ থিয়েটারে তাঁর আলাপ হয়। ওডেটস্ এবং কয়েকজন নাট্যামোদী মিলে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রুপ থিয়েটার

প্রতিষ্ঠা করেন। 'ওয়েটিং ফর লেফটি' এবং 'টিল দি ডে আই ডাই' এই নাটক দুটি দেখে ব্রেথট মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ঐ পদ্ধতিতে নাটক লিখতে তাঁর ইচ্ছা হয় একথা জানিয়ে ছিলেন। ব্রেথটের নাটকে ওডেটসের কোন ছোঁয়া লেগেছে কিনা এ-কথা আগামী যুগের নাট্যশাস্ত্রিগণ বিবেচনা করবেন। তবে ওডেটস্ ব্রেথটের কোন নাটক তখনও দেখেননি এবং মৃত্যুর তিন মাস আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে, ব্রেথটের সঙ্গে কথা বলে তাঁর কখনই এ-কথা মনে হয়নি যে, তিনি আধুনিক যুগের একজন অন্যতম নাট্যকার হয়ে দেখা দেবেন। সে যুগে ব্রেথটের কোন নাটক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়নি। ব্রেথটের সঙ্গে তাঁর নাটকের বিষয় আলোচনা করা ছাড়া ব্রেথটের কোন রচনা দেখবার বা জানবার সৌভাগ্য তখনও ওডেটস্ পাননি।

বার বার নাটকের ক্ষেত্রে বাধা পেয়ে ওডেটস নাটক রচনা ছেড়ে দিলেন। আমেরিকার নাটকের ইতিহাস যখন রচিত হবে তখন ওডেটসের এই কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। দূর থেকে আমরা আশ্চর্য্য হয়েছি যে, যে লোক ১৯৪১ সালে নাট্যজগতের প্রায় শিখরে অবস্থান করছিলেন এবং আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ নাটক রচনা ছেড়ে দিয়ে হলিউডে সিনেমার স্ক্রীপট রচনাতে আত্মনিয়োগ করলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ওডেটস চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এবং তার মধ্যে মাত্র দু' একটি সিনেমা সার্থকতা লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, এই সিনেমা স্ক্রীপটের কোনটিতেই তাঁর বলিষ্ঠ মতামতের প্রকাশ দেখতে পাই না। আগেকার দিনের নাটকের তুলনায় তাঁর লেখা চিত্রনাট্যগুলিকে একেবারেই ঔজ্জ্বল্যহীন মনে হয়। তা সত্ত্বেও 'দি উইভার্স' এবং 'দি কানট্রি ওয়াইফ' সিনেমা হিসেবে সফলতা লাভ করেছে। শেষোক্ত নাটকটিতে শ্রীমতী গ্রেস কেলী (অধুনা প্রিন্সেস গ্রেস) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর স্বীকৃতি লাভ করেন।

মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে আমেরিকার থিয়েটার সমাজ থেকে ওডেটসের কাছে কয়েকজন থিয়েটার সাংবাদিক উপস্থিত হন এবং তাঁকে পুনরায় নাটক লেখবার জন্যে অনুরোধ করেন। এই সাক্ষাৎকারের অংশ-বিশেষ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাই থেকে আমরা জানতে পারি যে, ওডেটস পুনরায় থিয়েটারের জন্যে নাটক লিখতে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। বর্তমান কালও তাঁকে গ্রহণ করবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু বাদ সাধলো। পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতা নিয়ে ক্লিফোর্ড ওডেটস চিরকালের জন্যে নাটক লেখা বন্ধ করলেন।

ওডেটস সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করেছেন যে, নাটক লেখার জীবনে ইউজিন ও'নীল এবং টমাস ম্যান তাঁকে সব থেকে বেশী প্রভাবান্বিত করেছেন। নাট্যকার ও'নীলের রচনার কাব্যময়তা এবং কবি টমাস ম্যানের রচনায় নাটকীয়তাকে তিনি তাঁর নিজের মধ্যে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন। বার বার এই দুই খ্যাতনামা ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত। ওডেটসের নাট্যধারায় আমরা এক সম্পূর্ণ নূতন জগতের আস্বাদ পাই। বিরাট মহীরুহের মতন কেবলমাত্র প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যায় যে বক্তব্য ইউজিন ও'নীল প্রকাশ করতেন, জীবনের যে হতাশা এবং অসহায়তা তাঁর রচনায় মানব জীবনের মৌলিক বিফলতা হয়ে দেখা দিয়েছে, ওডেটসের রচনায় তারই প্রতিফলন দেখি দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষ সমাজের



আমেরিকার নাট্যকার পরিচালক ক্লিফোর্ড ওডেটস

গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের হতাদর, অপমান এবং নিপেষণের ভেতর দিয়ে। প্রাত্যহিক জীবনের বিফলতা যে মানুষের সৃষ্টি এবং লোভের বশবর্ত্তী হয়ে মানুষ অপরের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছে একথা ওডেটস সজোরে ঘোষণা করেছিলেন।

ওডেটস যে সকল আধুনিক নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র আর্থার মিলার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে ওডেটসের নাটক পথ তৈরী করে না দিলে তাঁর পক্ষে কখনও নাট্যকার হওয়া সম্ভব হোত না। ব্যক্তিগত দুঃখ শোক, আশা আনন্দকে কেন্দ্র করে ওডেটস যে নবধারার সৃষ্টি করলেন আর্থার মিলার সেই ধারাতেই তাঁর নাটককে অবগাহন করিয়ে তাঁর বক্তব্যের পতাকা উত্তোলন করলেন। একথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ওডেটসের মতো আর্থার মিলারকেও আন-আমেরিকান এ্যাক্টিভিটি সমিতির সম্মুখীন হতে হয় এবং সেখানে তাঁকেও নতর্কীত করে দেওয়া হয়। ওডেটসের মতোই আর্থার মিলার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান পেয়েও হঠাৎ নাটক রচনা বন্ধ করেছেন। আর্থার মিলার ছাড়া যাঁরা ওডেটসের প্রভাবে নাটক রচনা করে চলেছেন তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়। ভবিষ্যৎ কালের নাট্য ঐতিহাসিকগণ ওডেটসের বিপুল প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করবেন বলে আশা করি। আর্থার মিলারের স্বীকৃতি পেয়ে ওডেট্স যে কথা বলে ছিলেন সে কথা অন্যদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তিনি বলেছিলেন যে, মিলার আমার প্রভাব স্বীকার করেছেন সেজন্যে আমি সত্যি আশ্চর্য্য হয়েছি। কারণ বর্ত্তমানে কারও প্রভাব স্বীকার না করটাই আধুনিকতম ফ্যাসান।

এই মহান নাট্যকারের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং আশা করি যে, বাংলার নাট্যামোদিগণ ওডেটসের নাটকের অভিনয় করে এই প্রতিভাধর নাট্যকারকে যোগ্য সম্মান জানাবেন।

আগষ্ট মাসে মৃত্যু দ্বিতীয়বার আঘাত হানলো ইংলণ্ডের নাট্য সমাজে। মাত্র ৭৫ বছর জন বয়সে হুইটিং মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন খবর পেয়ে মর্ম্মাহত হলাম। ইংলণ্ডে আধুনিকতম নাট্যধারার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে জন হুইটিং আধুনিক মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে নাটক লিখতে সুরু করেছিলেন। কিন্তু হুইটিং এর লেখার যত ভার ছিল তত ধার ছিল না। তার ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণকে তিনি চমক লাগিয়ে সচকিত করতে পারেন নি। তিনি বহু মৌলিক প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছেন। বুদ্ধিবৃত্তিকে ভিত্তি করে নাটক রচনা করে তিনি জনসাধারণকে উচ্চ পর্য্যায়ের নাটক গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত করেছেন।

জন ওসবর্ণের 'লুক ব্যাক ইন এ্যাঙ্গার' নাটকটি যখন দর্শকের সামনে আয়নার প্রতিফলিত সূর্য্যের আলোকের মত ঝলক দিল তখন হুইটিংএর নাটক দেখে দেখে দর্শকের মন এমনি এক চমকের আশায় অপেক্ষা করছিল। জন ওসবর্ণকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নূতন যুগের প্রথম নাট্যকার হিসেবে সম্মান জানালেন। হুইটিংকে খ্রীষ্টের পূর্ব্বগামী ঋষি জন দি ব্যাপটিষ্টের সঙ্গে তুলনা করা চলে। দুইটি নাটযুগের মাঝে তাঁর অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। র‍্যাটিগান এবং এম্লিন উইলিয়ামসের পরবর্ত্তী যুগের নাট্যকার হওয়ায় তিনি কখনও দর্শক সমাদর লাভ করতে পারেননি। কিন্তু সে কথা চিন্তা না করে তিনি ক্রমাগত বুদ্ধিগ্রাহ্য নাটক লিখে জনসাধারণের মনকে প্রস্তুত করে গেছেন। সেই পথ বেয়ে যখন জন ওসবর্ণ এবং তাঁর সহযোগী নাট্যকারগণ সুনাম অর্জন করলেন তখন জন হুইটিংকে সোজাসুজি পুরাতন-পন্থীর পর্য্যায়ে ফেলে দেওয়া হল।

তাঁর সম্পর্কে নাট্য ঐতিহাসিকগণ এক দিন সুবিচার করবেন আশা করি। দর্শক-সমাদরের প্রতীক্ষা না করা তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত নাটকগুলি নাট্যসাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ। তাঁর 'মার্চিং সং' নাটকটি অক্সফোর্ডের আধুনিক নাটক পাঠের তালিকাভুক্ত হয়েছে। কোন কোন সমালোচক এই নাটকটিকে ইংরেজী ভাষায় লিখিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে অভিহিত করেছেন।

হয়তো জন হুইটিংকে চিরকালই বিস্মৃতির অন্তরালে জীবন কাটাতে হত, হয়তো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমালোচক এবং অনুরাগীর মধ্যেই তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি সীমাবদ্ধ থাকত,—কিন্তু ভাগ্যক্রমে তা ঘটেনি। রয়েল সেক্সপীয়ার থিয়েটারের পরিচালক তরুণ পিটার হল হুইটিংকে একটি নাটক লেখবার জন্যে অনুরোধ করলেন। দীর্ঘ সাত বৎসর কোন উল্লেখযোগ্য নাটক না লেখার পর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে হুইটিং 'দি ডেভিল্‌স্' নাটক রচনা করলেন। এই নাটকটি যে কি অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করেছিল তা যাঁরা ইংলণ্ডের থিয়েটারের সামান্যতম খবর রাখেন তাঁদের অজানা নয়। ইংলণ্ডে দীর্ঘ অভিনয়ে জনসমাদর লাভ করবার পর আমেরিকায় এবং ফ্রান্সে নাটকটির দীর্ঘ অভিনয় হয়েছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেবার পরও জনসাধারণের অনুরোধে বার বার এই নাটকটির পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছে এবং প্রত্যেক পুনরভিনয়ে দীর্ঘ দিন এই নাটকটি দর্শক সমাগমে ধন্য হয়েছে। এই নাটকটি রচনা করবার সময় হুইটিং তাঁর চিরাচরিত মত এবং পথ থেকে একটুও বিচ্যুত হননি। ষোড়শ শতাব্দীর



আধুনিক নাটকের পথিকৃৎ জন হুইটিং

ফ্রান্সের একটি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে তিনি এই নাটক রচনা করলেন। অজ্ঞানতার চাপে কিভাবে বুদ্ধিমান মানুষ দশচক্রে পিশাচাশ্রিত বলে প্রমাণিত হল এবং জনসাধারণের সুনিদ্রার জন্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন—এই হল নাটকের প্রতিপাদ্য। লুডন সহরের ধর্ম্মযাজক বিলাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্য কোন অপরাধ ছিল না। তাঁর পরিচ্ছদের পরিপাটি দেখে বহুলোক মনে করতেন যে তিনি স্ত্রীলোকাসক্ত। কিন্তু এই জ্ঞানী পুরুষটি বিদ্যাকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন করে নিজের মনকে উন্নত করা ছাড়া অন্য কোন অপরাধে অপরাধী ছিলেন না। ক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সুরু হল। তাঁর গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করার মধ্যে বহু লোকই ক্রমে সন্দেহের বস্তু আবিষ্কার করলেন। গভীর রাত্রে তিনি পিশাচের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং মোমবাতির আলোকে তাঁর দীর্ঘায়িত ছায়াকে দেখার ঘটনাকে উপলক্ষ করে গুজব ছড়ান

হল যে, তিনি দেহকে স্ফীত করতে পারেন এবং রূপান্তর গ্রহণ করে নানা অন্যায় করার ক্ষমতা তাঁর আছে। জনৈক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির কন্যার অবৈধ সন্তান-সম্ভাবনাকে ধর্মযাজক যখন ঢেকে ফেলতে চাইলেন না, তখনই ষড়যন্ত্রের রশি পুরোমাত্রায় আলগা করা হল। অবশেষে দীর্ঘ বিচারের পর তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হল।

হুইটিং এই নাটকের ভেতর দিয়ে তাঁর প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধাকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন কিনা জানা যায়নি। তবে তাঁর এই বলিষ্ঠ নাটকের বক্তব্য জনসাধারণের মনকে যে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। হুইটিং ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক নাট্যকার বলে স্বীকৃত হলেন। অন্যদের বেলায় যেমন তাঁদের নাট্যরচনার পদ্ধতিকে একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে ফেলা যায় হুইটিংকে কখনও সেভাবে গণ্ডীবদ্ধ করা যায় না। তাঁর নাটকের প্রসার প্রতি মানুষের জীবনের জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানতায় বিরোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার পরিধি যেমন ব্যাপ্ত তার ফলাফলও তেমনি সুদূর-প্রসারী। এমন একজন নাট্যকারের মৃত্যু পৃথিবীর নাট্যসমাজের জীবনে এক মর্ম্মন্তুদ ঘটনা। যে সময় তাঁর কাছ থেকে আমরা সব থেকে ভাল নাটক আশা করেছিলাম, সাফল্যের স্বীকৃতিতে তিনি যখন সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখনই মৃত্যু তাঁকে চিরকালের জন্যে নিস্তব্ধ করে দিল। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে এই প্রবন্ধে ছেদ টানছি।

নাট্যকার ক্যামু

ক্যামু (Albert Camus) তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে মাত্র চারখানি নাটক লিখেছেন। নাটক চারখানি হল, Le Malentendu (1944), Caligula (1944), L' Etal de Siege (1948) এবং Les Justes (1949)। এর মধ্যে প্রথম দুটি নাটক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। চারটি নাটকই প্যারিসের বিভিন্ন থিয়েটারে একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। গত বছরেও (1960) নূতন আঙ্গিকে Caligula নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। নাটকের ভেতর দিয়ে ক্যামু বর্তমান জগতের মানুষের মনের চরম দ্বন্দ্বদ্বিধাপূর্ণ জীবন জিজ্ঞাসাকে সার্থক রূপ দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের যে প্রখরতা তাঁকে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করেছে, তা তাঁর নাটকের মধ্যেও পরিপূর্ণভাবে বর্তমান। নাটকের কেবল সংলাপ-মাধ্যম ব্যবস্থায় এই প্রাখর্য আরও বেশী পরিস্ফুট হয়েছে। মনুষ্যপ্রীতির যে নিদর্শন তার উপন্যাসে আমরা দুঃখ আর ব্যথা বোধের সংঘাতে পেয়েছি, তা আরও জোরালভাবে প্রকটিত হয়েছে তাঁর নাটকে।

ক্যামুর মনুষ্যপ্রীতির রূপটা বোঝা দরকার, কারণ তাঁর হাতে এরও রূপান্তর হয়েছে। প্রকৃতি আর শিল্পকলাকে ক্যামু মনুষ্যত্ব থেকে আলাদা করেন নি। যে প্রকৃতিকে ক্যামু ভালবেসেছেন তা হল ভূমধ্যসাগরীয় উষ্ণ আবহাওয়ার প্রকৃতি (তাঁর আলজিরিয়ায় জন্মের নিদর্শন), যে শিল্পকলাকে প্রশংসা করেছেন তা মানুষ সৃষ্ট শিল্পকলা। তাঁর কাছে মানুষের জৈবিক একাকীত্ব আর স্থবির অসারতা, ভগবান আর ইতিহাসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৃত্যুপন্থী মানুষের একমাত্র সদুত্তর। তাঁর লেখার রঙ তাই মানুষকে ভালবাসার রঙ। কিন্তু সে ভালবাসা ব্যক্তিগত সাধ, আহ্লাদ, চিন্তা, বুদ্ধি বা দেহবোধকে প্রকাশ করে না—তাকে অতিক্রম করে যায়। মানুষের মৃত্যুময় জীবনের নিরাশাবাদ তাই ক্যামুর লেখায় সবার আগে চোখে পড়ে। তাঁর উপন্যাসে আশা আর হতাশা আলোছায়ার মতোই পরস্পরকে অনুসরণ করে। তাঁর নাটকেও এই ভাবেরই স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশ দেখি।

The Plague-এর মধ্যে যে অবসাদ বোধ করি, তা যেন আমাদের সর্বত্র বর্তমান। এই আশাহীন দুর্গন্ধময় জীবনের রূপ Le Malentendu নাটকে আরও স্পষ্ট। অপূর্ব বিষবায়ুর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন ক্যামু এই নাটকে।

অর্থলিপ্সা, হত্যা, মৃত্যু, জীবনের গণিকাবৃত্তি, দেহকাম আর অসহায় অপরাধ-প্রবণতাই যেন আজকের জগতের স্বাভাবিক ধারা। হত ব্যক্তি যদি যারা তাকে মারল তাদের কারু সন্তান হয়, তাহলে সেটা স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম বলে মনে হবে না। মনে হবে নেহাতই এক দুর্ঘটনা। এইখানে ইউজিন ও'নীলের সঙ্গে ক্যামুর তুলনা চলে। কিন্তু ও'নীল কখনও নৈরাশ্যবাদের ওপরে উঠতে পারেন নি। ক্যামু পেরেছিলেন বলেই তাঁর জন্য বিশেষ সম্মানের আসন তৈরী হয়েছে। ক্যামু বলেছেন—এই নিরাশার হাতছানি চিরন্তন নয়, বর্তমান ব্যবস্থায় স্বাভাবিক হলেও, মানুষের ওপর জোর করে চাপানো। তাই এই নৈরাশ্যকে ভেদ করে মানবতার প্রকাশ হতে পারে। যে পাপকে আমরা স্বাভাবিক মনে করতে অভ্যস্ত হয়েছি, তা স্বাভাবিক নয় বলেই নিজের পাপ নিজের কাছেই ফিরে আসে। দৈহিক কামনা-চরিতার্থতায় যাকে হত্যা করা হল, দেখা গেল সে তারই সন্তান, প্লেগ আক্রমণ করল অবিশ্বাসীকে। তারপর মানবতার প্রকাশ এল দুঃখের আগুনে পুড়ে। আত্মজহত্যার জন্য জাগল ব্যথাবোধ আর বর্তমান জীবনধারণের প্রতি ধিক্কার; মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্যম, সঙ্ঘবদ্ধ করল প্লেগ ভীত নরনারীদের। Abstraction-এর বিরুদ্ধে জীবের মরণপণ অসহযোগ ক্যামুর মনুষ্যপ্রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। Angus Wilson বলেন যে এই দিক থেকে ক্যামুকে আধুনিক জগতের Shelley বলে অভিহিত করা যায়।

ক্যামুর নাটকের শ্রেষ্ঠ গুণ, নাটকের বাঁধুনি। একাগ্র দর্শকের সামনে সমগ্রতার রূপ নিয়ে ক্যামুর নাটক তার বক্তব্যকে প্রকাশ করে। প্রখর সংলাপে, দৃশ্যস্থাপন ও পরিমিতিবোধে এবং চরিত্রচিত্রণে কেবলমাত্র তখনকার জন্য দর্শক অভিভূত হন না—তাঁদের মনে দীর্ঘস্থায়ী রেখাঙ্কণ হয়ে যায়। ক্যামুর উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের তুলনা করলে একথা বলা যায় যে তাঁর নাটকের তেজ অনেক বেশী। সম্ভবত কেবল সংলাপ মাধ্যমের জন্য তাঁর নাটকগুলিকে বেশী জোরাল লাগে। উপন্যাসের নানা ঘটনা, নানা আলোচনা, বিভিন্ন বিচার—ক্যামুর বক্তব্য প্রকাশে যেমন সাহায্য করে, তেমনি তার তীক্ষ্ণতাকে কমিয়ে এনে প্রসারতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু নাটকের মধ্যে সময়ের অবকাশ না থাকায় তাঁর বক্তব্যের প্রকাশ অতি তীব্র। বর্তমানের অতিবাস্তবতার সংবেদনহীন উদগ্র প্রকাশে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। স্তব্ধ হয়ে যেতে হয় তাঁর নাটকের নিষ্করুণ প্রচণ্ডতায়। তার শক্তি যেমন অশেষ, গভীরতা অতন্দ্র।

ক্যামুর নাট্যপ্রীতি তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের সীমা ছাড়িয়ে যায়। অত্যন্ত যুবা বয়স থেকেই ক্যামু অভিনয় করেছেন। William Faulkner-এর 'Requiem for a Nun' উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। তারপর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি নাটক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ক্যামু প্রযোজিত নাটক সার্ত্র, পিকাশো প্রমুখ ব্যক্তিদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। সেক্সপীয়র থেকে সুরু করে সার্ত্র পর্যন্ত বিভিন্ন নাটক তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। তাই ক্যামুর পক্ষে বলা সম্ভব যে—'The Theatre is the art where the human body reigns ; for me it is the body first which counts on the stage.'

মানুষকে ক্যামু ভালবেসেছেন, ভালবেসেছেন তার দেহকে, যে দেহ মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী আগমনের অপেক্ষা করছে, যে দেহর ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে শত লাঞ্ছনা। জীবনধারণের প্রয়োজনে সমস্ত দুঃখদুর্দশা এই দেহকে কেন্দ্র করে মানুষকে আচ্ছন্ন করে, ছিন্নক্লিন্ন মানুষের মন চরম অসাফল্যের দিনে অন্তিম দেহজ আশা জানিয়ে, অসার দেহের সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নৈরাশ্যবাদের ছাকনা দিয়ে ক্যামু মনুষ্যত্বের দাম নির্ণয় করেছেন, নিরাশার তুলাদণ্ডে মানুষের জীবনের বিদ্যমানতার সত্যের বিচার করেছেন।

Caligula নাটকে রোমান সম্রাটের চরিত্রে অসম্ভব বর্বরতার প্রকাশ দেখি। সাধারণের প্রাত্যাহিক জীবনকে Caligula অত্যাচারে জর্জরিত করেন। নিয়ম শৃঙ্খলা, বা সামাজিক বন্ধনকে অস্বীকার করে Caligula অমানুষিক হয়ে ওঠেন। কিন্তু তার অত্যাচারের একটা নিয়ম আছে। অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি মানুষের মনের দুর্বলতা ধরে ফেলেন, তারপর সেখানে চরম আঘাত করেন। ভগবানের প্রতিভূ হয়ে সবাইকে মড়ক, দুর্ভিক্ষ মৃত্যু উপহার দেন। Caligula (firmly and deliberately)—I repeat; famine begins tomorrow. We all know what famine means—a national catastrophe. Well, tomorrow there will be a catastrophe, and I shall end it when I choose. After all, I haven't so many ways of proving I am free.

ক্যামু এই অন্যতম নাটকে তাঁর রচনার সমস্ত বিশেষত্ব, সমস্ত গুণাগুণ প্রকাশ করেছেন। সংলাপকে ধারাল ছুরির মত ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ একটা দিলেই যথেষ্ট হবে। Caligula একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছ, তোমার মাথাকাটা যাবে।'

সেই লোকটি যখন প্রবলভাবে আপত্তি জানাল, তখন Caligula বললেন, 'তুমি তোমার রাজাকে মিথ্যাবাদী করলে, সুতরাং তোমার মাথাকাটা যাবে।'

ক্যামুর রচনার শ্রেষ্ঠত্ব হল তিনি Caligulaর অত্যাচার পীড়িত সামন্ত-কুলের জাগরণ দেখবার জন্য এই নাটক লেখেননি। তিনি মনুষ্যত্ব জাগরূক রেখেছেন স্বয়ং Caligulaর মধ্যে। Caligulaর অতৃপ্ত মানবাত্মা অত্যন্ত সচেতন ভাবে অত্যাচার করে চলে। মানবতার সহনশীলতা ব্যাখ্যাবোধকে কতদিন ভয়ে সহ্য করবে দেখতে চায়। Shakespeare-এর ম্যাকবেথ-এর সঙ্গে এভাবে তুলনা চলতে পারে যে ম্যাকবেথ প্রথম অপরাধ করার পর—অপরাধের পিচ্ছিল পঙ্কিল পথে ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় চলতে সুরু করলেন। জীবন সায়াহ্নে ক্লান্ত ম্যাকবেথ তাই বলতে পারেন—'my way of life has fallen into the sear, the yellow leaf.' ক্যামুর Caligulaর অপরাধ, সচেতন সেচ্ছাচার প্রণোদিত। মৃত্যুভয় তার মনে কোন অনুশোচনা জাগাতে পারে নি। সদম্ভে তাই সে বলে, No matter. It comes to the same thing in the end. A little sooner, or a little later···' ভালমন্দ সবের যদি এক গতি হয়, মৃত্যু যদি সব কিছু সমান করে দেয়, তাহলে পাপপুণ্যে তফাৎ কেন? Caligula তাই বলেন 'I choose to play the part of Fate, I wear the foolish unintelligible face of a professional god., তাঁর বিদ্রোহ তাই মনুষত্বের বুকে হাঁটার বিরুদ্ধে। Caligula তাই নিজের মনুষ্যত্বকে আবর্জনার মতো ফেলে দিয়ে অন্যের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে রাখতে চান। আশার নৈরাশ্য দিয়ে নিরাশার আশাকে পুনর্জীবন দিতে চান।

Caligulaকে নানা দিক হতে ক্যামুর সার্থক সৃষ্টি বলা চলে। নাটক, অভিনয় সংলাপে এই নাটক আজকালের যে কোন শ্রেষ্ঠ নাটকের সঙ্গে তুলনীয়। ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে গিয়ে ক্যামু ঐতিহাসকে লঙ্ঘন করেন নি। বরঞ্চ Seutonious রচিত ইতিহাসকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে তার মাধ্যমেই তাঁর নিজের বক্তব্যকে ব্যক্ত করেছেন। রচনা নৈপুণ্যে আর যত্নের ভেতর দিয়ে তার নাট্যপ্রীতির আভাষ পাই। ঔপন্যাসিক ক্যামু চিরকাল ছিলেন মনে প্রাণে নাট্যকার।

ক্যামুর মৃত্যু ১৯৬০ সালের নাটকের পৃথিবীতে এক অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। ক্যামু তাঁর নাটকগুলির ভেতর দিয়ে বর্তমান যুগকে প্রকাশ করেছিলেন। দ্বন্দ্ব সমন্বয়ে ক্যামুর লেখায় যেভাবে বর্তমানকাল প্রকাশ

পেয়েছে তা অন্য রচনায় বিরল। তাকে তাই বর্তমানের যুগ-নাট্যকার আখ্যা দেওয়া চলতে পারে। এ যুগের ভাষ্যকার বলা চলতে পারে। বিজ্ঞ সার্তর ক্যামুর সম্বন্ধে যা বলেছেন তা মরণজয়ী শিল্পীকে চমৎকার বিশ্লেষণ করে। 'The turn of his reasoning, the clarity of his ideas, the cut of his expository style and a certain kind of solar, ceremonious and sad sombreness, all indicate a classic temperament.'

আধুনিক বিদেশী নাটক সম্পর্কে

ঠিক দশ বছর আগে বিদেশী নাটকের আধুনিকতম যুগ সুরু হয়েছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন ওসবর্ণের লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার নাটক অভিনীত হয়। অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ প্রযোজনা সত্বেও নাটকের ত্রুটি সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। লেখকের যৌবন নাটকের ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হল। সকলকে একবাক্যে স্বীকার করতে হল প্রচলিত ধারাবাহিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে যৌবনের বিদ্রোহ এমন স্পষ্টভাবে আর কখনও প্রকাশিত হয়নি। রোমান্টিক নাট্যধারার গতিকে অস্বীকার করে জন ওসবর্ণ জীবনধারণের অসুন্দর দিকটাতে সকলের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদ সুরু হল—অ-রোমান্টিক, অতি বাস্তব এবং অদ্ভুত ও অসম্ভব নাটকে পৃথিবীর সমস্ত নাট্যশালা ভরে উঠল।

যিশু খ্রীষ্টের আগেও যেমন খ্রীষ্টান ধর্মে একাধিক মহাত্মা এবং ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছিল—নাটকের আধুনিক যুগও তেমনি বহুকাল ধরেই সূচিত হয়েছে। ইবসেন স্বয়ং রোমান্টিক নাট্যরীতিকে অনুসরণ করলেও অ-রোমান্টিক রীতি তাঁর একাধিক নাটকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। এ বিষয়ে ব্র্যাণ্ড নাটকের চতুর্থ অঙ্ক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। টুর্গেনিভ ও পিরানদেল্লো অতি বাস্তবতাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু স্ট্রীণ্ডবার্গের নাটকের বিরাট পরিধিতে আধুনিক যুগের যে প্রচণ্ড পদধ্বনী শোনা যায় তা অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিছুদিন আগেও যখন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এডোয়ার্ড অ্যালবির হু ইজ এ্যাফ্রেড অফ্ ভারজিনিয়া উল্ফ্ প্রথম অভিনীত হল—একাধিক সমালোচক সেটিকে স্ট্রীণ্ডবার্গের কোন অজ্ঞাত নাটকের চর্বিতচবন বলে অভিযোগ এনেছিলেন। আজ অ্যালবি নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এখন আর কেউ তাঁর নামে কোন অভিযোগ আনেন না বটে কিন্তু স্ট্রীণ্ডবার্গের নাট্যরীতির সঙ্গে তাঁর রচনার এক অদৃশ্য যোগাযোগ যে খুজে পাওয়া যায় তা অনস্বীকার্য। খ্রীষ্টধর্মের উদাহরণে ফিরে গেলে জর্জ বার্ণাড শ'কে রাজা ডেভিডের সঙ্গে, ফরাসী অনুইলকে ড্যানিয়েলের সঙ্গে আর জন হুইটিংকে জন দি ব্যাপটিস্টের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। ডেভিড আর ড্যানিয়েলের মত শ' এবং অনুইল অ-রোমান্টিক আধুনিক নাটকের পথকে প্রশস্ত করেছেন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের কীর্তি ও প্রতিষ্ঠাকেও

কায়েমী করেছেন। কিন্তু জন হুইটিংএর ভাগ্যে এসেছে কেবল অসফলতা, নিন্দা এবং অসময়ে মৃত্যু। মাত্র কয়েক বছর পরে জন্মালে যেমন জন দি ব্যাপটিস্ট হয়তো খ্রীষ্টের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন তেমনি মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধান জন হুইটিংকে নব যুগ প্রবর্তকের সম্মান থেকে বঞ্চিত করল। নূতন যুগকে আহ্বান জানাবার শেষ বাধাকে বলিষ্ঠ হাতে ভেঙে দিয়েও তিনি হয়ে থাকলেন রোমান্টিক নাট্যরীতির যুগের শেষ আধুনিক নাট্যকার। অকাল মৃত্যু তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে লুপ্ত করে দিল।

দশ বছর অতীত হয়েছে। আধুনিক নাটক অনেকগুলি বিভিন্ন শৈলী অনুসরণ করে পৃথক রূপ ও ভাবকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। একের সঙ্গে অন্যের প্রভেদ এখন বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে নাট্যকার ডুরেমার মতো প্রচলিত নাট্যধারাকে অনুসরণ করে অভাবনীয় নাট্যবক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে। অন্য দিকে জাঁজেনের নাটক দুর্বোধ্যতার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। অ্যান জেলিকোর ন্যাক নাটকে তরুণতরুণীর সম্পর্ককে ব্যঙ্গ করে তীক্ষ্ণ নাটক লেখা হয়েছে আবার মননশীলতা ও আত্মসজাগ ব্যক্তিত্বকে নিগেল ডেনিসের কার্ড অফ আইডেনটিটি নাটকে হাস্যকর প্রমাণ করে বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে বেকেটের ভাষাহীন নাট্যসংলাপ অন্যদিকে আইউনেস্কোর ভাষার প্রাচুর্য—গতিহীন অঙ্গসঞ্চালনহীন নবনাট্যধারা। হ্যারল্ড পিনটারের দুর্বোধ্যতা, সাফারের বিদ্রোহ, আরডেনের চঞ্চলতা, ওয়েসকারের রাজনৈতিক পদধ্বনী, সিম্পসনের অতিনাটকীয়তা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। মানুষের মনের প্রতিটি চিন্তাকে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করা হচ্ছে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে, তুচ্ছ করা হচ্ছে।

ইদানীং কালে এডোয়ার্ড বণ্ডের সেভ্‌ড (বেঁচে গেল।) নাটক নিয়ে আলোচনার অনেক ঝড় উঠেছে। সমকামীতা সম্পর্কে একাধিক নাটককে ছাড়পত্র দিলেও লর্ড চেম্বারলিন সেভ্‌ড নাটক প্রদর্শনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে বিনা অনুমতিতেই এই নাটক অভিনীত হল এবং বলা বাহুল্য কিছুদিনের মধ্যেই এই নাটকের অভিনয় সরকারী হুকুমে বন্ধ করা হল। যাঁরা নাটক অভিনয়ের পক্ষে যোগ দিলেন তাঁরা বলতে লাগলেন যে, এই নাটকের মাধ্যমে বর্তমান ইংরেজ যুবক-যুবতীর মানসিক চরিত্রের স্পষ্ট চেহারা দেখান হয়েছে। এই ইংরেজ তরুণরা সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যতের মূর্তিমান প্রতিগ্রহ। নাটকের কথায় ফিরে এলে দেখা যাবে এক অবিবাহিতা তরুণী মাতা তার শিশুকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। নূতন প্রেমিকেরা শিশুর কান্নায়

ছিটকে যায়। শেষে যুবতীটি একদিন পেরাম্বুলেটারসহ শিশুটিকে হারিয়ে ফেলল। পাড়ার ছেলেরা এই বেওয়ারিশ শিশু পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে এক ভয়ঙ্কর মজার খেলায় মেতে উঠল। তারা শিশুটির মুখের ওপর নিখুঁত-ভাবে কে পাথর মারতে পারে তার প্রতিযোগিতা সুরু করে শিশুটিকে মেরে ফেলল। এই বীভৎস নাটকের মধ্যেকার তীক্ষ্ণ বক্তব্য উপেক্ষা করা যায় না। আধুনিক নাটকের অনেকখানি অংশ শারীরিক যন্ত্রণা, হত্যা, বীভৎসতা ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করেছে। সুবিখ্যাত পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনেতা জর্জ ডিভাইন এই রীতিকে সমর্থন করে বলেছেন—আমাদের জীবনে যখন আমরা প্রতি পদক্ষেপে হত্যা, মৃত্যু, অসহ্য শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হচ্ছি তখন নাটকের রাজ্য থেকে তাকে নির্বাসন দেবার অধিকার কারু নাই। আমরা তাই একটা নাটক পেলাম—বাগানে পেয়ারা তুলবার কাজে নিযুক্ত থাকতে থাকতে একদল ছেলে কি ভাবে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রৌঢ়ের মাথাটা দেহ থেকে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর সেই কাটা মুণ্ড নিয়ে খেলা করতে লাগল। পুরাকালের অরফিউসের গল্পকে অনুসরণ করে আধুনিক এক প্রেমিককে কুকুরের দল টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলল। পাগলা গারদের অধিবাসীরা মারকুউস সাদের পরিচালনায় রাজনৈতিক মারাটকে হত্যা করবার গল্প নিয়ে নাটকের অভিনয় করতে গিয়ে যে বীভৎসতার সৃষ্টি করল তা দেখলে সত্যি লোমহর্ষণ হয়। মনে হয় ঘা মেরে মেরে আমাদের ভেতরের ঘুমন্ত আত্মাকে জাগিয়ে তুলে দিয়ে যেন বলছে—তোমার অকর্মণ্য-তায় পৃথিবীর এই চেহারা হয়েছে।

স্পেনের পেরু বিজয়ের কাহিনীকে কেন্দ্র করে পিটার সাফার খ্রীষ্টান ধর্ম আর য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যে উলঙ্গরূপে দেখিয়েছেন তাতে মাথা আপনি শ্রদ্ধায় নত হয়ে যায়। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন দারিদ্র্য, অনাহার আর জীর্ণতা সভ্যতার সব থেকে বড় দান—কারণ এই তিনটি না থাকলে অর্থ, ভোগ আর বিলাসিতার কোন মূল্যই থাকে না। শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ড উপত্যকায় নয় সমস্ত ইউরোপ জুড়ে ধ্বনীত হচ্ছে এই বিদ্রোহের সুর। এই সুর শোনা গেছে জার্মাণীর ক্রিসের মধ্যে, সুইস ডুরেমারের মধ্যে, পোলীশ নাট্যকার স্ল্যাওমীর ম্রোজেকের মধ্যে। তাই স্পেনের লোপে ডে ভৈগার রক্তাক্ত নাটক আবার অভিনীত হচ্ছে। ম্যাকবেথ আবার পূর্ণ তেজে জেগে উঠেছে। স্ট্রীণ্ডবার্গের মৃত্যু নৃত্য (ডান্‌স অফ্‌ ডেথ) পুনরভিনীত হচ্ছে।

কিছু সময় কাটাবার জন্যে যাঁরা নাটক দেখতে চান, কেবল অবসর-

বিনোদনের অঙ্গ হিসাবে যাঁরা এতকাল নাটককে দেখেছেন তাঁরা যে ক্ষুণ্ণ হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চাবুক খেয়ে সজাগ হবার জন্যে যাঁরা নাটক দেখতে যাননা তাঁরা আধুনিক নাটকের গতিকে যে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখবেন তা বলাই বাহুল্য কারণ দশ বছর পরীক্ষা করে আজ নাটক জোর গলায় বক্তব্য প্রকাশ করতে শিখেছে। মনকে যদি রক্তাক্ত করতে হয়, দেহকে যদি কালিমাময় করতে হয় তাতেও ইউরোপের আধুনিক নাট্যকাররা পেছপা নন। সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আমেরিকার অ্যালবি। প্রচণ্ড এক শক্তি এবার মিলিত হয়েছে যুগ্ম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে। আজ আর সঙ্গীতের মূর্ছনা নয়—নর্তকীর নূপুরনিক্কণ নয়—নাটক আজ বজ্রনির্ঘোষ করছে—কাড়ানাকড়া বাজিয়ে যুদ্ধের ভল্লকে শানিত করছে। রক্তপাতে যদি মৃত্যু হয়, ব্যথায় যদি স্মৃতিবিভ্রম হয়—তবু মানুষকে তার আলস্য আর বিলাসমুখরতা থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করতেই হবে। তাকে তার পারিপার্শ্বিকের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে সজাগ করতেই হবে—তা নাহলে একদিন এক অসতর্ক আণবিক মুহূর্তে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বয়ং ব্রহ্মাও তাকে রক্ষা করতে পারবেন না।

ইউরোপের আধুনিক নাটক যে দর্শনকে সকলের সামনে এনে ফেলেছে তার যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সকল দেশের সকল সময়ের প্রচারকদের মতোই প্রচারের উৎসাহ প্রায়ই কার্যকারণের সীমাকে লঙ্ঘন করে বসে। তখন প্রচারকদের কণ্ঠস্বর প্রচারের উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে যায়। দেবতাকে ঢেকে দিয়ে পুরোহিত বসেন পূজা নিতে। দেবার্চনা হয়ে যায় গৌণ আর পাণ্ডার পাওনাটাই হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য। আধুনিক নাট্য জগতেও এই ঘটনার প্রচুর উদাহরণ মেলে। মানুষের জৈবিক কামনা নিয়ে তাই দেখি বাড়াবাড়ি সুরু হয়েছে। 'ফাইভ ফিঙ্গার এক্সারসাইজে' সমকামীতা এসেছে নাটকের প্রয়োজনে, অপূর্ব সংযত তার ব্যবহার, অতি সুদৃশ্য তার প্রকাশ। টাঙ্গো নাটকে সমকামীতাই নাটকের প্রধান বক্তব্য! লাল কালিতে রাঙান অসংযত চীৎকার। বয়স্কা রমণীর কামনাকে কেন্দ্র করে বহু নাটক আধুনিক কালে লেখা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা সাহসিকতায় বেপরোয়া গর্বে, ভাষায় ও ঘটনায় শ্লীলতার গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যেতে চান, তাঁদের অপরিণত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

সুতরাং আজকে ইউরোপে যত নাটক হচ্ছে সবগুলিকে এক নিঃশ্বাসে তিলক পরান যায় না। তবে যে কারণে আজ উচ্ছ্বাসের আধিক্য, প্রকাশের ব্যাকুলতা ভাষার বাঁধনছেঁড়া দুর্বার গতি—তা হচ্ছে জীবনের অনিশ্চয়তা।

আমার মতে এই যুগের নামাবলি হওয়া উচিত আণবিক যুগের নাটক। কারণ মৃত্যুর প্রচণ্ড গতি এই যুগকে ত্বরান্বিত করেছে। মানুষ যত ভাবছে যে এক মূহূর্তের মধ্যে—হয়তো কারু মনের ভুলে কিংবা অসতর্কতায় তার জীবন পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে—ততো সে নিজেকে বিশ্লেষণ করছে। নিজের উলঙ্গ রূপকে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে তার বিচার করছে।

তাই 'এ ফোর নাইট কেম' নাটকে প্রৌঢ়ের মাথাটা ছিঁড়ে ফেলা যতই বীভৎস হোক, তার পেছনে রয়েছে বিরাট সন্দেহ। একজনের হাতে অনেকের মৃত্যুর অলেখা ভয় এই চরম কীর্তি গ্রহণে সকলকে প্রলুব্ধ করেছে। টেনেসে উইলিয়ামসের নাটকের নায়কের কুকুরের হাতে মৃত্যুও এই পশুশক্তির অন্ধ হিংসার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছে। বিখ্যাত মারাট সাদ নাটকের পাগলাগারদের অধিবাসীদের ভয়ানক কীর্তি বারবার যেন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে—পৃথিবীকে বৈজ্ঞানিক ধ্বংসক্ষমতার হাতে ছেড়ে দিলে তাকে পাগলাগারদেই রূপান্তরিত করা হবে।

আলোচনার তাই শেষ নাই। যা কিছু ঘটছে তাকে নিয়ে চুলচেরা বিচার চলেছে। তারই মাঝে কয়েকটি অপূর্ব নাটক আমরা পেয়েছি—যেমন কেয়ারটেকার, হু ইজ এ্যাফ্রেড অফ ভারজিনিয়া উলফ, রয়েল হাণ্ট ইন দি সান, ফিজিসিস্ট প্রভৃতি।

আধুনিক ইউরোপের নাট্যগতিকে বুঝতে হলে তাই প্রথমে প্রতিটি শৈলীর বিশ্লেষণ করতে হবে—এবং তারপর সেই শৈলীর সার্থক নাটকগুলির আলোচনা করতে হবে। এক সাথে সকলের সম্পর্কে মন্তব্য করা শুধু অসম্ভব নয়—অন্যায়। তাই অত্যন্ত মূল কয়েকটি বিষয়ের উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বক্তব্যের ছেদ টানছি। সব শেষে শুধু একটা কথা বলতে চাই যে, আণবিক যুগের নাটক বিস্ফোরক সামগ্রী দিয়ে তৈরী। তার ক্ষমতা এবং প্রসার প্রচুর। তার মধ্যে যেমন প্রচণ্ড সম্ভাবনার বীজ রয়েছে তেমনি ধ্বংসের শক্তি রয়েছে। আশা করব কুশলীর ব্যবহারে তার কল্যাণরূপ প্রকাশিত হবে, তার প্রেরণা সৃষ্টিকে রক্ষা করবে, অমর করবে।

ওয়েস্কারের ত্রয়ী

ইংলণ্ডের বামপন্থী নাট্যকারদের মধ্যে আর্ণল্ড ওয়েস্কারকে সব থেকে বামপন্থী বলা হয়। এই খানে কথাটা পরিষ্কার করে বোঝা দরকার যে, বামপন্থী নাট্যকারদের সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবী নয়, বরঞ্চ অনেক বামপন্থী নাট্যকারকে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মতাবলম্বী হতে দেখা গিয়েছে। কথাটাকে আরও একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। যাঁরা বিদেশে গিয়েছেন তাঁরা জানেন যে, ইউরোপ এবং আমেরিকায় রাস্তার ডানদিকে গাড়ী চালাবার নিয়ম আছে অর্থাৎ প্রচলিত শৃঙ্খলার নিয়মে রাস্তা দিয়ে দক্ষিণপন্থী হয়ে চলাটাই সঙ্গত। সেখানে যদি কেউ বাঁদিক দিয়ে চলেন তাহলে তিনি আইন ভঙ্গ করবেন অর্থাৎ তাঁর কীর্তি প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম হবে। বামপন্থী কথার প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল আইনভঙ্গকারী বা আইন অমান্যকারী অথবা প্রচলিত রীতিকে লঙ্ঘন করে নূতন কিছু যাঁরা করতে চান তাঁদের বোঝাবার জন্যে। পরে বহুল ব্যবহারের ভেতর দিয়ে এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে সন্নিবেশিত হওয়ায় বামপন্থী বলতেই স্বভাবতঃ রাজনৈতিক দলের কথাই আমাদের মনে আসে। নৈয়ায়িক প্রশ্ন করতে পারেন যে, যে সমস্ত দেশে যেমন ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষ, যেখানে স্বাভাবিক পথ চলবার নিয়ম হচ্ছে বামপন্থী সেখানে নূতন পথে যাঁরা চলতে চাইবেন তাঁদের কি দক্ষিণপন্থী বলা হবে? আপাততঃ এইপ্রশ্ন পাঠকের চিন্তার জন্য মুলতুবী রেখে নাটকের আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

ইংলণ্ডে ১৯৫০ সাল থেকে যে নূতন নাট্যধারার সৃষ্টি হয়েছে তাকে বামপন্থী নাট্যধারা বলে সাধারণতঃ অভিহিত করা হয়ে থাকে। কারণ দীর্ঘদিনের প্রচলিত নিয়মকে ভেঙ্গে দিয়ে নাটক লেখার আইনের পরিসরকে বৃদ্ধি করলেন নূতন একদল নাট্যকার। যৌবনের ধ্বজাকে তাঁদের যুদ্ধের প্রধান সওয়ার করে তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন সুপরিকল্পিত নাটকের বিরুদ্ধে। প্রাচীন পন্থায় নাট্য প্রযোজনার বিরুদ্ধে, মঞ্চ ও আলোকসজ্জার বিরুদ্ধে, তাঁরা নাটক লিখলেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে, আর সে কথা বলতে গিয়ে তাঁরা কাউকেই রেহাই দিলেন না। নির্মম, উদগ্র ভাষার তাঁরা যৌবনের ব্যথাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন। তাঁদের সঙ্গে এলেন নূতন ধারার প্রযোজক, নূতন ধারার মঞ্চসজ্জাকর।

আলোক ব্যবহার পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল তাঁদের এই নাটকগুলিকে রূপ দেবার জন্যে। তাঁদের রচনার প্রধানতম গুণ এবং বিশেষত্ব হল তাঁরা যৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করবার জন্যে নাটক রচনায় নূতন ধারাকে নিয়ে আসতে দ্বিধাবোধ করলেন না। তাঁরা কঠিন নাটক লিখলেন, করুণ নাটক লিখলেন, লিখলেন হাসির নাটক, নাট্যধারায় প্রচলিত পথকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে তাঁরা এমন এক শ্রেণীর অদ্ভুত নাটকের জন্ম দিলেন যা আগে কেউ কল্পনা করেনি। এই নাটকের ভাষ্যকার হিসাবে প্রযোজকদের সঙ্গে নাট্যকারদের যোগাযোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। যে কোন প্রযোজকের পক্ষে এই কিম্ভূতকিমাকার নাটকগুলি প্রযোজনা করা আর সহজ হল না। বিশেষ প্রযোজনাধারায় বিশেষ রীতিতে অনুশীলন করলে তবেই এই নাট্যপ্রযোজনার ভেতর দিয়ে নাটকের বক্তব্য সুপরিস্ফুট হবার সম্ভাবনা থাকল।

কঠিন নাটক যাঁরা লিখলেন আর্ণল্ড ওয়েস্কার তাঁদের দলের একজন। নাট্যকার ওয়েস্কারের নাটকে সমাজের যে স্তরের লোকেদের কথা বলা হতে লাগল তাঁরা হলেন রাজনৈতিক জীবনেও বামপন্থী। ওয়েস্কার তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে দেখালেন যে, রাজনৈতিক জীবনে যাঁরা বামপন্থী হয়েছেন এবং এই বামপন্থী মতবাদের জন্যে যাঁরা অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তাঁদেরও মনটা কিন্তু পরিপূর্ণভাবে বামপন্থী হতে পারেনি। রাজনৈতিক জীবনে বামপন্থী নায়ক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে দক্ষিণপন্থী হয়ে রয়েছেন। রাজনৈতিক জীবনে যাঁরা বামপন্থী মতবাদ পোষণ করেন তাঁরা শিল্পকলায় এবং সাংসারিক জীবনে সম্পূর্ণ দক্ষিণপন্থী হয়ে রয়েছেন। একটি ভারতীয় উদাহরণ দিলে হয়ত ওয়েস্কারের বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে বোঝান যাবে। জাতিতে ব্রাহ্মণ বামপন্থী নেতা মেয়ের বিবাহ দেবার সময় ব্রাহ্মণ সুপাত্র খোঁজেন, কপর্দকহীন অব্রাহ্মণ বামপন্থী কর্মীকে উপেক্ষা করে অর্থে ও সম্পদে প্রতিষ্ঠিত স্বজাতিয় পাত্রকে পছন্দ করেন। মেয়েকে তাঁর নিজের মত অনুযায়ী বিবাহ বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাতে বা তাঁর নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে জীবনসঙ্গী করার ইচ্ছায় তিনি প্রাচীন দক্ষিণপন্থী পিতার মতোই অনুদার। বামপন্থী শিল্পায়োজনকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন এবং নিজের মানসিক অক্ষমতাকে গোপন করবার জন্যে তিনি প্রচার করেন যে, সে শিল্পকলা অপ্রয়োজনীয়, কতকগুলি অপরিণত যুবকের অস্পষ্ট অভিজ্ঞতামাত্র। বামপন্থী জীবনের মধ্যে এই যে অসঙ্গতি, চিন্তার সঙ্গে কর্মের, কার্যের সঙ্গে ভাবের এবং

ভাবের সঙ্গে অভিব্যক্তির এই দ্বন্দ্বই, ওয়েস্কারের নাটকগুলির প্রধান বক্তব্য। তিনি তিনখানি নাটকে এই অসঙ্গতিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে ওয়েস্কারই প্রথম তিনখানি নাটকের মাধ্যমে একটি সুবৃহৎ বিরাট নাটক রচনা করেছেন যার প্রত্যেকখানি যেমন নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ তেমনি তিনখানি নাটকে পরিপূর্ণ। তাঁর প্রথম নাটক Chicken Soup with Barley (বার্লি দিয়ে মুর্গীর সুরুয়া) ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রযোজিত হল। পূর্ব্ব লণ্ডনের বস্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তিনি এই নাটক লিখলেন এবং এই নাটকের ভেতর দিয়ে বামপন্থী এক ইংরেজ ইহুদী পরিবারের জীবনযাত্রাকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। এই নাটকের প্রস্তাবনায় ওয়েস্কার স্বয়ং আট লাইনের যে মুখবন্ধ প্রচার করেছিলেন তাতে তাঁর নাটক সম্পর্কে বক্তব্য স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলেছিলেন যে, 'বামপন্থী সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে ঠাট্টা করে এ নাটক লেখা হয়নি। এ নাটক খ্রীষ্টধর্ম্মকে ব্যাঙ্গ করবার জন্তও রচিত হয়নি। খ্রীষ্টধর্ম এবং সোভিয়েটতন্ত্র দুটিই অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য ঘটনা কোনভাবেই তাদের ব্যঙ্গ করা কখন যুক্তিযুক্ত নয়। সেই জন্তে অনুরোধ করি যে, এই নাটককে কেন্দ্র করে দয়া করে যেন কাদা ছোড়াছুড়ি না হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষই পরিষ্কার হাতের অধিকারী, কাদায় না ডোবালে তা কখনও মলিন হবে না। আসুন আমরা আবার নাটকের বিষয়গুলিকে চিন্তা করি।' ওয়েস্কারের নাটকের প্রধান বক্তব্য এই চিন্তাশীলতা। তাঁর নাটক দেখে বারবার ভাবতে হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে অসঙ্গতি প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনধারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তার মূল কত সুদূরপ্রসারী ওয়েস্কারের নাটক দেখে তা অনুধাবন করা যায়।

সম্ভবতঃ এই জন্তেই ওয়েস্কার তাঁর দ্বিতীয় নাটকের নামকরণ করলেন Roots (মূল)। ওয়েস্কারের তিনটি নাটকের মধ্যে এইটিই নাটকের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। এই নাটকের মাধ্যমেই অধুনা খ্যাতনামা অভিনেত্রী জোয়ান প্লাউরাইট (বর্তমানে লেডী লরেন্স অলিভিয়ার) সর্ব্বপ্রথম সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত এই নাটকটিতে ওয়েস্কার ইংলণ্ডের চাষীদের কাহিনী বলেছেন। সহরের বামপন্থী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ চাষী পরিবার কিভাবে তাঁদের জীবনযাত্রায় অসঙ্গতি অনুভব করছেন এটাই Roots নাটকের প্রতিপাদ্য। চাষীদের জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলতে গিয়ে ওয়েস্কার তাদেরকে সাধু ব্যক্তি করে তোলেননি, বরঞ্চ তাদের লোভ

হিংসা এবং মনের নিম্নগতিকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। ওয়েস্কার দেখিয়েছেন যে, এই চাষীগুলির মনকে নিম্নপথগামী এবং অত্যন্ত ছোট করে তুলেছে বর্তমান সমাজব্যবস্থা। সমাজব্যবস্থার ত্রুটিতে যে বিষবৃক্ষ আকাশে সহস্রশাখা বিস্তার করে বেড়ে উঠেছে তাতে কখনই অমৃত ফল ফলতে পারে না। যদি কোন বিষফলের মধ্যে অমৃতের সামান্যতম আস্বাদ এসে থাকে তাহলে তা পরিপূর্ণ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাকে মেনে নেওয়া সহজ নয়। তাই অমৃতের আস্বাদকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলবার জন্যে বিষের বিস্তার অবশ্য-ম্ভাবী। এই নাটকে তাই চাষী জীবনের দুঃখ বেদনাকে তুলে ধরা হয়নি। যে মূল থেকে চাষী জীবনের চরিত্রগত হীনতা ব্যাপকতা লাভ করেছে তাকেই স্পষ্টভাবে দেখান হয়েছে। তাই চাষীর মেয়ে বেটী যখন শিক্ষিত বামপন্থী যুবক প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করে করে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল তখন তার বাপ এসে কোন সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছেন না, বরঞ্চ ঠাট্টা করে বলছেন যে ভদ্রলোকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবার আশা করলে এই রকমই ঘটে। এই চাষী পরিবার যে কেবল ভদ্রলোকদের অপছন্দ করেন তা নয়, তাঁরা পরস্পরকেও সহ্য করতে পারেন না। পড়শীর রান্না করবার উনুন ভেঙ্গে গেলে নিজেদের উনুন ধার দেবার কথা তাঁরা চিন্তাও করতে পারেন না। গুজব গুঞ্জনে মেতে ওঠেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাবেন আজকে ওদের ঠাণ্ডা খাবার খেতে হবে। Roots নাটকের ভেতর দিয়ে এক জান্তব প্রতিযোগিতা আমাদের চোখে পড়ে। মানুষের যে সব প্রকৃতিকে পাঠ্যপুস্তক ঘৃণা করতে শিখিয়েছে, সেই সব প্রকৃতির অধিকারী হয়ে দলে দলে মানুষ সমাজে বাস করছে। সমাজের কল্যাণহস্ত তাদের মানবতাকে তুলে ধরবার জন্যে কখনই এগিয়ে আসছে না। বলা বাহুল্য, এই না আসার পেছনে যে রাজনৈতিক ইঙ্গিত আছে তা ওয়েস্কারের রচনায় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যদিও নাটকের কোথাও তিনি কোন রাজনৈতিক বক্তব্যকে প্রকাশ করেননি।

ওয়েস্কারের তৃতীয় নাটক "I am talking about Jerusalem" (জেরুজালেমের কথা বলছি) ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রযোজিত হল। এই নাটকে তিনি তাঁর রচনাশৈলীকে অনেকখানি বদলে নিয়েছেন। চরম বাস্তববাদী রচনাশৈলী এই নাটকে অনুসৃত হয়নি, বরঞ্চ রচনার মধ্যেকার কাব্যপ্রবণতা এই নাটকটিকে দুর্ব্বল করেছে বলা চলতে পারে। তিনটি নাটকের মধ্যে এইটি নিকৃষ্টতর নাটক হলেও ভাবের অভিব্যক্তিতে এবং চিন্তার প্রকাশে এটি অন্য নাটকগুলিকে পরিপূরণ করেছে। এই নাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি

যে, প্রথম নাটকের নায়কের বন্ধু সমাজতন্ত্রী ডেভ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সংসার পেতেছেন। তাঁদের সন্তান জন্মেছে এবং তাঁরা প্রাণপণে নিজেদের আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু বারবার দৈনিক জীবনের অসঙ্গতিতে তাঁদের চিন্তাধারা বাস্তবে রূপান্তরিত হবার সুযোগ পাচ্ছে না। সন্তানের ভবিষ্যতের জন্যে সমাজতন্ত্রী মায়ের চিন্তা তাঁর আদর্শ মেনে চলছে না। আর্থিক সঙ্গতির জন্য রাজনীতির আদর্শ থেকে বাপকে বারবার বিচ্যুত হতে হচ্ছে। এই নাটকের ভাবার্থ একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝান সহজ হবে। নাটকের নায়ক এক জায়গায় বলেছেন যে জেরুজালেম হয়ত সত্যি করে নাই, কিন্তু যেদিন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করব যে, জেরুজালেম কখনই ছিল না সেদিন বেঁচে থাকা কঠিন হবে। ভবিষ্যতের সুখস্বর্গের আশায় প্রত্যেক মানুষ কাজ করে। যার জীবন নানা দুঃখ ও কষ্টে ভরে থাকে সেও আশা করে যে, মৃত্যুর পরও সে একদিন শান্তি পাবে। এই পৃথিবী যদি তাকে সুখ বা আনন্দ না দিতে পেরে থাকে তাহলে মৃত্যুর পরেরকার জীবন তার প্রশান্তিতে ভরে উঠবেই। এই স্বর্গের আশা আছে বলেই বর্ত্তমানের দুঃখকে বহন করা সহজ হয়। ওয়েস্কার তাঁর নাটকে চরম ব্যথার মধ্যে দিয়ে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, খ্রীষ্ট যে জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা অলীক নয়। সুতরাং মানুষের মানবতার সাধনা অলীক হবে না। সফলতা একদিন আসবেই, জীবনে যদি না আসে মৃত্যুর পর আসবে। ওয়েস্কারের নায়ক-নায়িকা তাই প্রতিনিয়ত আশা করেছে যে তাদের দুঃখভোগ তাদের সন্তানের জীবনকে সমাজের কঠোরতা থেকে রক্ষা করবে।

এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ওয়েস্কার যে অপূর্ব্ব বক্তব্যের অবতারণা করেছেন তা শুধু ওয়েস্কারের নাটকগুলিতে নয়, বর্ত্তমানের ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যে বিরল। এই অঙ্কে ডেভ তাঁর সন্তানের সঙ্গে খেলা করতে বাধ্য হয়েছেন। সন্তানের সঙ্গে খেলায় তিনি নিয়েছেন ভগবানের ভূমিকা। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে সৃষ্টিকার্য্য এগিয়ে চলেছে—এগিয়ে চলেছে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করবার কাজ। মাতাপিতা ও সন্তান যখন এই খেলাতে বিভোর হয়ে উঠেছেন, ঠিক সেই সময় এল বহির্জগতের ডাক, চেয়ার টেবিলের ওপর থেকে খেলার সামগ্রী ফেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে গড়ে তোলা জগৎকে নির্ম্মমভাবে ভেঙ্গে সরিয়ে দিয়ে তাঁরা বাইরের অতিথিকে বরণ করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। একটু পরে উঠতে গিয়ে যখন খেলার জগতে পা বেধে গেল তখন লাথি মেরে জঞ্জালকে সরিয়ে ফেলে তারা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় মেতে উঠলেন। আমার

মতে এই দ্বিতীয় অঙ্কটি এত স্বয়ংসম্পূর্ণ, এত ভাবদ্যোতক যে সমস্ত নাটকটির উদ্দেশ্য এই অপূর্ব্ব দ্বিতীয় অঙ্কটি ব্যর্থ করে দিয়েছে। তৃতীয় অঙ্ক দেখে যদি দর্শকের পছন্দ না হয় তাহলে সে দোষ নাটকের গঠনের। এই দ্বিতীয় অঙ্কটির ভেতর দিয়ে ওয়েস্কার যে অপূর্ব্ব সম্ভাবনার আস্বাদ দিয়েছেন, আশা করব তা একদিন পূর্ণরূপে আমাদের সামনে দেখা দেবে।



নাট্যকার ওয়েস্কার

সব থেকে আনন্দের বিষয় এই যে, ওয়েস্কারের এই তিনটি নাটকই মফঃস্বলে প্রথম অভিনীত হয়। কভেন্ট্রির বেলগ্রেড থিয়েটারের অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী এই তিনটি নাটকের এত অপূর্ব্ব অভিনয় করেছিলেন যে, পরে তাঁদের দলকেই লণ্ডনে অভিনয় করবার জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়। এ যুগের অন্যতম নাট্যকার হিসাবে ওয়েস্কার প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন, এবং বহু নূতন ধারার নাটক তিনি লণ্ডনের জনসাধারণকে উপহার দিলেন।

আমি যখন এই নাটকগুলি দেখি তখন রয়েল কোর্ট থিয়েটারে জন ডেকস্টার পেশাদার অভিনেতাদের দিয়ে এই তিনটি নাটকের ক্রমান্বয়ে পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন অর্থাৎ পরপর তিন রাত্রে এই তিনটি নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমবারে এই নাটকগুলি

কিভাবে প্রযোজিত হয়েছিল তা বলতে পারব না, কিন্তু জন ডেকস্টার অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এই নাটকগুলির প্রযোজনা করেন। আলো বা মঞ্চের কোন কারসাজি দেখতে পাইনি। অত্যন্ত সহজ সরল সোজাসুজিভাবে চমৎকার অভিনয়ের মাধ্যমে এই নাটক তিনটিকে তিনি দর্শকের সামনে উপস্থিত করলেন।

এই নাটকগুলি দেখে রাত্রি সাড়ে দশটায় হোটেলে ফিরছিলাম। সন্ধ্যা-বেলায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, কাল রাস্তায় জল পড়ে বিজলী আলোয় চকচক করে উঠছিল। দোকানের আলোকবিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে আটকে থাকা জলের মধ্যে পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল যে, যে নাটকগুলি দেখে এলাম, সে নাটক আমার দেশের নাটকও হতে পারত। সমাজে, রাজনীতিতে আর জীবনযাত্রায় এই অসঙ্গতি আমাদের দেশেও গভীর চিন্তার কারণ হয়েছে। যে সমস্ত প্রশ্ন আলোচনা করা হয়েছে, আমাদের দেশে সেগুলি আরও তীব্র, আরও হানিকর। আমাদের সমাজজীবনের বিভ্রান্তি এই নাটকের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আমাদের রাজনৈতিক জীবন এবং মতবাদের মধ্যে অসমতা অনেক বেশী প্রচণ্ড। ওয়েস্কার তাঁর নাটকগুলিতে যে দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছেন, ভারতীয় জীবনে সে দ্বন্দ্ব অনেক বেশী প্রকট। বৃষ্টিঢালা পথে আসতে আসতে তাই বারবার মনে হচ্ছিল এমন নাটক আমাদের দেশে কবে লেখা হবে। হোটেলে ফিরে যুগন্ধর নাট্যকার এ্যালবের ক্যামুর প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে যেখানটায় চোখ আটকে গিয়েছিল সেই লাইন কটি উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধের ছেদ টানছি। ক্যামু বলেছেন—"I know for certain that a man's work is nothing but a long journeying through the detours of art to recapture the handful of big simple images with which his heart opened out for the first time." মাত্র ২৬ বছর বয়সের নাট্যকার ওস্কেকারের নাটকগুলি দেখে এই কথারই প্রতিধ্বনি করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

লণ্ডনমঞ্চে ঐতিহাসিক নাটক 'রস'

ঐতিহাসিক নাটক বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সাজাহান, আলমগীর, চন্দ্রগুপ্ত কিংবা সিরাজদৌল্লার কথা। এই নাটকগুলি ইতিহাসকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এবং এদের মূল চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকেই নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে মেশান হয়েছে অনেক কাহিনী, অনেক কিংবদন্তি, কল্পনা করা হয়েছে অনেক পরিণতি যা কখনো ঘটেনি বা ঘটা সম্ভবপর ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, আলমগীর নাটকের শেষ দৃশ্যে আলমগীর ও রাজসিংহের সাক্ষাৎকার কিংবা রাষ্ট্রবিপ্লব নাটকের শেষ দিকে শিবাজী, জয়সিংহ ও দলীর খাঁয়ের সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ অলীক ঘটনা। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক নাটক দেখে এই কথাই বারবার মনে হয়েছে যে, এই নাটক লেখার মূল উদ্দেশ্য দর্শকদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশের জনসাধারণ পরস্পরকে হানাহানি না করে যাতে একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন তার জন্য উজ্জীবিত করা। বলা বাহুল্য যে এই দিক থেকে আমাদের দেশের ঐতিহাসিক নাটকগুলি লেখা হয়েছে। এই নাটকগুলি দেখে দর্শকগণ তাঁদের মাতৃভূমির ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে পেরেছেন, বিদেশী শাসনের ভার অনুভব করেছেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন কিনা সেকথা অন্য প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়।

লণ্ডন সহরের বিখ্যাত হে মার্কেট থিয়েটার সুবিখ্যাত টমাস লরেন্সের জীবনী অবলম্বন করে রচিত নাটক অভিনয় করবেন জেনে স্বভাবতঃই উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম। ইংলণ্ডের অন্যতম খ্যাতনামা নাট্যকার টেরেন্স র‍্যাটিগানের ওপর এই নাটক লেখার ভার পড়ে এবং তিনি 'রস' নামে যে নাটক লিখেছেন তা এর মধ্যেই সুবিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

সুবিখ্যাত টমাস এডওয়ার্ড লরেন্সের জীবন (১৮৮৮—১৯৩৫) এমন বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে যে নাটকে তাঁর জীবনকে রূপায়িত করা সহজ কাজ ছিল না। অক্সফোর্ডের সুবিখ্যাত কৃতী ছাত্র টি, ই, লরেন্স বৃটিশ মিউজিয়ামের অধীনে ইউফ্রেটিস নদীর পারে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের দলে যোগ দিয়ে আফ্রিকাতে এলেন। তিনি কোনদিনই যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন না। কি করে তিনি কাইরো সহরে অবস্থিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা বিভাগে

ঢুকে পড়লেন তা চিরকাল অজানা থাকবে। আমরা শুধু জানতে পারি যে, তাঁর কাজকর্মে তাঁর উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা খুসী হতে পারেননি। একদিকে তাঁর প্রচণ্ড ধূর্ত্ততার জন্ম তাঁকে সময়ে সময়ে ভয় করেছেন, অন্য দিকে ঔদ্ধত্যের জন্ম বারবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু তাঁরা লরেন্সের বিরুদ্ধে কোন কিছু করবার আগেই লরেন্স আরব মরুভূমিতে পালিয়ে গেলেন। এই সময় থেকে আরবের বিভিন্ন দলপতি, রাজকুমার এবং ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর্ব সুরু হল। বেদুইনদের সেরা দলপতি আউদাতায়ী লরেন্স সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাঁর দানশীলতার ফলে তিনি চিরকাল গরীব হয়েই ছিলেন। অন্য নেতা সেরিক আলী বলেছেন যে, তাঁর সঙ্গে বন্দুকশুদ্ধ উটের পিঠে লাফিয়ে উঠে সেই উটকে দৌড় করিয়ে দীর্ঘপথ নিয়ে যাওয়াতে একমাত্র লরেন্সই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। তাঁর নিজের জাতের লোকেরাও কখনো



অভিনেতা আলেক গীনেস

লরেন্সের মতো ধৈর্য্য এবং শক্তি দেখাতে পারেননি। এই সব বৃত্তান্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে, 'লরেন্স অব্ এ্যারাবিয়া' এই নাম পাবার দীর্ঘদিন আগেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে আরবকে জয় করেছিলেন।

আরবদের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন অত্যন্ত বিপদাপন্ন তখন হঠাৎ জেনারেল এলেনবির খাস কামরায় টি, ই, লরেন্স উপস্থিত হলেন। এ্যালেনবি বলেছেন যে, লরেন্স যদি সেদিন ইংরেজের শুভাকাঙ্ক্ষী না হয়ে আরবঘাতক হতেন তাহলে অতি সহজেই তাঁকে হত্যা করতে পারতেন। পরবর্তীকালেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বারবার দেখা গিয়েছে। যেখানে তাঁকে কেউ আশা করছেন না, তাঁর উপস্থিতি অসম্ভব মনে করছেন, সেখানেই মন্ত্রবলে লরেন্স উপস্থিত। চল্লিশ মাইলের ব্যবধান একরাত্রে অতিক্রম করে অসম্ভব মরুভূমির পথে লরেন্স বারবার যাতায়াত করেছেন। তাঁর লেখা যে দুটি বই আমাদের হাতে এসেছে তা পড়লে আমরা জানতে পারি যে, এই পিতৃপরিচয়হীন যুবক মরুভূমির আত্মজ হয়ে দেখা দিয়েছেন। আউদাতায়ী বিস্ময়বিমুগ্ধ প্রশংসায় বারবার লরেন্সের হুকুম মেনে দুর্গম মরুভূমির ভেতর দিয়ে যাতায়াত করেছেন। বেদুইন আউদাতায়ী যে মরুভূমির বুকের ওপর লালিত হয়েছেন সেই মরুভূমিকেও তাঁর থেকে ভাল চিনতেন এক অজ্ঞাতপরিচয় ইংরেজ যুবক টি, ই, লরেন্স।

একমাত্র লরেন্সের সাহায্যেই ইংরেজদের আরব জয় করা সম্ভব হয়েছিল একথা সরকারী এবং বেসরকারী মহল একবাক্যে স্বীকার করেছেন। বেদুইন পোষাক পরিহিত লরেন্স ফ্রান্সের প্যারি সহরে হোটেলে অবস্থান করবার জন্য যখন মোটর থেকে নামতেন তখন হাজার হাজার নরনারী তাঁর দর্শন পাবার জন্য, তাঁর বিরাট আলখাল্লার প্রান্তভাগ স্পর্শ করবার জন্য, তাঁর পোষাক চুম্বন করবার জন্য ভিড় করে জমায়েত হয়েছেন। বীরপূজার এমন দৃষ্টান্ত উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে খুব বেশী চোখে পড়ে না। বেদুইন পোষাকে সজ্জিত লরেন্স চার পাঁচটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। ইংরেজ সরকারের সেদিন তাঁকে অদেয় কিছুই ছিল না। খ্যাতির শিখরে অবস্থান করতে করতে কি বৈরাগ্য লরেন্সের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল তা কোনদিন জানা যাবে না। কেন তিনি খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থ এমনকি নিজের নাম পর্য্যন্ত ত্যাগ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে যাবার চেষ্টা করলেন তা চিরকাল অজ্ঞাত থেকে যাবে। নাট্যকার টেরেন্স র‍্যাটিগান লরেন্সের এই মানসিক প্রবৃত্তিকে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু করেছেন। তিনি নাটক সুরু করেছেন যখন লরেন্স

অফ এ্যারাবিয়া সামান্ত সৈনিক হিসাবে বিমানশিক্ষার্থী রস নামে দেখা দিলেন তখন থেকে। র‍্যাটিগান লরেন্সের খ্যাতিময় জীবনের বিভিন্ন ঘটনা দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাবার এই ইচ্ছা লরেন্সের চরিত্রের মধ্যে নিহিত ছিল। আরব জয়ের সময়ে হত্যা, মৃত্যু এবং দেশ জয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর বিজিগিষা প্রবৃত্তি ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। আরবে থাকা কালীন বিরুদ্ধপক্ষীয়রা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। র‍্যাটিগান বলেছেন এই সব অত্যাচার রসের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল। র‍্যাটিগান বলতে চেয়েছেন যে, লরেন্স যেদিন দেখলেন যে বহির্জগতের সম্মানের শিখরে বসে থাকা সত্বেও মনের জগতে তিনি অন্তঃসারশূন্য, সেদিন থেকেই তিনি বহির্জগতের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ বর্জ্জন করলেন। বিমানশিক্ষার্থী হিসাবে রস অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর কর্ম্মক্ষমতা দেখিয়েছেন। এজন্য বারবার তাঁকে তাঁর উর্দ্ধতন অফিসারদের কটূক্তি শুনতে হয়েছে। শেষে একদিন লণ্ডন থেকে ফিরতে দেরী হবার জন্য তিনি অভিযুক্ত হলেন। গতরাত্রে তিনি কি করেছেন বারবার জানতে চাওয়ায় রস ক্ষীণস্বরে উত্তর দেন যে, কয়েকটি বন্ধুব সঙ্গে পানাহার করতে তাঁর দেরী হয়ে গিয়েছিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর রস যখন তাঁর এই বন্ধুদের নাম বললেন, যখন জানা গেল যে, তিনি গতরাত্রে যাঁদের সঙ্গে পানাহার করেছিলেন তাঁরা হলেন লর্ড ও লেডী এ্যাস্টর, বার্ণাড´শ দম্পতী এবং ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ, তখন উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে ফাজলামি করবার জন্য রস অভিযুক্ত হলেন। তখনই সত্যের প্রকাশ ঘটল, জানা গেল রসের উক্তি সত্য এবং তিনি স্বয়ং খ্যাতনামা বীর লরেন্স অফ এ্যারাবিয়া। বলা বাহুল্য, সামান্য শিক্ষার্থী হিসাবে রসকে রাখা আর সম্ভবপর হলনা এবং গভীর রাত্রে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল। আরব যুদ্ধের প্রধান নায়ক লরেন্সকে বৃটিশ সরকার সামান্য বিমানশিক্ষার্থী হিসাবে রেখেছেন জানতে পারলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে কি দারুণ বিক্ষুব্ধ হবেন এই কথা ভেবে সামরিক কর্তৃপক্ষ ফ্রান্স, জার্মাণী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তাঁকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন।

দীর্ঘকাল পরে লরেন্স ইংলণ্ডে ফিরে এসেছিলেন এবং শ' নাম নিয়ে লণ্ডনের উপকণ্ঠে আমৃত্যু বসবাস করেছিলেন। লরেন্সের শেষ জীবনের এই করুণ ইতিহাসকে কেন্দ্র করে র‍্যাটিগান যে নাটক রচনা করেছেন তা সত্যই অনন্ত সাধারণ। বিখ্যাত এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি খ্যাতির ঔজ্জ্বল্য থেকে বারবার পালিয়ে গিয়ে সাধারণভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা করেছেন, নিজের

মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে জীবনের মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন, এটাই র‍্যাটিগানের নাটকের মূল বক্তব্য।

হে মার্কেট থিয়েটার রসের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য এলেক গিনেসকে নির্ব্বাচন করলেন এবং গ্লেন বিম শ নাটকটির পরিচালনা করলেন। আধুনিক ঐতিহাসিক নাটকের ব্যাপ্তি যে কতদূর পর্য্যন্ত হতে পারে এই নাটক দেখে তা হৃদয়ঙ্গম করলাম। স্যার এলেক গিনেস রসকে এমন প্রাণবন্ত করে তুললেন, গ্লেন বিম শ দৃশ্যপরিকল্পনাকে এমন সুগঠিত করলেন যে বারবার অভিনয়ের ভেতর দিয়ে আমরা সত্যিকারের লরেন্সকে অনুভব করতে পারছিলাম। রসের মন সারাজীবন ধরে যে শান্তি এবং নির্ব্বাণ খুঁজছিলেন অভিনয়ের ভেতর দিয়ে তা বারবার পরিস্ফুট হয়েছে। লরেন্সের জীবনী পাঠ করে তাঁর পরস্পর বিরোধী চরিত্রের ব্যাথা হয়ত বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু সেদিনের অভিনয়ে লরেন্সের চরিত্রের প্রশান্তি কামনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। র‍্যাটিগান লরেন্সের লেখা দুটি বই থেকে তাঁর নাটবস্তু সংগ্রহ করেছেন। এই বই দুটির নাম দি সেভেন পিলার্স অফ উইজডম এবং দি মিণ্ট। এই দুটি বই পড়লে র‍্যাটিগান লরেন্স সম্বন্ধে যে ছবি এঁকেছেন তা বিশ্বাস করতে দ্বিধাবোধ হয় না। অনেকে আরও বিশ্বাস করেন যে তাঁর জীবনে এবং রচনায় লরেন্স তাঁর পিতৃপরিচয় বহন করেছেন। লণ্ডনে একদল লোক বিশ্বাস করেন যে লরেন্স ছিলেন খ্যাতনামা লেখক জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র অবৈধ সন্তান। বার্নার্ড শ'র স্ত্রীর যে চিঠিগুলি মাত্র কিছুকাল হল প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে।

র‍্যাটিগান তাঁর নাটকে আধুনিক ঐতিহাসিক নাটকের কি পথ নেওয়া উচিত তার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। এক অসীম সাহসিক ব্যক্তির জীবনী রচনা করতে গিয়ে তিনি কেবল তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাই তুলে ধরেননি, তাঁর জীবনকে বিশ্লেষণ করেছেন, জীবনবেদকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন।

চিচেস্টার থিয়েটার

১৪ই জুলাই, ১৯৬২ যখন লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে চিচেস্টারে যাবার টিকিট কিনছিলাম তখন খুব বিরাট কিছু আশা করেছিলাম, একথা বললে ভুল হবে। চিচেস্টারে ইংলণ্ডের নবতম থিয়েটার তৈরী হয়েছে এবং সেখানে ৩রা জুলাই, ১৯৬২ থেকে প্রথম বৎসরের অভিনয়ও সুরু হয়েছে। সুতরাং ১৪ই জুলাই সমালোচনার কুজ্ঝটিকার অন্তরালে চিচেস্টার থিয়েটারের কোন স্পষ্টরূপ কল্পনা করতে পারিনি। চার বছর আগে লণ্ডন সহরের মধ্যে অভিনেতা বার্ণাড মাইল্‌স্‌ যখন একটি গুদামঘর ভেঙে মারমেড থিয়েট'রের পত্তন করলেন তখন মনে হয়েছিল সেটাই বোধ হয় চরম আধুনিকতা। চিচেস্টারের থিয়েটারকে তাই মারমেড থিয়েটারের বড় সংস্করণ ভাবতে ইচ্ছ' হচ্ছিল।

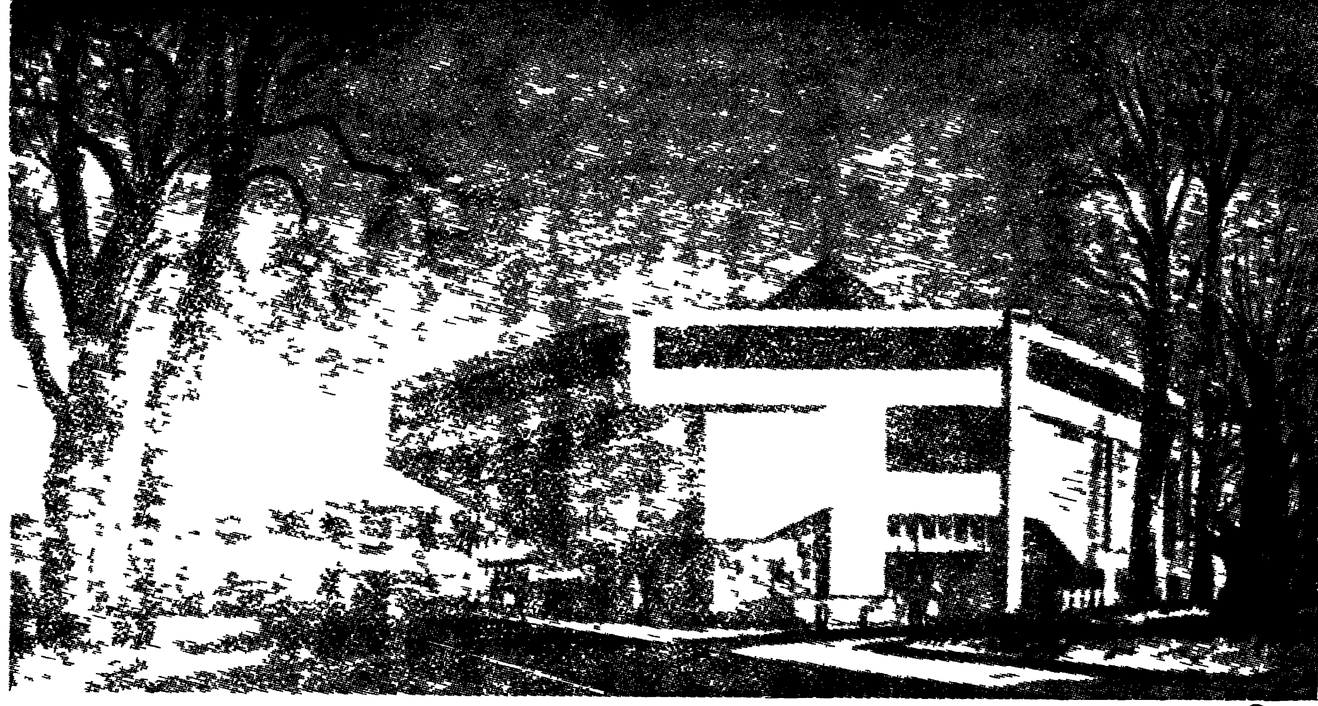
লণ্ডন সহর থেকে সত্তর মাইল দূরে চিচেস্টার গ্রামে আগে কেবলমাত্র সাউথ সীর সমুদ্রধারে যাবার যাত্রীদেরই ভিড় হত। অবশ্য চিচেস্ট'রের বিখ্যাত (Cathedral) গীর্জ্জা মাঝে মাঝে বিশেষ ধরণের টুরিস্টকে আকর্ষণ করেছে। সেজন্য এখানে কোন বড় থিয়েটার চালু করা এবং লণ্ডন থেকে নিয়মিত দর্শক আশা করা কম সাহসের কথা নয়। লণ্ডনের বাইরে কোন প্রথম শ্রেণীর থিয়েটার চলতে পারে, এ কথাই সেদিন অনেকে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু চিচেস্টার থিয়েটার যাঁ'রা গড়েছেন তাঁরা বলতেন যে, যদি স্ট্রাটফোর্ড-অন-আভনে এত লোক থিয়েটার দেখতে যায়, তাহলে চিচেস্টারেই বা আসবে না কেন? তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, চিচেস্টারের এই মঞ্চটিতে যদি সত্যি-কারের প্রথম শ্রেণীর অভিনয় হয়, তাহলে দর্শকের অভাব কখনই হবে না।

ট্রেণের দু'ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে চিচেস্টার ষ্টেশনে নামামাত্র তাঁদের আশা যে কি পরিমাণে সফলতা লাভ করেছে তা বুঝতে পারলাম। থিয়েটার দর্শকদের প্রয়োজনে চিচেস্টার গ্রামের সেই ছোট্ট-ষ্টেশনটাকে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নূতন করে তৈরী করা হয়েছে। অতি আধুনিক এই ষ্টেশন গৃহটি দেখতেও যেমন মনোরম, এখানকার ব্যবস্থাও তেমনি সুনিপুণ। অপেক্ষা করবার ঘরগুলি সাধারণ ষ্টেশনের তুলনায় অনেক বড় এবং সংখ্যাতেও যথেষ্ট। ক্ষুধার্ত্ত দর্শকদের জন্যে যে ব্যবস্থা আছে তাতে অন্য কোন ষ্টেশনের ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক। রাত্রের শো'য়ে থিয়েটার দেখে লণ্ডনে ফিরে যাবার সুবিধার

জন্যে একটি বিশেষ ট্রেণের ব্যবস্থা হয়েছে। সেটি থিয়েটার শেষ হবার সময়ের সঙ্গে তাল রেখে রাত্রি সাড়ে দশটায় ছাড়ে এবং সোয়া বারটায় ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌছে যায়।

ষ্টেশন থেকে যখন রাস্তায় বেরোলাম তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। চিচেস্টার যে ইংলণ্ডের মধ্যে, একথা পাছে আমরা ভুলে যাই, সেজন্য আবহাওয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী খুব সতর্ক হয়েছেন বুঝতে পারলাম। সম্পূর্ণ আনাড়ীর মতন থিয়েটারের পথ জিজ্ঞাসা করে করে হাঁটতে সুরু করলাম। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, নিয়মিত বাস রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে ছাড়ে এবং চিচেস্টার থিয়েটারের সামনে প্রথমবার থামে। ষ্টেশনের পাশে অমন চমৎকার সুন্দর বাড়ীটি যে বাসে ওঠবার জায়গা এটা ভারতবাসী শুধু আমি কেন, খাস লণ্ডন সহরের বা ইংলণ্ডের অন্যান্য জায়গার লোকও অনেকেই বুঝতে পারেননি। প্রত্যেকটা বাস, রুট অনুসারে বিভিন্ন খোপের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে এবং খোপের পাশে বাসের অপেক্ষা করবার ঘরগুলি থেকে আমরা বেরিয়ে এসে বাসে উঠছি, বাস থেকে নেমে থিয়েটার খুঁজে না পেয়ে খুবই চিন্তিত হলাম। লণ্ডন থেকে আগত এক দম্পতীর সঙ্গে বাসে আলাপ হল, তাঁরাও আমার মত দিশাহারা। ভদ্রলোকের একটা পা খোঁড়া থাকায় তাড়াতাড়ি হাঁটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তাঁদের অনুমতি নিয়ে আমি পা চালিয়ে আগিয়ে গেলাম, থিয়েটারকে খুঁজে বার করবার জন্যে। প্রকাণ্ড একটি পার্ক আমাকে গ্রাস করল। ওক গাছের বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সামনের বিরাট সবুজ ঘাসের আস্তরণে চোখ স্নিগ্ধ হয়ে গেল। তারই শেষে, দেবী মিনার্ভার রূপলাঞ্ছিত পতাকার তলে চিচেস্টার থিয়েটার দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বাইরে থেকে কোন থিয়েটারকে দেখে যে মুগ্ধ হওয়া যায়, তা সেদিন প্রথম আবিষ্কার করলাম। সহগামীদের ডাক দিতে তাঁরা এগিয়ে এলেন, তিন জনাই ছোট ছেলের প্রথম সমুদ্র দেখার মত অবাক হয়ে থিয়েটারটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ভদ্রলোক মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, God, it has taken me in !

আমি তখন অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে, এই চমৎকার থিয়েটারটি প্রায় একজনার চেষ্টাতেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী হয়েছে। লেসলি এভারসেড মার্টিন ১৯৪১ সালে চিচেস্টারের সিটি কাউন্সিলের সভ্য হলেন। এই তরুণ নাট্যামোদীর মনে তখন থেকেই চিচেস্টারে একটি ভাল থিয়েটার করবার ইচ্ছা জেগে ছিল। কিন্তু যাঁর সঙ্গেই এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেছেন



চিচেস্টার থিয়েটার

তিনিই এই সম্ভাবনাকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন যে, 'লণ্ডনের ৪০।৫০টি থিয়েটারেই সব সময় দর্শক হয় না, আর লণ্ডন থেকে এই ৭০ মাইল দূরে তাঁরা আসবেন থিয়েটার দেখতে একথা ভাবা অসম্ভব কল্পনা। এভারসেড মার্টিনের মাথা খারাপ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু লণ্ডনের থিয়েটার দর্শকদের মাথা খারাপ হয়নি।' দীর্ঘ পনের বছর কেটে গেল। মার্টিন দ্বিতীয়বার মেয়র নির্ব্বাচিত হলেন। রাণীর আসাকে উপলক্ষ করে চিচেস্টারে বিরাট সভার আয়োজন হল। অন্যান্য নানা অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়ে মেয়র এভারসেড মার্টিন বললেন যে, ইংরেজের পরিচয় তাঁর থিয়েটারে এবং রাণী অনুমতি করলে তিনি চিচেস্টারে একটি নূতন থিয়েটার তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। রাণী সানন্দে অনুমতি দিলেন। সবাই হাততালি দিল। কিন্তু মনে মনে সবাই জানত যে, এভারসেড মার্টিনের এই প্রিয় চিন্তাটি আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছুই নয়। সেদিন এভারসেড মার্টিনকে যথেষ্ট ঠাট্টা তামাসা সহ্য করতে হয়েছিল এবং রাণীর সামনে চিন্তা না করে কথা বলবার জন্যে সংবাদপত্রের বক্রোক্তিও কম শুনতে হয়নি। এভারসেড মার্টিন থিয়েটার তৈরী করবার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি যদি তাঁর নূতন থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপন করতে না পারেন তাহলে তিনি সর্ব্বসমক্ষে নিজের পরাজয় স্বীকার করবেন।

লেসলি এভারসেড মার্টিন চিচেষ্টারে নূতন থিয়েটার তৈরীর সঙ্কল্প নিয়ে সর্ব্ব প্রথম ঘোষণা করলেন যে, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে, চিচেষ্টারের থিয়েটারও হবে। তারপর এভারসেড মার্টিন যা করলেন তা থিয়েটারের ইতিহাসে একেবারেই নূতন। তিনি থিয়েটার গৃহ তৈরী করবার জন্যে যেমন ক্রিষ্টোফার ষ্টিভেন্সকে ডেকে পাঠালেন তেমনি নাটক পরিচালনার দায়িত্বের জন্যে খ্যাতনামা অভিনেতা ও পরিচালক স্যার লরেন্স অলিভিয়ারকে দু' বছরের জন্যে উপদেষ্টা এবং পরিচালক নিযুক্ত করলেন। চিচেষ্টারের জ্ঞানী-গুণীরা এ খবর শুনে হেসেই অস্থির হলেন। কোথায় থিয়েটার তার খোঁজ নেই এর মধ্যেই থিয়েটারের পরিচালক নিযুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁরা অপেক্ষা করে রইলেন এভারসেড মার্টিন কি প্রচণ্ড রকম অপদস্থ হন সেইটা দেখবার জন্যে।

দিনের পর দিন এভারসেড মার্টিন তাঁর পরিচালক এবং মঞ্চ পরিকল্পককে নিয়ে কাগজের ওপর থিয়েটারের নক্সা কাটতে আরম্ভ করলেন। এমন থিয়েটার তিনি করতে চাইলেন যেখানে অভিনয় করে অভিনেতারা আনন্দ



চিচেস্টার থিয়েটারের মঞ্চ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

পাবেন এবং দর্শকেরাও নাটকের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলতে পারবেন। অবশেষে মঞ্চের পরিকল্পনা শেষ হল, ছয় কোণ বিশিষ্ট নাট্যগৃহ সকলের অনুমোদন লাভ করল। কোন রকম দৃশ্যসজ্জাবিহীন নাট্য মঞ্চটির কোন দিকে কোন পর্দার বাধা রাখা হল না। খোলা মঞ্চ রীতিকে অনুসরণ করে মঞ্চটিকে দর্শকের মাঝে নিয়ে আসা হল, মঞ্চের তিন দিকে দর্শক বসবার জন্তে দু'হাজারের কিছু বেশী আসনের ব্যবস্থা হল এবং মঞ্চে অভিনয়ে যাতে বিভিন্ন উচ্চতাকে ব্যবহার করা যায় সেজন্তে মঞ্চটিকে তিনতলাবিশিষ্ট করা হল। বলা বাহুল্য, চিচেষ্টারের এই মঞ্চটি আমাদের কল্পনাকে এত দূরে ফেলে রেখে চলে যায় যে, আমাদের মঞ্চ জ্ঞান বা বিবেচনায় কেবল বর্ণনা পড়ে এই মঞ্চটি সম্পূর্ণ ধারণা করা সম্ভব নয়। বলা চলতে পারে যে, যাত্রার সঙ্গে থিয়েটার হাত ধরাধরি করে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। যাত্রার যা কিছু ভাল, থিয়েটারের যা কিছু গ্রহণযোগ্য তাই একসঙ্গে মিলিয়ে এই মঞ্চটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই ধরণের মঞ্চে সুষ্ঠু অভিনয় হতে হলে আলোর ব্যবস্থা যে অপূর্ব হওয়া প্রয়োজন একথা কাউকে বলে দিতে হবে না এবং সে ব্যবস্থাটি এখানে যে কত সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে তা এখানকার অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনার সময় বলতে চেষ্টা করব।



চিচেস্টার থিয়েটারের অভ্যন্তরে নাটকের প্রস্তুতি

আলোর ব্যবস্থা করবার জন্তে এঁরা নিয়ে এলেন সন কেনীকে। সন

কেনী সম্বন্ধে এই অবকাশে দু' এক কথা বলা অন্যায় হবে না। বর্তমানে মঞ্চে পরিকল্পনা এবং আলোকসম্পাতকারীদের মধ্যে সন কেনী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছেন। এই আইরিশ যুবকটি মাত্র পাঁচ বছর আগে স্থাপত্য শিল্প পরীক্ষায় অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বিখ্যাত স্থপতি ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন থিয়েটারের ডাক তার মধ্যে জেগে উঠল। অত্যন্ত অর্থকরী পেশা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে তিনি থিয়েটারের মঞ্চ পরিকল্পনার কাজে নেমে গেলেন। মাত্র এই কয়েক বছরের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম আলোক ও মঞ্চ পরিকল্পক বলে দেশে বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

সন কেনী চিচেষ্টারের আলোক পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করে জানালেন যে, বিশেষ ধরণের মঞ্চটিতে ভাল আলোর ব্যবস্থা করতে হলে থিয়েটার গৃহের ছাদটিকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করতে হবে। তিন দিকে দর্শক বসবেন সুতরাং তাঁদের কারুর চোখে যাতে আলো না গিয়ে পড়ে তার জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অবশেষে এই ছয় কোণ বিশিষ্ট থিয়েটার গৃহটিতে একটি অপূর্ব্ব শিখর যোগ করা হল। ভেতর দিক থেকে এই শিখরটি দেখলে মনে হবে যেন বিরাট একটি লৌহনির্মিত মাকড়সার জাল গৃহটির ওপরে বিছান রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই পরিমাণ খোলা লোহা ব্যবহার করার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল যে এতে শব্দ সঞ্চরণে ব্যাঘাত ঘটবে। সে বিষয়ে পরিকল্পকগণও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কাজেই বিশেষ রকম রং-এ এই লোহার জালটিকে রং করানর ব্যবস্থা এবং মঞ্চ পরিকল্পনায় যাতে শব্দ সঞ্চরণের সুবিধা হয় তার সুবন্দোবস্ত করা হল। আধুনিক শিল্প জগতের ব্যবহারিক প্রয়োগের অপরূপ নিদর্শন হল এই গৃহ।

ধীরে ধীরে মঞ্চটি রূপ নিতে লাগল। পাওয়েল ও মোয়া কোম্পানী এই গৃহটি তৈরী করবার ভার গ্রহণ করলেন। এভাবসেড মার্টিন অর্থ সংগ্রহের জন্যে কেবল সমস্ত ইংলণ্ডকে নয়, কানাডাকেও উতলা করে ফেললেন। অবশেষে ১২ই মে, ১৯৬১ রাজকুমারী আলেকজাণ্ড্রা এই অপূর্ব্ব থিয়েটারটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে এভারসেড মার্টিন একটি ন্যাসী সংসদের হাতে এই সমস্ত থিয়েটারটি অর্পণ করলেন। ডিউক অব নরফোককে চেয়ারম্যান করে তিনি এই ন্যাসী সংসদে নিয়ে এলেন খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যসেবী এবং থিয়েটার সম্পর্কে উৎসাহিত জনসাধারণের প্রতিনিধিদের। এই ন্যাসী সংসদের মধ্যে তাই আমরা শিক্ষা

বিভাগের অধিকর্তাকে যেমন পাচ্ছি তেমনি পাচ্ছি এলেক গিনেস এবং পেগী এসক্রফ্‌টের মতো বিশ্ববন্দিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। নাট্য পরিচালককে এই স্থায়ী সংসদ যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। কেবলমাত্র নাটক-নির্বাচন নয়, অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন, দৃশ্য ও মঞ্চ সজ্জাকর নির্বাচন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে পরিচালককে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। প্রথম বৎসরের অভিনয়ের জন্য স্যার লরেন্স অলিভিয়ার তিনখানি নাটক নির্বাচন করলেন। প্রথম ১৬১৩-২৫-এর মধ্যে লিখিত জন ফ্লেচারের "দি চান্সেস", দ্বিতীয়—১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত জন ফোর্ডের "ব্রোকন হার্ট" এবং তৃতীয়—১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত চেকভের "আঙ্কল ভানায়া"।

চিচেষ্টারের আধুনিকতম মঞ্চে প্রথম কি নাটক অভিনয় হবে তা নিয়ে জল্পনার অবধি ছিল না। নূতন ধরণের মঞ্চ, নূতন ধরণের দর্শকাসন, সন কেনী মঞ্চ ও আলোর পরিকল্পনা করেছেন এবং স্বয়ং স্যার লরেন্স অলিভিয়ার পরিচালক। সুতরাং নূতন কিছু এখানে যে ঘটবেই এ কথা সবাই স্থির জেনেছিলেন। খ্যাতিমান এবং বিশিষ্ট অভিনেতাদের মধ্যে, আধুনিক চিন্তাধারার এবং আধুনিক নাটকের স্যার লরেন্স অলিভিয়ার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এইতো সেদিন একজন অখ্যাত নাট্যকারের নাটকে অভিনয় করে তিনি সেই নাটক এবং নাট্যকারকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে জন ওসবোর্নের এই কঠিন নাটক "এণ্টারটেনার" অন্য কোন অভিনেতার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করান যেত না।

সকলে মনে করেছিলেন যে লরেন্স অলিভিয়ার চিচেষ্টার মঞ্চের দ্বার উদ্‌ঘাটন করবার জন্য হয়ত কোন আধুনিক নাটককে নির্বাচন করবেন। সকলের চিন্তাধারাকে ভুল প্রতিপন্ন করে স্যার লরেন্স জন ফ্লেচারের "দি চান্সেস" নাটকটি নির্বাচন করলেন। মহাকবি সেক্সপীয়রের সহযোগী নাট্যকার ও কবি ফ্লেচারের এই নাটকটি ১৬১৩ থেকে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে লেখা। ১৬৬৬ সালে স্যামুয়েল পেপিপস এই নাটকটির অভিনয় দেখেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে এই নাটকটির অভিনয় কেবল বার বার আর্থিক ক্ষতিরই কারণ হয়েছে। এই নাটকটি শেষবার অভিনীত হয় ড্রুরি লেন থিয়েটারে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে। আভিজাত্যের অহঙ্কার নিয়ে লেখা এই হাসির নাটকটি সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজী নাটক পড়বার সময় আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তখন সমস্ত নাটকটি আমার কাছে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন এবং কারণহীন মনে হয়েছিল। অসম্ভাব্যতা এবং বস্তুহীনতার প্রাচুর্য্য পাঠকের মনে

কোন রেখাপাত করতে পারেনি। চিচেষ্টারে এই নাটকটি সর্বপ্রথম অভিনীত হবে শুনে কেবল আমি নই, ইংলণ্ডের জনসাধারণ সম্পূর্ণ আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। একথা বহু লোককে বলতে শুনেছি যে, স্যার লরেন্স অলিভিয়ার চিচেষ্টারের মঞ্চটি খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই কি বন্ধ করতে চান? দ্বিতীয় নাটক



চিচেস্টার থিয়েটারে অভিনয়

হিসেবে স্যার লরেন্স, জন ফোর্ডের "দি ব্রোকন হার্ট" নাটকটি নির্বাচন করলেন। ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটকটি লেখা হয় এবং সেই সময় চার্লস ল্যাম্ব এই নাটকটির অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু ফ্লেচারের নাটকের মতেই এই নাটকটি অভিনয় করতে গিয়ে বিভিন্ন দলকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। মাত্র একরাত্রি অভিনয়ের পর এই নাটক বন্ধ করে দিতে হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বিয়োগান্ত এই নাটকটি পড়তে যেমন শ্লথগতি, তেমনি অতি নাটকীয়। ফ্লেচারের নাটক পড়তে ভাল লাগে না, ফোর্ডের নাটক পড়া যায় না। দুটির কোনটিই পাঠকমনে কোন রেখাপাত করে না।

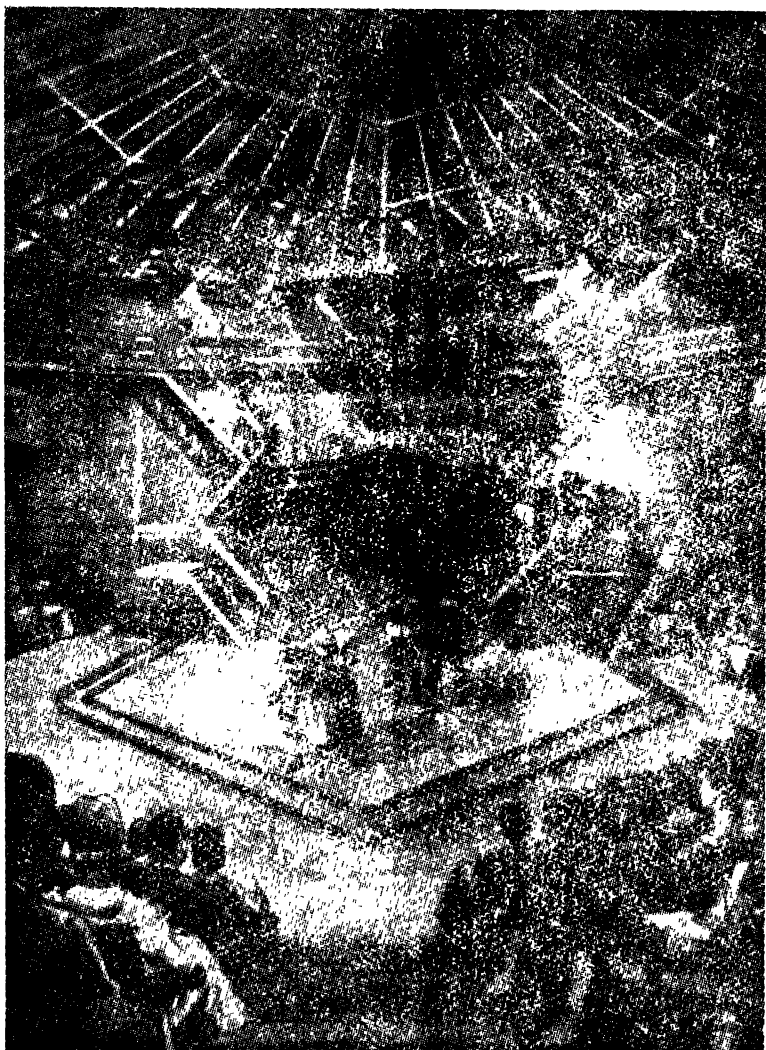
এই দুটি নাটক নির্বাচন করে স্যার লরেন্স অলিভিয়ার কেবল ইংলণ্ডের নাট্যসমাজকে নয়, পৃথিবীর নাট্য সমাজের সামনে এক প্রচণ্ড এবং মহৎ দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। সে দৃষ্টান্ত হল এই যে, পুরোণ নাটক বলে কিছু নেই, অসম্ভব বা অবাস্তব নাটক বলে কিছু নেই, অতি নাটকীয় বা মন্থর নাটক বলে কিছু নেই; ভাল পরিচালকের হাতে, ভাল প্রযোজকের অধীনে যে কোন নাটক শতবিজলীর প্রভায় ঝলক লাগাতে পারে। "চান্সেস" নাটকটিকে স্যার লরেন্স অলিভিয়ার সুষ্ঠু সম্পাদনায় এক অপূর্ব হালকা হাসির নাটকে

রূপান্তরিত করেছেন। আভিজাত্যের অহঙ্কারে নাটকরে মধ্যে যে বিষাদের আবহাওয়া এসে আনন্দের রূপকে নষ্ট করে দিচ্ছিল স্যার লরেন্সের হাতে পড়ে তা আত্মম্ভরিতার পাগলামিতে রূপান্তরিত হয়ে নাটকের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল।

চমৎকার ঝকঝকে খাপখোলা তলোয়ারের মতো'ই মসৃণ ধারাল অভিনয় মুহূর্ত্তের জন্যও নাটকের হাল ছাড়ে না। যাত্রার মতন দর্শকদের মধ্যে দিয়ে মঞ্চে আসা যাওয়ার মধ্যে হালকা চালে নিখুঁত অভিনয় মনকে মাতিয়ে তোলে। এক সময় গল্পের বারবিলাসিনী জনৈক মন্তপের হাত থেকে পালিয়ে যাবার জন্য মঞ্চের তিন তলা জুড়ে ছুটে বেড়ান, এমন কি প্রেক্ষাগৃহের ষট্ দিকে (কারণ মঞ্চ গৃহটি এখানে ষষ্ঠ কোণ বিশিষ্ট হয়েছে) দর্শকদের মাথার ওপরকার বারান্দা দিয়ে তাঁকে আর্ত্ত চীৎকারে ছুটে বেড়াতে দেখা যায়। কখনও দর্শকদের মাঝে কখনও মঞ্চের ওপরে আলোকের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ এই নাটকটির সাফল্যের প্রধান সহায়। বিভিন্ন রঙের স্থিতিশীল স্পটলাইটগুলোকে ক্রমান্বয়ে জ্বালান এবং নেভানর ভেতর দিয়ে এক অদ্ভুত বিশৃঙ্খল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়েছিল। মঞ্চের দুই দিককে আলোর সাহায্যে এমনভাবে ভাগ করা হয়েছিল যে মনে হয় যেন মাঝে বিরাট কাল একটি দেওয়াল অবস্থান করছে।

"ব্রোকন হার্ট" নাটকটি দেখেও অবাক হয়ে গেলাম। অভিনয়ের গুণে এবং সুষ্ঠু সম্পাদনায় নাটকটিকে গতিশীল করা হয়েছে। স্যার লরেন্স স্বয়ং একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন জন নেভিল, কিথ মিচেল, জোয়ান গ্রীণউড এবং লেডী অলিভিয়ার—জোয়ান প্লাওরাইট। কমেডির সঙ্গে ট্র্যাজেডির আলোকসম্পাতে যে কি পরিমাণ তফাৎ হওয়া উচিত তা এই দুটি নাটকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। প্রথম নাটকে আলোক নিয়ন্ত্রণ 'যেমন হাসির আবহাওয়া সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে দ্বিতীয় নাটকে তেমনি গম্ভীর পরিস্থিতিকে এমন উদগ্র করেছে, ক্রমবর্দ্ধমান ট্র্যাজেডিকে এমন প্রকট করেছে যে, হাসির সেখানে কোন অবকাশই থাকে না। দৃশ্য পরিকল্পনাতেও প্রথম নাটকটি কেবল গুটিকতক সিঁড়িতে সীমাবদ্ধ ছিল, দ্বিতীয় নাটকে রোমের বাড়ীঘর, সহর রাস্তা দেখ ন হয়েছে। প্রথম নাটকটি দেখে এই কথাই মনে হয়েছিল যে, খোলা মঞ্চটি হ ল্কা নাটকের পক্ষেই বেশী উপযোগী। কিন্তু 'ব্রোকন হার্ট" দেখে মত পরিবর্ত্তন করতে হল। দর্শকদের সামনে পর্দাবিহীন, মঞ্চ মুখবিহীন মঞ্চের ওপর যখন একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যেতে লাগল—কখনও কাউকে খুন করা হল, কখনও কাউকে বিশ্বাস

ঘাতকতা করে বন্দী করা হল—তখন যেন সবটুকু ব্যথা দর্শকদের মনকে আঘাত করেছে। সবশেষে যখন রাজকুমারী অন্যায়ভাবে হত তাঁর বাগদত্ত স্বামীর মৃতদেহের ওপর বিষপান করলেন, তখন মনে হল যে এ নাটক সেক্সপীয়ারের "রোমিও জুলিয়েট" নাটকের থেকে কোনক্রমেই হীন নয়।



চিচেস্টার থিয়েটারে অভিনয় (অন্য আসন থেকে)

বরঞ্চ এর ব্যথা আরও সুদূরপ্রসারী, কারণ প্রেমের ব্যর্থতায় যাঁরা মারা গেলেন তাঁরা অনূঢ়া যুবক-যুবতী নন, পূর্ণ যৌবন নরনারী।

স্যার লরেন্স এই দুটি লোকমানী নাটক নির্বাচন করে তাদের প্রযোজনার যে কৃতিত্ব দেখালেন তাতে তিনি যে কত বড় পরিচালক তাই শুধু আর একবার প্রমাণিত হল। তিনি যেন সমালোচকদের যোগ্য উত্তর দিলেন, নূতন ধরণের এই খোলা মঞ্চটি তাঁর প্রচেষ্টায় পরম স্বার্থকতা লাভ করল। এই নাটক দু'টি দেখে নাট্য প্রযোজনার এই শিক্ষাই আমি লাভ করলাম যে, যে কোন নাটক প্রযোজনার গুণে অপূর্ব সুন্দর হতে পারে।

চিচেষ্টার থিয়েটারে এই বৎসরের তৃতীয় এবং শেষ নাটক চেকভের "আঙ্কল ভানায়া"র টিকিট কিনে লণ্ডনে ফিরে এলাম।

চেখভের বিখ্যাত নাটক আঙ্কল ভানায়ার পরিচয় নাট্যামোদীদের কাছে নূতন করে জানাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আঙ্কল ভানায়া কেবলমাত্র চেখভের নাটকের অন্যতম নয়। পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যে মানুষের হতাশা এবং দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে সমস্ত নাটক লেখা হয়েছে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। ইউজিন ও' নীলের মধ্যে যে বিষাদবাদের পরিপূর্ণ স্ফুরণ দেখতে পাই চেখভের মধ্যে তার প্রথম পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। দুঃখবাদী চেখভের আঙ্কল ভানায়া রুশ পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করে জাগতিক মর্য্যাদায় সফলতা লাভ করেছে।

এই নাটকটির অত্যন্ত সুষ্ঠু অভিনয় বহুবার বহু জায়গায় হয়েছে। সেই দিক থেকে চিচেষ্টারে অভিনীত অন্য দুটি নাটকের তুলনায় এটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মী। ষ্টানিস্লাভস্কি প্রযোজিত আঙ্কল ভানায়ার অভিনয় থেকে সুরু করে মাত্র কিছুদিন আগেকার ইউরোপ ভ্রমণকারী মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনয় দর্শকের প্রশংসা লাভ করেছে। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে নিয়মিত মঞ্চে। অর্থাৎ অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকদের ব্যবধান মঞ্চের সম্মুখভাগ রক্ষা করেছে এবং বিভিন্ন দৃশ্যসজ্জায় মঞ্চমায়া সৃষ্টি করা হয়েছে। আঙ্কল ভানায়ার ব্যথা, তার হতাশা, ব্যর্থতা দর্শকরা অনুভব করেছেন। তার হাসিকান্না দেখেছেন দূরে বসে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক মঞ্চের জন্য লিখিত নাটক খোলা মঞ্চে সাফল্য লাভ করতে পারে কিনা এই প্রশ্নই সকলকে বিচলিত করল। 'দি চান্সেস' এবং 'ব্রোকন হার্ট' নাটক দুটির সাফল্য এ প্রশ্নকে আরও তীব্র করল। খোলা মঞ্চে স্যার লরেন্স অলিভিয়ার, ঢাকা মঞ্চের দুটি অসফল নাটককে সফলতা দিয়েছেন। কিন্তু

ঢাকা মঞ্চের একটি অত্যন্ত সফল নাটক খোলা মঞ্চে সফল হবে কি ? এ প্রশ্ন পরিচালক স্যার লরেন্স অলিভিয়ারের মনকেও যে বিশেষভাবে চিন্তিত করেছিল তার প্রমাণ আমরা পাই তার অত্যন্ত সযত্ন প্রযোজনায়। নাটকের নয়টি চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে তিনি নিয়ে এলেন ইংলণ্ডের নয় জন অত্যন্ত খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে। এঁদের যে কোন একজনের নাম আলোর অক্ষরে লিখতে পারলে ইংলণ্ডের সব থিয়েটারই গর্বিত বোধ করবে। সামান্য কৃষক এফিনের আট-নয় লাইন সংলাপ বলবার জন্যে এলেন পিটার উডথর্প। নার্স এবং ভৃত্যের দুটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করলেন ডেম সিবল থর্ণডাইক এবং তাঁর স্বামী স্যার লুই ক্যাসন। অধ্যাপকের আর ভানায়ার মায়ের ভূমিকায় করলেন আন্দ্রে মোরেল এবং কে কম্পটন। জোয়ান প্লাওরাইট এবং জোয়ান গ্রীনউড যথাক্রমে সোফিয়া এবং ইলয়েনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। স্যার লরেন্স স্বয়ং ডাক্তার এবং স্যার মাইকেল রেডগ্রেভ ভানায়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অভিনয় যে কত উচ্চ মানের হল তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। আমার মনে হল যে কেবল এই একটি নাটক দেখার জন্যে যদি ভারতবর্ষ থেকে আসতাম তাহলেও সে আসা সার্থক হত। স্যার লরেন্স সমস্ত নাটকটির কেন্দ্রকে ইলয়েনার প্রতি ভানায়ার ব্যর্থ প্রেম থেকে সরিয়ে এনে সোফিয়ার জীবনের ব্যর্থতার সঙ্গে ভানায়ার জীবনের ব্যর্থতাকে একসূত্রে গেঁথে তুললেন। তার ফলে ভানায়ার দুঃখের পাশে পাশে সোফিয়ার জীবনের ব্যর্থতা বয়ে চলল এবং শেষে মামা এবং ভাগ্নী যখন নিজেদের জীবনের চরম ব্যর্থতায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সান্ত্বনার একমাত্র অবলম্বন হলেন তখন নাটকের দুঃখবাদ আরো বেশী সার্থকতা লাভ করল। প্রচলিত নিয়মে সোফিয়াকে সাধারণতঃ পার্শ্ব চরিত্র হিসাবে দেখান হয়ে থাকে। তার ফলে নাটকের শেষে সোফিয়া যখন ভানায়াকে অন্ততঃ তাঁর জন্যে বেঁচে থাকতে অনুরোধ করেন তখন বৃহৎ ব্যথার কাছে ছোট দুঃখের আকুতির মতন শেষ কথাগুলি মনে হয়। স্যার লরেন্সের প্রযোজনার প্রথম থেকেই সোফিয়াকে অন্যতম প্রধান চরিত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তার জীবনের ব্যথা এবং ব্যর্থতা তার দেহের রূপহীনতাকে কেন্দ্র করে তার মনের সৌন্দর্য্যকে অবমাননা, ভানায়ার ব্যর্থ প্রেমের থেকে কিছুমাত্র ছোট নয় প্রমাণিত হয়। তাই নাটকের শেষে পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা শুধুমাত্র স্বাভাবিক নয়, জীবজগতের একান্ত স্বধর্ম্ম বলে মনে হয়।

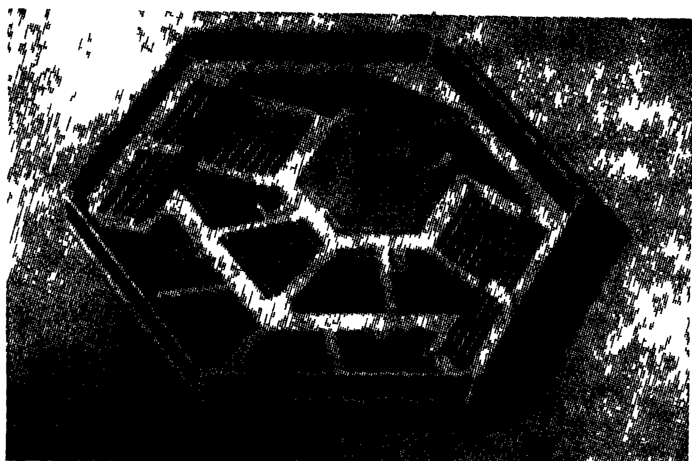
এই নাটকটির দৃশ্যসজ্জায় সন কেনি অপূর্ব সার্থকতা দেখালেন। পেছনের

কাঠের দৃশ্যটি এমন করা হোল যাতে সেটি একাধারে বাড়ীর বহির্ভাগ এবং ভিতরভাগ বোঝায়। বাড়ীর বহির্ভাগে বাগান বোঝাবার সময় সন কেনি স্পট লাইটের ভেতরে কাট আউট সংস্থাপন করে সমস্ত মঞ্চটিকে গাছের ছায়ায় ভূষিত করলেন। সেই স্থির আলোছায়াকে অতি চমৎকাররূপে ব্যবহার করলেন অভিনেতারা। অভিনেতাদের মুখের ওপর আলোছায়ার যে খেলা হল তা বিশেষ আলোক সম্পাতের ফল নয়, মঞ্চের ওপরে নিজেদের দাঁড়ান, দেহসঞ্চালন এবং গতি নিয়ন্ত্রণ করে তারা এই আলোককে ব্যবহার করলেন। বাড়ীর ভেতরকার দৃশ্য দেখাবার সময় আরেক দল স্পটলাইট জ্বলে উঠল এবং বাইরে চাঁদে আলোয় কাঁচের জানালার যে ছায়া ঘরের মধ্যে পড়ে তেমনিভাবে বিভিন্ন দিক থেকে জানলার ছায়াগুলি মঞ্চের ওপর পড়ল। খোলা মঞ্চসত্ত্বেও মনে হল যে, ঘরের ভেতরকার ঘটনা দেখছি। এবারও অভিনেতারা কখন আলোর মধ্যে কখন ছায়ার মধ্যে অভিনয় করে দেখালেন যে চরম বাস্তবধর্ম্মী অভিনয় কতদূর সফলতা লাভ করতে পারে।

সমস্ত নাটকটির মধ্যে কোন যন্ত্রসঙ্গীত দেওয়া হয়নি। ঘোড়ার গাড়ীর আওয়াজ, ঘোড়া দেখে কুকুরের চীৎকার এবং চঞ্চল মুহূর্ত্তে অধ্যাপকের বেতনভুক চাষীদের নেপথ্য গণ্ডগোল একমাত্র মঞ্চ বহির্ভূত শব্দ।

খোলা মঞ্চে আঙ্কল ভানায়া, নাটক না হয়ে জীবনের অংশে রূপান্তরিত হয়ে যাবে একথা কেউ চিন্তা করতে পারেন নি। নাটকের দুঃখ, নাটকের ব্যথা আমাদের বর্ত্তমান জীবনের দুঃখ-হতাশার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল। ভানায়া আর সোফিয়ার ব্যর্থতাকে আমাদের জীবনের ব্যর্থতার সুস্পষ্ট প্রতীকরূপে চোখের সামনে দেখে শিউরে উঠলাম। নাটকের শেষে কোন করতালি নাই। কোন আওয়াজ নাই, যাবার জন্যে কেউ ব্যস্ত হয়ে আসন ছেড়ে উঠলেন না। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতায় আঙ্কল ভানায়ার সরব সার্থকতা যেন বিঘোষিত হল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে সমস্ত দর্শকমণ্ডলী একজন লোকের মতো নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে এই বিখ্যাত অভিনয়কে শ্রদ্ধা জানালেন। আরও পরে যখন দর্শকদের অভিবাদন জানাবার জন্যে অভিনেতারা নাটকের মঞ্চে প্রবেশ করলেন একমাত্র তখনই প্রচণ্ড করতালি-ধ্বনিতে এই অপূর্ব অভিনয়কে অভিনন্দন জানান হোল।

চিচেষ্টারে সম্পূর্ণ অবাস্তব থেকে সুরু করে অতি বাস্তবরীতি পর্য্যন্ত বিভিন্ন রীতিতে নাট্যপ্রযোজনা করে স্যার লরেন্স অলিভিয়ার প্রমাণ করলেন যে কেবল অভিনেতা হিসাবে সুখ্যাতিরশিখরে তাঁর অবস্থান নয়, ইংলণ্ডের



চিচেস্টার থিয়েটারের মডেল

জাতীয় নাট্যশালার প্রথম নাট্য প্রযোজক হিসাবে তাঁর নির্বাচন অত্যন্ত সার্থক। স্যার লরেন্স অলিভিয়ার প্রমাণ করলেন যে মঞ্চ যেমনি হোক, নাটক যেমনি হোক, অভিনেতা যেমনি হোক, সার্থক এবং সুপরিকল্পিত প্রযোজনায় যে কোন নাটককে দর্শকের সামনে তুলে ধরা চলে। চিচেস্টার থিয়েটার প্রমাণ করল যে নাট্য প্রযোজনার অগ্রগতিতে খোলা মঞ্চরীতি কেবল আধুনিকতম নয়, সব থেকে সার্থকতম ব্যবস্থা। মনের মধ্যে গভীরতম দাগ কাটতে হলে প্রযোজনা ও অভিনয়ের গুণে নাটকের বক্তব্যকে দর্শক মনে গেঁথে দিতে হবে। খোলা মঞ্চ, দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের সব ব্যবধান দূর করে দেয়, যার ফলে দর্শক, অভিনেতা এবং নাটক অতি সহজে একাত্ম হতে পারে। প্রমাণ করে আলোর প্রয়োজন, মঞ্চ পরিকল্পনার প্রয়োজন নাটককে দর্শকদের মনে স্থাপনা করবার জন্যে। তার আতিশয্য নাটকের প্রকাশকে ব্যাহত করবে।

৩০শে জুলাই ১৯৬২ আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিঃসংকোচে স্বীকার করতে পারি যে আঙ্কল ভানায়ার মতন নাট্যপ্রযোজনা কখনো দেখিনি, দেখব বলেও আশা করি না। চিচেষ্টারের ঠাণ্ডা বাতাসবহা রাত্রে যখন পথে এসে নামলাম তখন লোকের সঙ্গ ভাল লাগছিল না। ভানায়ার নিঃসঙ্গতাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার জন্যে অন্ধকারের মধ্যে ষ্টেশনের দিকে পা চালিয়ে দিলাম।

'অ্যাবসার্ড' নাটক কি ও কেন?

গত দশ বছরে ইউরোপের নাট্য জগতে নূতন ধরনের নাটক লেখার উৎসাহ কায়েম হয়েছে। আধুনিক জীবনযাত্রা, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং ব্যবহারিক আঙ্গিকের উন্নতি (practical technicalities) এই নূতন ধরনের নাটকের সৃষ্টিতে নাট্যকারদের উৎসাহিত করেছে। একদিকে যেমন আমরা মননশীল নাটক পেয়েছি, স্বাভাবিক নাটকের অপূর্ব প্রয়োগনৈপুণ্য দেখেছি, অন্যদিকে তেমনি এমন কতকগুলি নাটক আমাদের সামনে এসেছে, যা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব, আজগুবি আর আবোলতাবোল। এই নাটক এবং নাটিকাগুলিতে স্বাভাবিকতাকে বিভিন্নভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। যেখানে ঘটনার মধ্যে চিরাচরিত ধারাকে পাই সেখানে বক্তব্য এক উদ্ভট সঙ্কেত করে, আবার কখন অসম্ভব ঘটনার মাধ্যমে নাট্যকারের স্বাভাবিক বক্তব্য ভেসে আসে। কিন্তু সব সময় এই ধরনের নাটক পড়ে আমরা কিছু আহরণ করতে পারি একথা বললে কিন্তু সত্যের অপলাপ করা হবে। অধিকাংশ সময়ে এই ধরনের নাটক পাঠ করে আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। গানের স্বরলিপি যেমন সুররসিকের কাছে সুরসমৃদ্ধ তেমনি চিন্তাশীল প্রযোজকধর্মী পাঠকের কাছেই এই নাটক বোধ্য। বলা বাহুল্য যে, যেমন বাংলা গানের স্বরলিপি ইংরেজ বা জার্মান সুরস্রষ্ঠার কাছে অনধিগম্য তেমনি এই শ্রেণীর নাটক সকল শ্রেণীর প্রযোজকধর্মী পাঠকেরও সর্বদা বোধগম্য নয়। কারণ এই নূতন নাটকগুলিতে কখন ঘটনা, কখন বক্তব্য, কখন মননশীলতা, কখন শ্লেষ ও ব্যঙ্গ ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু নাটক কোন্ ধর্মের তা অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। অনেকটা পিকাসো প্রবর্তিত আধুনিক ছবির সঙ্গে মিল আছে এই নাটক-চরিত্রের। দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে নাটকের ব্যাখ্যা চলতে পারে। এই বিভিন্ন ব্যাখ্যা কেবল প্রযোজকের নয় দর্শকেরও হতে পারে। একটু বিশদভাবে বলা যাক। বিভিন্ন প্রযোজকের হাতে এই নাটকগুলি বিভিন্নতর ভাবে প্রযোজিত হতে পারে। নাট্যকারকে তাই সর্বদা প্রযোজকের সঙ্গে থেকে নাট্য প্রযোজনায় উপদেশ দিতে হয় যাতে তাঁর ইচ্ছিত বক্তব্য দর্শকের সামনে প্রকাশিত হয়। ইদানীং কালে ইউরোপ আমেরিকার একাধিক নাট্যকার নিজেরাই নিজেদের নাটক প্রযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ নাটকে নাট্যকার তাঁর বক্তব্য বোঝার চাবিটিকে

নাটকের মধ্যেই সন্নিবেশিত করেন এবং এই চাবিটা পাওয়া গেলে নাটক বোঝা বা তার প্রযোজনা সহজসাধ্য হয়। নাটক প্রযোজিত হবার পরও বিভিন্ন দর্শকের কাছে একই নাটকের নানারকম ব্যাখ্যা হতে পারে। এই ধরনের নাটকের কেবল কয়েকটি ঘটনা বা কখন একই ঘটনার পৌনপোনিকতা থাকে। এর ফলে চিরকালীন, চিরাচরিত বা চিরায়মান কোনো আবেদন নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন দর্শক তাঁর চিন্তাবুদ্ধি, বিবেচনা, শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা এবং ভৌগোলিক অবস্থিতি ও জাতিগত অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী সেই নাটকের ব্যাখ্যা করেন। আগে নাটকের পাঠককে নাটক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক হতে হত, এই নয়া ধরনের নাটকের পাঠককে হতে হল প্রযোজক। এই শ্রেণীর নাটকের সঙ্গে অন্য নাটকের এখানেই সব থেকে বড় তফাৎ সূচিত হচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক আলবের ক্যামু এই প্রযোজকধর্মী উচ্চরাশিতে জাত নাটকের নাম করণ করেছেন 'absurd plays' বা উদ্ভট নাটক। তদবধি সেই নামই এই ধরনের নাটকের নামাবলি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকাল নূতন কোন নাট্যকার কোনরূপ ভিন্ন আঙ্গিকে নাটক রচনা করলেই তাঁকে অ্যাবসার্ড নাট্যকার আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। বহু নাট্যকারই নিজেদের নামের সামনে ওই বিশেষণটিকে অস্বীকার করেছেন এবং স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তাঁদের নাটক অ্যাবসার্ড নয়। এদিকে অ্যাবসার্ড নাট্যকার নাম স্বীকার করেছেন এমন একাধিক নাট্যকার সমালোচকদের মতে ওই পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য নন। সুতরাং কে অ্যাবসার্ড নাট্যকার আর কে নন এ নিয়ে বিশেষ গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। গণ্ডগোলটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে যখন দেখি একই নাট্যকারের বিভিন্ন নাটকের কয়েকটি অ্যাবসার্ড বলে স্বীকৃত হয়েছে, অন্যগুলি হয় নি। এ ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অ্যাবসার্ড নাটক লিখিয়ে কোনো নাট্যকার চিরকাল বা সারাজীবন ধরে একই জাতের নাটক সৃষ্টি করে যাবেন এটা তাঁর ইচ্ছাবিরুদ্ধ হতে পারে। সামাজিক নাটক লিখিয়ে নাট্যকার মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক অথবা ব্যঙ্গাত্মক কোনো নাটক লিখলে আমরা আশ্চর্য হই না! সুতরাং অ্যাবসার্ড নাট্যকার স্বাভাবিক সামাজিক নাটক সৃষ্টি করতে চাইলেও অবাক হবার কোনো কারণ দেখি না। অর্থাৎ আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, অ্যাবসার্ড নাটক আছে বটে কিন্তু অ্যাবসার্ড নাট্যকার বলে কোনো বস্তু নাই, কখন ছিল না বা থাকবে না। নাট্যপ্রগতির ধারা বয়ে অ্যাবসার্ড নাটক এসেছে সুতরাং

অ্যাবসার্ড নাটক আছে এবং থাকবে, তার রূপ, প্রকাশ, রীতিনীতি যুগের সঙ্গে বিবর্তিত হবে। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটক রচয়িতাদের গায়ে ছাপ মেরে একটা খোপের মধ্যে পুরে দেওয়া বা তাঁদের একটা বিশেষ বেড়ার পেছনে আটকে রেখে দেওয়া শুধু অসামাজিক ব্যবস্থা নয়, অস্বাভাবিক এবং অপ্রকৃত।

এবার অ্যাবসার্ড নাটক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত মনে আলোচনা করা যেতে পারে। এই সব নাটকের নাট্যকাররা প্রসঙ্গত আলোচিত হবেন কিন্তু নাট্যকারকে কেন্দ্র করে নাট্যপ্রসঙ্গে যাবার প্রয়োজন থাকবে না। অ্যাবসার্ড নাটক আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই গুটিকতক স্থির সিদ্ধান্ত করতে হবে। সবার আগে মনে রাখা দরকার যে, অ্যাবসার্ড নাটক একটি অনড় ব্যবস্থা নয়। থিয়োরীর দড়ি দিয়ে এই ধরনের নাটককে বাঁধবার চেষ্টা করতে গেলে সেই ভুলই করা হবে যে ভুল দৈত্যপতি রাবণ হনুমানকে বাঁধবার চেষ্টা করতে গিয়ে করেছিলেন। যে ভুল অসুরপতি বলি করেছিলেন বামনাবতারকে ত্রিপাদ ভূমি দিতে গিয়ে। প্রসঙ্গত এই দুটি উদাহরণ ভারতীয় জীবনে অ্যাবসার্ডের প্রভাবকে প্রমাণিত করে। এ পর্যন্ত যত অ্যাবসার্ড নাটক বিদেশে রচিত হয়েছে সেগুলির যত রূপ তত ভঙ্গি। সেগুলির স্তরবিভাগ করতে গেলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি নাটকের রচনাপদ্ধতি, শৈলী বা প্রকাশ ভঙ্গিমা ভিন্ন। দেশগতভাবে একটা মোটামুটি বিভাগ সম্ভব কিন্তু সেখানেও অনড় গণ্ডী টানবার চেষ্টা করলে বিভ্রমে পড়তে হবে। অ্যাবসার্ড নাটক বলতে আমরা সেই নাটক বুঝব যা বক্তব্যে বা প্রকাশ-ভঙ্গিমায় বা রচনা-শৈলীতে স্বাভাবিক নাটকের নিয়মকানুন অস্বীকার করে। বিদেশী সমালোচকের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি ,surface realityকে ভেঙ্গে দেওয়াই অ্যাবসার্ড নাটকের প্রধান পরিচয়। আপাত দৃষ্টিতে যা অসম্ভব বা অপ্রকৃত অ্যাবসার্ড নাটকের যুক্তিজালে তার মধ্যে থেকেই প্রকাশিত হয়েছে একান্ত স্বাভাবিক মনুষ্যবৃত্তি। বরঞ্চ বলা চলতে পারে যে, প্রচলিত নাট্যসৃষ্টির ধারাকে অস্বীকার করা হয় বলেই তাদের উদ্ভট বা অসম্ভব বা অ্যাবসার্ড নাটক বলতে হয়েছে। গত কয়েক শতাব্দীর নাট্যদর্শন, নাট্যপ্রকাশ প্রকরণ এবং নাট্য-ব্যাকরণে ধরা যায় না বলেই সম্ভবতঃ আলবের ক্যামু এই ধরনের নাটকের নামকরণ করেছিলেন অ্যাবসার্ড। তাঁর চোখের সামনে ছিল প্রকাশ ভঙ্গিমায় অচ্যুত ফরাসী অ্যাবসার্ড নাটক। সেজন্য সমস্ত পৃথিবীর অ্যাবসাড নাটক বিচার করবার সময় তাঁর এই নামকরণ অনেক সময়েই ভুলের স্বর্গ সৃষ্টি করার সহায়ক হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এতক্ষণ যাঁরা এই প্রবন্ধ পড়েছেন তাঁদের মনে নিশ্চয়ই এই ধারণাই হয়েছে যে, অ্যাবসার্ড নাটক অতি আধুনিক নাট্য ফ্যাসান। কিন্তু মোটেই তা নয়। সুররিয়ালিস্ট এবং সাংকেতিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও পূজাপ্রকরণ থেকে যখন প্রথম নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল তখন নাটকের মধ্যেকার সুররিয়ালিজম্ ও সাংকেতিক ঘটনার প্রাচুর্য স্বভাবতঃই বেশি ছিল। বলাবাহুল্য, আমি মিশরের প্রথম ইসিস-ওসিরিসের নাটকের কথা বলছি। কালক্রমে একদিকে যেমন সহজবোধ্য নাটকসৃষ্টির দিকে জোর পড়ল, অন্যদিকে গল্প ইতিহাস ও ঐশ্বরিক দেবদেবীকে নিয়ে এই সব নাটক সৃষ্টি হতে থাকল। কিন্তু সাংকেতিক নাটক সৃষ্ট বন্ধ হল না। এই সূত্রের ধারা বয়ে এলেন হাসির নাটক রচয়িতারা। তাঁরা অতিভাষণের ঢঙে নাটক উপস্থাপন করতেন। তাই দেখা গেল ভীষণ পেটুক, ভয়ানক কামুক, প্রচণ্ড রাগী ইত্যাদি চরিত্র। নিছক হাস্যরসের জন্যেই এই চরিত্রগুলির বা নাটকগুলির উৎপত্তি। এদের মধ্যে একমাত্র মিল অতিভাষণ, অতিরঞ্জন এবং অসম্ভাব্যতা। তাই নাট্যকার অ্যারিস্টোফেনিস ৪২৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তাঁর 'মেঘদল' নাটকে দেখালেন যে, সক্রেটিস স্নানের টবে বসে ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলে রয়েছেন। ওখানে বসে কি করছেন জানতে চাইলে তার যে জবাব তা একাধারে হাস্যোদ্দীপক এবং আজকাল যাকে অ্যাবসার্ড নাট্যভাষা বলা হয় তার অনুগামী। সক্রেটিসকে বলানো হয়েছে (ইংরেজি অনুবাদ)—'I have to suspend my brain and mingle the subtle essence of my mind with this air, which is of the like nature, in order to clearly penetrate the things of heaven. I should have discovered nothing had I remained on the ground to consider from below the things that are above; for the earth by its force attracts the sap of mind to itself. 'Tis just the same with water-cress'. অ্যারিস্টোফেনিসের ক্ষুরধার কলম কাউকে রেহাই দেয় নি, সোন না তিনি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক ক্লিওন কিংবা ক্লিওনের বন্ধু নাট্যকার ইউরিপাইডিস। সমসাময়িক নাট্যকারকে হাস্যাস্পদ করে তাঁর নাটক 'এ্যাকারানিয়ানস্' ৪২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রচিত। সংলাপ পড়লে আধুনিক অ্যাবসার্ড নাটক মনে হবে। বাংলা অনুবাদ—

ভৃত্য — কে ওখানে।

ডিকাওপলিস — ওহে, ইউরিপাইডিস বাড়িতে আছে।

ভৃত্য — আছেন ও আবার নাইও।

ডিকাওপলিস — ওটা আবার কেমন কথা, আছেনও আবার নাইও।

ভৃত্য — সত্যি কথা বলছি মশায়। কত্তার মন এখন নানা রংএর অপরূপ ঘটনার চয়ন করতে হাটেমাঠেঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছে। ওঁর দেহটা অবশ্য বাড়িতেই আছে। মাচানের ওপর ঝুঁকে বসে কত্তা বিয়োগান্ত নাটক সৃষ্টি করছেন।

ডিকাওপলিস — ওহে ইউরিপাইডিস, তোমার চাকরটা বড় চমৎকার কথাবার্তা বলে হে। তুমি সত্যি ভাগ্যবান। যাও বাছা এবার তোমার কর্তাকে ডেকে আন।

ভৃত্য — অসম্ভব (প্রস্থান)

ডিকাওপলিস — এতো বড় বিশ্রী কাণ্ড হল। কিন্তু আমি অত সহজে হতাশ হব না। দরজার কড়া নাড়া যাক। ইউরি-পাইডিস, ওহে আমার ছোট্ট ইউরিপাইডিস; আমার প্রাণের ইউরিপাইডিস, দয়া করে শোনো, কলিডিয়ান দশকের ডিকাওপলিস তোমায় ডাকছি। আর কোনো লোক আমার থেকে বেশি তোমার অনুগ্রহ পাবার উপযোগী নয়। ওহে শুনছ।

ইউরিপাইডিস (ভেতর থেকে)—আমার নষ্ট করার মতো সময় নাই।

ডিকাওপলিস — বেশ ভালো কথা। চাকায় চাপিয়ে কেউ তোমায় ঠেলে আনুক।

ইউরিপাইডিস — অসম্ভব।

ডিকাওপলিস — তা হলেও—

ইউরিপাইডিস — বেশ। ওদের বল চক্রযানে চাপিয়ে আমায় ঠেলে নিয়ে যাক। নীচে নামবার আমার সময় নাই। আমি ভাবছি।

অ্যারিস্টোফেনিসের নাটকগুলি অসম্ভাব্যতার রত্নখনি বিশেষ। ঘটনার অসম্ভাব্যতা, চরিত্রের এবং সংলাপের অসম্ভাব্যতায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু তবু তাঁকে অ্যাবসার্ড নাটকের জনক বলে স্বীকার করা যায় না। কারণ অ্যারিস্টোফেনিসের নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ, শ্লেষ এবং তীক্ষ্ণ সমালো-

চনা এবং অস্ত্র হল জনসাধারণের হাসি। এই নাটকগুলির অভিনয়ে দর্শকের উচ্চরোল হাসির মধ্যে অপদস্থ হতেন এথেন্সের উন্মার্গগামীরা।

সেক্সপীয়রের যুগে আবার নাটকের মধ্যে অসম্ভাব্যতা দেখা যায় নবরূপে। মার্লো তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি ডক্টর ফস্টাস নাটকে অসম্ভবকে ব্যবহার করলেন গম্ভীর ট্র্যাজেডী সৃষ্টির কাজে। ডক্টর ফস্টাস পার্থিব আনন্দের বিনিময়ে নিজের আত্মাকে বিক্রী করে দিলেন কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, যিনি ট্রয়ের পতনের কারণ, প্যারিসপ্রেমী এবং রাজা অ্যাগামেমননের স্ত্রী, সেই হেলেনকে পেয়েও তিনি তৃপ্ত হলেন না। বলা বাহুল্য যে শয়তান, ডক্টর ফস্টাসের জন্য হেলেনের আত্মাকে রূপপরিগ্রহ করিয়ে এনেছিল। এই আবহাওয়া প্রচলিত থাকাতে আমরা সেক্সপীয়রের নাটকে প্রায়ই ভৌতিক ঘটনা দেখি। প্রেতাত্মা ও ভৌতিক ঘটনা মহাকবি সেক্সপীয়রের নাটকের যে সহজ সমাধান এনে দিয়েছে, কয়েকটি উদাহরণ দিলেই তা প্রমাণিত হবে। হ্যামলেটের পিতার ভূত, জুলিয়াস সীজারের প্রেতাত্মা এবং শেষ যুদ্ধের প্রাক্কালে তৃতীয় রিচার্ডের হাতে নিহত তাঁর আত্মীয়স্বজনের অশরীরী কণ্ঠস্বর এই তিন নাটককে বিশেষ প্রভাবান্বিত করেছে।

পরবর্তী যুগে উদ্ভট কল্পনা আবার হাস্যরসের বাহন হল। ফরাসী দেশে মলেয়ার, ইংল্যাণ্ডে জনসন (ভোল্পন নাটক) ও শেরিডন (স্কুল অফ স্ক্যাণ্ডাল) তাঁদের নাটকে অসম্ভব ঘটনার মাধ্যমে সমসাময়িক সামাজিক ব্যাধি ও ভণ্ডামীকে কি নিদারুণ আঘাত হেনেছিলেন তা নাট্যপ্রিয়দের অজানা নয়। সে ইতিহাসের পুরা পুনরুক্তি করে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন দেখি না।

মনে রাখা দরকার যে, এ পর্যন্ত নাটকের মধ্যে অসম্ভাব্যতা আনা হয়েছে গল্পের প্রয়োজনে। কখনই নাটকের মধ্যেকার স্বাভাবিকতা বা নাট্যনিয়মের ব্যতিক্রম করা হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম ব্যতিক্রমের মুখোমুখি হতে হয়। স্ট্রীণ্ডবার্গের দুখানি নাটক—'স্পুকসোনাটা' আর 'ড্রিম প্লে' (ভুতুড়ে গান আর স্বপ্ন নাটক) সর্বপ্রথম নাট্যনিয়মকে অস্বীকার করল। সংলাপ-মাধ্যমে গল্পের জায়গায় দেখা গেল চিন্তা। নাট্যকার স্বয়ং এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন বলেই নামকরণে পাঠককে সাবধান করে দিয়েছেন। পরিণত বয়সে ইবসেনকেও এই নাট্যধারা অনুসরণ করতে দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। 'ব্র্যাণ্ড' নাটকের শেষ অঙ্ক সাদা বরফের পাহাড়ে ব্র্যাণ্ডের গীর্জাস্থাপনের ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম। নাটকের সাধারণ গতি থেকে সরে এসে ইবসেন স্বর্গীয়

আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নাটকের ছেদ টেনেছেন। বস্তুতঃ এই আধ্যাত্মিকতা ইবসেনের 'দি লেডী ফ্রম দি সী'র মধ্যেও দেখা যায়, যদিও তার প্রকটতা 'ব্র্যাণ্ড' নাটকের শেষ অঙ্কের মতো নয়।

যদি আমরা স্ট্রীণ্ডবার্গ এবং ইবসেনকে আধুনিক অ্যাবসার্ড নাটকের প্রাথমিক প্রবক্তা বলে স্বীকার করি তা হলে দেখা যাবে যে, স্বাভাবিক ধারা বয়েই গভীরতম জীবনসত্যের আলোয় আলোকিত, আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট এবং পারম্পর্যহীন কিন্তু ক্ষুরধার যুক্তিজালে আচ্ছন্ন প্রথম সার্থক অ্যাবসার্ড নাটকের উদ্ভব ক্রমবিবর্তনবাদের ধারাতেই উৎপন্ন হয়েছে। উৎপত্তি হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গীতিনাট্য, সরল সংগীতালেখ্য এবং স্বাভাবিক নাটকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্যে। নাট্যাদর্শের যে ধারা নাটককে কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল, যে নাট্যব্যাকরণ সাধারণ নাটকের মধ্যে ক্লৈব্য এনে তাকে গৃহপালিত পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বনি চিন্তাজগতের স্বাভাবিক গতি। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো নাটকের জগতে শৃঙ্খলভাঙ্গার গান শোনা গেল। সমস্ত জগৎ সবিস্ময়ে এই নয়া জমানার প্রকাশকে লক্ষ্য করল।

চিন্তার জগতে ফরাসী দেশ চিরকাল পৃথিবীর নেতৃত্ব করেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালফ্রেড জ্যারী রচনা করলেন 'উবু রোয়া' (রাজা উবু) নাটক। আধুনিক অ্যাবসার্ড নাটকের যুগ সেদিন থেকেই শুরু হল বলা চলে। প্রকাশিত হওয়া মাত্র রাজকীয় দৃষ্টি রাজা উবুকে স্পর্শ করল। ফরাসী সরকার মনে করলেন এই নাটকে ফরাসী রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিকে সমালোচনা করা হয়েছে। আরো অভিযোগ হল রাজ-পুরুষদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে, বন্ধু রাষ্ট্র পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাজা উবু বাজেয়াপ্ত হল এবং নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হল। পরবর্তী যুগে যখন সুররিয়ালিস্ট নাটকের প্লাবন এল—তখন সুররিয়ালিস্ট নাটকের রচয়িতারা রাজা উবুকেই প্রথম সুররিয়ালিষ্ট নাটক বলে স্বীকৃতি দিলেন। রাজা উবু লোকের মুখে মুখে 'বাবা উবু' নামে খ্যাতি লাভ করল।

ফরাসী দেশে নতুন ধরনের নাটক লেখার বন্যা এল। অ্যাবসার্ড নাটক নামাবলী তখনও আবিষ্কৃত হয় নি তাই সুররিয়ালিস্ট অঙ্কনশিল্প থেকে নাম ধার করে এই শ্রেণীর নামকরণ হল সুররিয়ালিস্ট নাটক। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি অ্যাপোলিনেয়ার রচনা করলেন 'ব্রেস্টস অফ টাইরেসিয়াস' (তাইরে-

সিয়ার বক্ষযুগল), শিল্পী কবি ককটো ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করলেন 'আইফেল-টাওয়ারে বিবাহ', নাট্যকার স্যালাক্রো ১৯২২-এ লিখলেন 'সার্কাসের গল্প', ট্রিস্টান জারা 'গ্যাসের হৃদয়', রেনে দৌমল 'একটি গ্রগ্রগ্রদে' ইত্যাদি। এই যুগের ধারা বয়েই অ্যানটোনিন আর্ত্যদের আবির্ভাব হল। তাঁর ১৯২৫এ লেখা 'রক্ততরঙ্গ' কেবল এক নূতন পথের ইঙ্গিত দিল না, নাটকের মধ্যে হিংসা দ্বেষ হানাহানি রক্তপাতকে একটা কায়েমী আসন দিল। আধুনিক নাট্যকারদের ওপর আর্ত্যদের প্রভাব অত্যন্ত গভীর হলেও আজকের প্রবন্ধে তা আলোচনার বস্তু নয়। আশ্চর্য হয়ে যাই যখন দেখি বিখ্যাত আধুনিক নাট্যকার অনুইল, সুররিয়ালিস্ট নাটক লিখেই প্রথম খ্যাতির আসন পান। 'বোবা হিউমুলাস' তাঁর লেখা ১৯২৯-এর নাটক।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই নাটকের জগতে নূতনত্বের হাওয়া বয়েছে। প্রযোজনা পদ্ধতিতে আমূল সংস্কার সাধন হয়েছে। মেটারলিঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন Neo-Romanticism প্রসারিত হয়েছে অন্যদিকে ওয়াইল্ড, পিরানদেল্লো প্রভৃতি নাট্যকার স্বাভাবিকতাবাদ বা Naturalismএর ধ্বজাকে তুলে ধরেছেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে বার্ণাড শ'র বুদ্ধিদীপ্ত নাটক, তীক্ষ্ণ সংলাপ এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা নাট্যজগতের একছত্র অধিপতির সম্মানে তাঁকে ভূষিত করল। বারটোল্ট ব্রেখট আনলেন অতি বাস্তবতা, আমেরিকা থেকে ইউজিন ওনীলের মধ্যে প্রতিভাত হল দুরাশাবাদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বিশ্বময় ঘোষণা করল নাটক একদিকে যেমন অবসর বিনোদনের উপায় অন্যদিকে তেমনি চিন্তাশীলদের হাতিয়ার। হিটলার জার্মানিতে নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। যুদ্ধের শেষে তাই যখন দেখি ফরাসী মনীষী জঁাপল সার্ত্র তাঁর Existentialism বা অস্তিত্ববাদ নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করছেন তখন অবাক হই না। শতাব্দীর সাধনায় নাটক মননশীলতার শেষ ধাপে উপনীত হয়েছে। সার্ত্রের বাণীর প্রতিধ্বনি উঠল দেশেবিদেশে Romanticism আর Naturalism-এর দুইধারা এসে মিশল আণবিকযুগের মানুষের হৃদয়গ্রন্থিতে। প্রায় হিরোশিমার আণবিক বোমার মতোই মৃত্যুভীত বুদ্ধিজীবী মানব গর্জে উঠল 'আমি আছি', 'আমি বাঁচব'।

চিন্তা জগতের এই প্রচণ্ড আলোড়ন প্রকাশ পেতে দেরি হল না। শিল্পী পিকাসো ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে একটি নাটক লিখেছিলেন Desire caught by the Tail, কামনাকে ল্যাজে ধরা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে সার্ত্র, ক্যামু প্রভৃতি নাট্য-

কারগণ এই নাটকের অভিনয় করলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের বদ্ধ বন্ধ্যা শিল্পীজগতের ছাড়পত্র পেল। নানারূপে নানাভাবে অসম্ভাব্যতা এবং উদ্ভট চিন্তা নাটকের মধ্যে দেখা যেতে লাগল। শিল্পী সাহিত্যিক গোষ্ঠী এই নবধারাকে বরণ করে নিলেন। ইউজঁ অনুইল স্বাগত জানালেন, ককটো আশ্রীর্বাদ করলেন আর ক্যামু এই নব-অন্নপ্রাশনের শেষে নামকরণ করলেন 'অ্যাবসার্ড নাটক'।

ফরাসী দেশে নাট্যকার ইউজঁ ইউনেসকোর একটি একাঙ্কিকা ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু ১৯৫১ সালের আগে 'দি লেসন' (শিক্ষা) নাটিকাটি মঞ্চস্থ করা যায় নি। এই অভিনয় প্রসঙ্গে ইউনেসকার পত্রগুচ্ছ অ্যাবসার্ড নাটকের ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৯৫১-তে তিনি লিখলেন—'মহানন্দে আমার নাটক চলছে। দৈনিক দর্শক সংখ্যা চার—আমি, আমার স্ত্রী আর দরজার দরোয়ান নিয়মিত, চতুর্থ অনিয়মিত দর্শককে ওই দ্বাররক্ষকই ধরে আনেন—যদিও তারা প্রায়ই নাটক শেষ হবার আগেই উঠে পালিয়ে যায়।' তিন বছর পর ইউনেসেকা লিখলেন—'জুন, ১৯৫৪। আজকাল কিছু একটা ঘটেছে। আমি পর্যন্ত বসবার একটা খালি আসন পাই না। দরোয়ান বেচারার কথা বাদ দাও।' এইভাবে অ্যাবসার্ড নাটক নাট্য-সাহিত্যে তার স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। বিবর্তনবাদের ধারাতেই তাদের উৎপত্তি ও প্রসার এবং সেই ধারা অবলম্বন করেই তার ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি এবং সঞ্চরণ।

প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, অন্যতম মূল প্রকৃতিগত তফাৎ অ্যাবসার্ড নাটকের সঙ্গে অন্যান্য নাটকের বিভিন্নতা সৃষ্টি করছে। অসম্ভব বা উদ্ভটের যোগাযোগ surface realityকে অস্বীকার করছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ইউনেসকোর এক নাটকের পাত্রপাত্রীর পথে দেখা হয়েছে। দুজনাই দুজনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করে নাম জেনে অবাক হয়ে বলছেন—আমারও ওই নাম। থাকেন কোথায় জেনে বলছেন—আমিও তো ওখানেই থাকি। বাড়ির নম্বর রাস্তার নম্বর ঘরের হিসাবে মিলিয়ে দেখছেন তাঁরা একই ঘরে বসবাস করেন অর্থাৎ তাঁরা স্বামী স্ত্রী। ইউনেসকোর উদ্ভট যুক্তিজালে আচ্ছন্ন বক্তব্য এই যে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাছে এতটা অপরিচিত হতে পারেন যে, হঠাৎ আলাপে আকৃষ্ট হওয়াও অসম্ভব নয়। ইউনেসকো নাটকটির মধ্যে ব্যঙ্গ শ্লেষ ও হাসির আবহাওয়ায় যে নাটক রচনা করেছেন অগাষ্ট স্ট্রীণ্ডবার্গ তাঁর 'মৃত্যুনৃত্য' নাটকে

সেই বক্তব্য ভিত্তি করে দুই খণ্ডে বিরাট ও প্রচণ্ড এক ট্র্যাজেডীর অবতারণা করেছেন। কিন্তু স্ট্রীণ্ডবার্গ লিখেছেন 'সে'জা নাটক,' ইউনেসকো রচনা করেছেন অ্যাবসার্ড।

বলা বাহুল্য এটা অত্যন্ত সহজ উদাহরণ—অ্যাবসার্ডের সব উদাহরণ এত সহজেবোধ্য মনে করলে ভুল করা হবে। স্যমুয়েল বেকেটের বিখ্যাত নাটকদ্বয় 'ওয়েটিং ফর গডো' এবং 'শেষ খেলা' (End game)র কথা সবাই জানেন। প্রথম নাটকের ভবঘুরে দুজন কার জন্যে অপেক্ষা করে হতাশ হলেন তা নিয়ে ইতিমধ্যে তীব্র বাদানুবাদ চলেছে। শেষ নাটকের অন্ধ নায়কের বাবা ও মা কেন ডাস্টবিনে বন্ধ থাকেন এবং তার তাৎপর্য কি, তা নিয়েও বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। পিকাসোর নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র কারু পায়ের বুড়ো আঙুল এবং সহচরিত্র বা নায়িকা পেঁয়াজের খোসা। জাঁ জেনের 'ব্ল্যাক্‌স্‌' নাটকে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের প্রতিহিংসাপরায়ণতাকে এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে বিষয় বোঝা সোজা নয়। হ্যারল্ড পিণ্টারের নাটক বার্থডে পার্টি আপাত দৃষ্টিতে খুবই সরল। নাটকের নায়ক সমুদ্রের ধারে এক বৃদ্ধার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে মনে হয়। বৃদ্ধা তাকে স্নেহ ভালোবাসায় বেঁধে রাখতে চায়। বৃদ্ধার স্বামী এই সোহাগ সহ্য করতে না পারলেও এই যুবককে অপছন্দ করে না। তারপর একলা বাড়িতে আসে দুজন সহরের লোক। তারা নায়কের খোঁজেই এসেছে মনে হয় কখন কখন। তাদের অভিযোগের বাক্যবানে যুবক যখন জর্জরিত তখন বৃদ্ধা ফিরে আসে। আলাপ-পরিচয়ের পর্ব শেষ করে শুরু হয় জন্মদিনের উৎসব কারণ বৃদ্ধা আবিষ্কার করেছেন ছেলেটার সেইদিনই জন্মদিন। তারপর এক তাণ্ডব শুরু হয়। সহুরে লোক দুটি যুবককে মানসিক রোগীর মতো চিন্তাশক্তিহীন এক জড়পদার্থে পরিণত করে তাকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। সহজ নাট্যনিয়মের মাধ্যমে এক অসম্ভব ও অবাস্তব নাটক সৃষ্টি করা হয়েছে। অভিনয় দেখে কিছু বোঝা গেলেও নাটক পাঠে বক্তব্য অত্যন্ত দুরূহ মনে হয়। প্রচুর উদাহরণ দেওয়া চলে। ইউনেস্কোর 'লেসন' (শিক্ষা) বা 'বল্ড প্রাইমাডোনা' (নেড়া প্রধান স্ত্রী নাচিয়ে)। সিম্পসন অনড় পদার্থকে তাঁর নাটকে কথা বলিয়ে ছেড়েছেন। ওজন করার যন্ত্রগুলি গান গায়, যন্ত্রসংগীতের সুর তোলে।

দেশগতভাবে অ্যাবসার্ড নাটককে ভাগ করা সম্ভব। কিন্তু এই ভাগকে অনড বা স্থায়ী ব্যবস্থা মনে করা অন্যায় হবে। ফরাসী অ্যাবসার্ড নাটকে রাজনৈতিক মতবাদ এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আমরা

প্রায়ই দেখতে পাই। ইংরেজী অ্যাবসার্ড নাটক প্রায়ই নাট্য আঙ্গিকের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। ইংরেজ মন সামাজিক জীবনযাত্রার রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসে এবং দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ কষ্ট ও বৈশাদৃশকে নাটকেপ্রকাশ করে। ইদানীং কালে 'মারাট সাদ ও ইউ এস' বা 'আস' নাটকে চরমপন্থী রাজনৈতিক চিন্তা এমনকি ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে তীব্র মতবাদের প্রকাশ দেখা গেছে। আমেরিকায় অ্যাবসার্ড নাটক বলে সত্যি কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না। সাধারণতঃ এডোয়ার্ড অ্যালবি এবং কোপিটের কিছু নাটক অ্যাবসার্ড পর্য্যায়ে ফেলা হয়। অ্যান জেলিকোর একটি নাটকের নাম বাংলা গান থেকে নেওয়া 'আমার পাগল মায়ের খেলা' (Sport of my mad mother)। এই নাটকনাটিকাগুলিকে অ্যাবসার্ড বলে স্বীকার করলে বলতে হবে যে, কাম ও ভালোবাসা আমেরিকান অ্যাবসার্ড নাটকের মূল চরিত্র।

প্রশ্ন হতে পারে যে, অ্যাবসার্ড নাটকের প্রয়োজন কি। এই নাটক প্রয়োজনের তাগিদে আসে নাই—যুগের গতিতেই প্রকাশিত হয়েছে। অ্যাবসার্ড নাটকের মধ্যে নানা দোষ আছে, তার মধ্যে দুর্বোধ্যতা ও স্বাতন্ত্র্য-বাদ দুটি প্রধান দোষ কিন্তু আবার এই দুটিই এ নবধারার প্রধান গুণ। আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব ঘটনা বা চিন্তাজালে আচ্ছন্ন বলেই দর্শককে ভাবিয়ে তোলে। তাকে একাধারে যেমন সজাগ হয়ে নাটক দেখতে হয় তেমনি অভিনয় শেষ হবার পর ভাবতে হয়। কেউ কেউ হয়তো আলোচনার তরঙ্গ তোলেন—প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য অতি প্রকট ভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজ অ্যাবসার্ড নাটক বুদ্ধিজীবী নাট্যকারদের প্রধান অস্ত্র। তঁারা কেবল আনন্দপ্রিয় দর্শকদের নাট্যমন্দির থেকে বিতাড়িত করে চিন্তাশীল দর্শককে আহ্বান জানিয়েছেন তাই নয় প্রত্যেক চারুশিল্পের স্রষ্টিকারকদের নিয়মানু-যায়ী তাঁরা যুগের চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে আগামী যুগের পথপ্রদর্শন করেছেন। আর নাট্যরচনার ইতিহাসে এই প্রথম চিন্তাশীল নাট্যকারগণ তাঁদের দর্শকদের সঙ্গে আপোষ করে পেছিয়ে যান নি বরঞ্চ তাঁদের হাত শক্তভাবে ধরে তাঁদের নিজেদের জগতে—মননশীলতার জগতে উত্তরিত করেছেন। তাই অ্যাবসার্ড নাট্যরচনায় সেই সব দেশ বেশি অগ্রসর হয়েছেন যাদের নাটকের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের, চিন্তার জগতে শিল্পের জগতে যাদের দান শতাব্দীর সাধনায় অবিনশ্বর। অভিনয়ের সুযোগ ও সুবিধা, মান ও ধারা,

প্রভাব ও প্রতিপত্তি যে সব দেশে অত্যন্ত বেশি সেই সব দেশেই অ্যাবসার্ড নাটক রচনার আগ্রহ সারা জাগিয়েছে এটাই অ্যাবসার্ড নাটক সম্পর্কে আলোচনার প্রথম ও শেষ কথা।

সেকালে একালে অ্যাবসার্ড নাটক

বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে যেভাবে নূতন জিনিষের সৃষ্টি হয়, নাটকের সৃষ্টি সেভাবে হয়নি। মানব—ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে নাটকের সৃষ্টি এবং প্রসার হয়েছে। তার রূপ তাই যুগে যুগে যুগমানসকে প্রকাশ করেছে, তার রীতি দেশ ও কালের প্রভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন পথে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের জীবনের মতোই নাটকের একটা জীবন্ত সত্ত্বা আছে। সেই তাকে যেমন বিভিন্ন সঙ্কটের সম্মুখীন করে, তেমনি রূপান্তরিত হয়ে অবক্ষয় রোধ করে। মানুষ যেমন দেশেকালে পৃথক হলেও মানবতার বৃত্তি থেকে সরে যায়না, নাটকও তেমনি বিভিন্ন শৈলী এবং রীতির মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও তার নাটকত্ব থেকে দূরে যেতে পারে না। আরও এক বিষয়ে মানুষের সঙ্গে নাটকের মিল রয়েছে। মানুষ যেমন সৃষ্টির আদিকাল থেকে লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য স্নেহভালবাসা করুণা বাৎসল্য নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নাটকের মধ্যেও তেমনি বিভিন্নভাব, সংঘাত ও সঞ্চরণ সর্বদা বিরাজ করেছে। কেবল বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে প্রকাশের রীতিতে নূতনত্ব আনা হয়েছে মাত্র।

আজকে অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট নাটক নিয়ে আলোচনা করতে বসে একটা কথা সর্বাগ্রে মনে করিয়ে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে এই ধরণের নাটক নাটকীয় সংস্কার ভেতর থেকেই উঠে এসেছে। নূতন বা অদ্ভুত কোন বিসদৃশ ঘটনাকে এই ধরণের নাট্যপ্রচেষ্টা আনেনি। অ্যাবসার্ড নাটকের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস খুঁজতে গেলে তাই নাটকের আদিতে চলে যেতে হবে। এইস্কাইলাসের বারশ' বছর আগে প্রাচীন মিশরে দেবতা ওসিরিসের পূজা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে নাটক সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই নাটকের সুরু বলা চলতে পারে। এই অনুষ্ঠানকে নাটকের আদিম বা প্রথম রূপ বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে; সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নাটকের উন্মেষের মুহূর্তে তার রূপ ছিল অদ্ভুত এবং অসংলগ্ন। দীর্ঘ তিন হাজার বছর পরে মানুষের সভ্যতার বিবর্তন সেই ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে মাত্র। প্রাচীন মিশরে নাটক ছিল ধর্মের অনুষ্ঠান। বর্তমান জগতে আমাদের কাছে নাটক মানুষের আনুষ্ঠানিক জীবনের ছবি। ওসিরিসের অনুষ্ঠানটি ওসিরিস ও ইসিস এই দুই দেবতাকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হত। মিশরে পিরামিড পুস্তক এবং মেমফির নাটক থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসিস ও ওসিরিস একাধারে স্বামী-স্ত্রী এবং ভ্রাতা-ভগ্নি

ছিলেন। ক্ষমতালোভী শত্রুরা ওসিরিসকে বধ করলেন এবং তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে বিক্ষিপ্ত করলেন। খবর পেয়ে ইসিস ছুটে এলেন এবং মন্ত্রবলে ওসিরিসকে পুনরায় জীবিত করলেন। আধুনিক অ্যাবসার্ড নাটকের সঙ্গে এই প্রাচীন অনুষ্ঠানের আর এক দিক থেকে প্রচণ্ড মিল লক্ষণীয়। আধুনিক অ্যাবসার্ড নাটকের শতকরা নব্বইটির ভেতর প্রচণ্ড জিঘাংসাবৃত্তি এবং অপরকে আঘাত করবার ইচ্ছা দেখা গিয়েছে। ওসিরিসের এই নাটক সেদিক থেকেও আধুনিক যুগকে পথ দেখিয়েছে।

অ্যাবসার্ড নাটক কি তা নিয়ে আজও তর্কের অবসান হয়নি। মার্টিন এসলিন এই ধরণের নাটককে দুইভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে নাটকের ঘটনার যুক্তিহীনতা কিন্তু তার বক্তব্যের স্পষ্ট প্রকাশ এবং দ্বিতীয় ভাগে বক্তব্যের যুক্তিহীনতা কিন্তু ঘটনার সুসম প্রকাশ নাট্যকারের বক্তব্যকে প্রযোজনার মাধ্যমে স্পষ্ট করার গুরুদায়িত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথম ভাগের নাটকের উদাহরণ স্বরূপ স্যামুয়েল বেকেটের নাটকগুলির কথা আসতে পারে। ওয়েটিং ফর গোডোতে তিনি দেখিয়েছেন যে নানা অবান্তর এবং আপতদৃষ্টিতে যুক্তিহীন বাক্য বিন্যাস, ঘটনা ও সংলাপের ভেতর দিয়ে নাটকের বক্তব্যের গভীর প্রকাশ। যে সৌভাগ্যের জন্যে সকলে অপেক্ষা করছেন সেই সৌভাগ্য কখনই এল না। শুধু মাত্র খবর পাওয়া গেল যে, অপেক্ষা করে যেতে হবে, আশা করতে হবে। তাঁর এণ্ডগেম বা শেষ খেলায় তিনি দেখালেন চলচ্ছক্তিহীন নায়ক সম্পূর্ণভাবে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিহীন সহকারীর ওপর নির্ভরশীল, ঘরের বদ্ধতা থেকে তাঁর বাইরে যাবার উপায় নেই, নিজে বুদ্ধিমান হলেও হীনবুদ্ধিবৃত্তির সহকারীর চোখ দিয়ে তাঁকে পৃথিবীর সৌন্দর্যের কথা শুনতে হয়। ময়লাফেলা ডাষ্টবিনের ভেতর তাঁর বাপ মা বদ্ধ রয়েছেন, স্বার্থপরতায় নবশিশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় ভাগের নাটকের কথা বলতে গেলে প্রথমেই ইউজিন ইউনেস্কোর নাম করতে হয়। তাঁর 'গণ্ডার' নাটক অতি সুসম্বদ্ধ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলে। শুধু বক্তব্যের উদ্ভটতায় দেখা গেল যে, সমস্ত মানুষ গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে। তাঁর 'আমেদী' নাটক দীর্ঘবিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে লেখা। শুধু দেখা গেল একটি মৃতদেহ ক্রমান্বয়ে বিরাট আকার ধারণ করে তাঁদের মধ্যে শুধু ভেদ সৃষ্টি করল না, তাদেরকে চিরকালের জন্য নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করে ফেলল।

অ্যাবসার্ড নাটকের কোন আলোচনাই আলবের ক্যামুকে বাদ দিয়ে হতে পারেনা। বস্তুতঃ যদিও তিনি কখনও অ্যাবসার্ড নাটক লেখেননি, কিন্তু

আধুনিক অ্যাবসার্ড চিন্তাধারা ক্যামুর প্রজ্ঞাকে বাহন করে সঞ্চরণশীল হয়েছে। মানুষের প্রচলিত ভাবনাচিন্তা, জীবনধারণরীতি এবং মানবতাবোধের পরিপূর্ণ ধ্বংসস্তূপের ভেতর আধুনিক মানুষের জীবনধারণের চেষ্টা, তার মানবতা রক্ষার চেষ্টা, ক্যামুর রচনায় প্রথম ফুটে ওঠে ১৯৪২ সালে মিথ অফ সিসিফাসে। মানুষের সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিকের এই বিভেদ থেকেই অ্যাবসার্ড নাটকের সৃষ্টি এবং আজকের নাট্যজগতে আমরা নানাভাবে নানারূপে নানা ভাবধারার ভেতর দিয়ে এই চিন্তারই পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি।

গ্রীক নাট্যকার অ্যারিস্টোফেনিস তাঁর ব্যঙ্গাত্মক নাটকগুলির ভেতর দিয়ে এই অ্যাবসার্ডিটির প্রকাশকে প্রথম নাট্যরচনার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহার করেন। খ্রীষ্টজন্মের ৪২৩ বছর আগে মেঘদলনাটকে অ্যারিস্টোফেনিস দার্শনিক সক্রেটিসের চিন্তাধারাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, যখন সক্রেটিসের সংসারে খাদ্যের দৈনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে, তখন সক্রেটিসপুত্র একটি ঘোড়া কিনে বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইছে, আর সক্রেটিস তখন বাড়ীর কড়িকাঠে স্নানের টব বেঁধে বসে দার্শিনিক চিন্তা করছেন। অ্যারিস্টোফেনিস ঠাট্টা করে বলেছেন যে, ঐ অবস্থায় সক্রেটিসের মাথায় বাতাস লাগবারও সম্ভাবনা নেই, কারণ বাড়ীর ছাদ সক্রেটিসের মাথা এবং আকাশের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করছে। নাটকের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে, প্রচলিত নাট্যধারার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাবসার্ড নাট্যচিন্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ইবসেনের লেডী ফ্রম দি সী আবার সমুদ্রে ফিরে গেলেন, ব্র্যাণ্ড পাহাড়ের তুষারশুভ্রশিখর সীমান্তে গীর্জা তৈরী করবার আশায় জীবন উৎসর্গ করলেন। স্ট্রীণ্ডবার্গের স্পুক সোনাটা, প্রভৃতি নাটকে বিভিন্ন অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ দেখতে পাই।

আধুনিক যুগে অ্যাবসার্ড নাটকের অতি দুর্বোধ্য ভাব দুই ফরাসী মনীষীর ভেতর সব থেকে বেশী প্রকট দেখি। শিল্পী পিকাসো তাঁর আধুনিক ছবির মতনই দুর্বোধ্য নাটকের অবতারণা করলেন ১৯৪২ সালে। ক্যামুর কাছ থেকে অ্যাবসার্ড নাটক পেয়েছিল দর্শন পিকাসোর কাছ থেকে পেল রূপ। ক্যামুর প্রযোজনায় এই নাটক অনুষ্ঠিত হল। নাটকে অংশ গ্রহণ করলেন জঁা পল সার্ত্র, বর্তমান ফ্রান্সের সংস্কৃতির মন্ত্রী ম্যালরো প্রভৃতি খ্যাতনামা নাট্যকার, দার্শনিক এবং সাহিত্যিকগণ। পিকাসো ডিজায়ার কট বাই দি টেল (কামনাকে ল্যাজে ধরা হয়েছে) ছাড়া আর কোন নাটক রচনা করেননি। কিন্তু এই নাটকটির প্রভাব আধুনিক যুগের অ্যাবসার্ড নাট্য চিন্তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছে। জঁা জেনে এই দুর্বোধ্য নাটকের পথকে আরও

প্রসারিত করেছেন। তাঁর ব্যালকনি, মেডস্ বা ডেথ ওয়াচ নাটকগুলি আজ জগদ্বিখ্যাত। তাঁর ব্ল্যাক্স নাটকের দুর্বোধ্যতা পিকাসোর আধুনিক ছবিকেও অতিক্রম করে গিয়েছে। জাঁ পল সার্ত্র কেবল জেনের প্রতিভায় মুগ্ধ হননি তাঁকে সন্ত জেনে আখ্যা দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম খাঁটি ব্যক্তি বলে সম্মান জানিয়েছেন।

দুর্বোধ্য বা অদ্ভুত নাটক নিয়ে আলোচনা সবে সুরু হয়েছে। এখনও এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার সময় হয়নি। তবে একথা বলা যায় যে, বুদ্ধিজীবী ছবির মতন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মতন, অঙ্কশাস্ত্রের অতি উচ্চভাবের সংখ্যার মতন এই অ্যাবসার্ড নাটক মানুষের চিন্তাধারাতে এক নূতন দিগ্‌দর্শনের আভাষ এনেছে। বুদ্ধিবৃত্তিতে এই নবভাব প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, সাধারণ দর্শককে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে নাটক লক্ষ্য করতে বাধ্য করেছে।

যুগে যুগে আমরা দেখেছি যে, বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা তাঁদের সমকালীন চিন্তার মানকে ছাড়িয়ে চলে যায়। তাই দেখা গেছে যে, বড় বড় শিল্পীরা, সঙ্গীতজ্ঞ সুরকাররা একমাত্র তাঁদের তিরোধানের পরে সম্মানিত হয়েছেন। পরবর্তীকাল যা সহজে মেনে নিয়েছে বর্তমান তাকে উপেক্ষা করেছে। নাটক সাধারণতঃ জনসাধারণের প্রাত্যহিক স্পর্শের ওপর নির্ভরশীল। নাটককে তাই সমকালীন সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা নাটকের ইতিহাসে বিরল। আমাদের আজ একান্ত সৌভাগ্য যে এই অভাবনীয় ঘটনাকে আমরা আমাদের চোখের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি এবং তাতে অংশ গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি। ভবিষ্যত যুগ আমাদের এই গৌরবে ঈর্ষান্বিত হবে।

ইউনেস্কো আর তাঁর গণ্ডার

একটি নাম শুনতেও অদ্ভুত লিখতেও অদ্ভুত—ইউজঁ ইউনেস্কো। প্রথমে মনে হয় বুঝি ইউনাইটেড নেশন্স-এর সোশ্যাল কালচারাল বিভাগ—সেও আর এক ইউনেস্কো। কিন্তু নাট্যকার ইউনেস্কোর নামের বানান অন্য Ionesco, কিন্তু উচ্চারণ আয়নেস্কো নয়—ইউনেস্কো। ইউনেস্কো স্বয়ং ঠাট্টা করে বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের ইউনেস্কোর অনেক আগে উনি জন্মেছেন এবং অনেক পরে মরবেন সুতরাং ওর দাবিই জোরদার।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের আগে নাট্যকার ইউনেস্কোর নাম কেউ শোনেনি, কিন্তু আজ ১৯৬১ সালে তিনি কেবলমাত্র পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নন, সমস্ত নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে তাঁর রচনা একটা বিপ্লব এনে দিয়েছে। পুরনো বাঁধা নিয়ম ভেঙে দিয়ে তিনি নূতন করে নাটকের পরিধি বিচার করেছেন। অদ্ভুত অসঙ্গত আজগুবি ঘটনাকে নাটকের মধ্যে মিশিয়ে গম্ভীর ভাবের সঙ্গে হাল্কা রস জুড়ে দিয়ে ইউনেস্কো পৃথিবীতে এক নূতন যুগকে নিয়ে এসেছেন।

ইউনেস্কোর নাট্যগতি নেতিবাচক। তাঁর নাটকের রূপনির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—অ-নাটক (অ্যান্টি-ড্রামা) তাঁর নায়কও অ-নায়ক (অ্যান্টি-হিরো)। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুগুলিও তেমনি অ-কর্মী। amedee নাটকে গল্প হল স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একটা মৃতদেহ শুধু বেড়ে চলেছে, ক্রমে তাদের ঘরের দুপাশে আটকে ফেলল। 'বল্ড প্রাইমাডোনা'তে মিঃ ও মিসেস স্মিথ আর তাদের অভ্যাগতদের অসম্ভব ক্রিয়াকলাপ। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই সব অসম্ভব ও অদ্ভুত ঘটনাক্রমের পিছনে অত্যন্ত তীব্র বক্তব্য আছে। আর সেই তীব্র বক্তব্যের সম্পূর্ণ নিয়ম-বিরুদ্ধ এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রকাশ-ভঙ্গিমা ইউনেস্কোর খ্যাতির কারণ, তাঁর বিরাটত্বের নিদর্শন এবং তাঁর শক্তির পরিচয়। 'গণ্ডার' নাটকের আলোচনার সময় এই গুণগুলিকে বিশেষভাবে দেখাতে চেষ্টা করব। আজকের ইউরোপের নবনাট্যের জগতে ইউনেস্কোর প্রভাব স্যামুয়েল বেকেটের থেকে বেশি হবার কারণ, হাসির আবরণে অন্তঃ-সলিলা দুঃখের প্রকাশ, নিদারুণ হাল্কা ঘটনার মাধ্যমে অত্যন্ত শক্ত সত্যের রূপারোপ দেখাবার পক্ষে ইউনেস্কোর রীতি অত্যন্ত উপযোগী। বেকেট কেবল মননশীলতাকে নাড়া দেন। ইউনেস্কো রূপ আর শব্দ দিয়ে মনকে প্রথম চমকে দেন, তারপর প্রভাবিত করেন। ইউনেস্কোর রীতির তাই একটা নূতনত্ব

হচ্ছে বাক্যের শব্দগুলিকে দিয়ে অদ্ভুত সুরতরঙ্গ তোলা। ধ্বনিকে যন্ত্রসঙ্গীতের মতো ব্যবহার করেছেন ইউনেস্কো। ভাষান্তর হবার পরে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধ্বনিতরঙ্গ হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু ফরাসী ভাষায় অভিনয়ে এই ধ্বনিতরঙ্গ এবং তার নাটকীয় প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। গদ্যময় ইংরেজি ভাষাতে এই ধ্বনিতরঙ্গ আনবার চেষ্টা করেছেন হ্যারল্ড পিণ্টার তাঁর 'কেয়ারটেকার' নাটকে। সফল হয়েছেন বলে মনে হয় না।



নাট্যকার ইউনেস্কোর আঁকা গণ্ডারের ছবি

ইউনেস্কোর নাটক নবীন যুগের খবর এনেছে—এ কথা অনস্বীকার্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে হয় যে, অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা এই নূতন যুগের সাথী হয়ে এসেছে। এমন কি, স্বয়ং ইউনেস্কোর সব নাটক তাঁর 'গণ্ডার' নাটকের মত স্পষ্ট নয়। এবং অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট নাটকগুলিরও কি মানে হতে পারে তা নিয়ে বহু মত, বহু তর্ক এবং বহু বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। একদল সমালোচক ইউনেস্কো এবং তাঁর নাটকগুলি সম্পর্কে যেসব বিশেষণ দিয়েছেন, তার মধ্যে একটিকেও সহানুভূতিশীল বলা যায় না। আমেরিকার জন চ্যাপম্যান, ইংলণ্ডের প্রীস্টলী ও ল্যাম্বার্ট, ফ্রান্সের জাঁ গতে ও রুা বেইনের প্রভৃতি খ্যাতনামা সমালোচকরা ইউনেস্কোকে নাট্যকারের মর্যাদা দিতেও রাজি নন। গতে লিখলেন, 'ইউনেস্কো ভাবেন যে, ওঁর দর্শকরা সব একদল উজবুক।' 'জাকুই' নাটকে যখন বিবাহের সাজে সাজা মাত্র, নায়িকার মুখ কঙ্কালে রূপান্তরিত হয়ে গেল—বেইনের লিখলেন 'ইউনেস্কো আমাদের নিয়ে তামাশা করার জন্যে নাটক লেখেন।'

ইউনেস্কোর নাটক ফ্রান্সে অভিনীত হয় প্রথম ১৯৫১ সনে। 'দি লেসন' নামে একটি একাঙ্কিকা দিয়ে তাঁর অভিযান শুরু হল। তাঁর এক বন্ধুকে লেখা পত্রগুচ্ছ থেকে আমরা এই অভিনয়গুলির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য জানতে

পারি। প্রথম পত্রে ইউনেস্কো লিখেছেন, "এঁরা আমার নাটক করবেন স্থির করেছেন। হিসেব করে দেখা গেল প্যারিতে চল্লিশ লক্ষ লোক বাস করেন, আমাদের মাত্র দৈনিক চার শো লোক চাই।" আরও কিছুদিন পরে লিখলেন, 'মহানন্দে আমার নাটক চলছে। দৈনিক দর্শকসংখ্যা চার। আমি আমার স্ত্রী, আর দরজার দারোয়ান নিয়মিত। চতুর্থ জনকে ওই দারোয়ানই রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে আসে।' আরও কিছুদিন পরে কিছু কিছু লোক আসতে শুরু করলেন বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে চার-পাঁচজন নাটকের মাঝে উঠে চলে যেতেন। অবশেষে ১৯৫৪ সনে amedee ও 'জাকুই' একাঙ্কিকা দুটি দর্শকের সহানুভূতি পেল। ইউনেস্কো তাঁর বন্ধুকে লিখলেন, 'আজকাল কিছু একটা ঘটেছে, আমি পর্যন্ত বসবার জন্য একটা খালি আসন পাই না—দারোয়ান বেচারার কথা বাদ দাও।' এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জাঁ অনুইল নাটক দুটি দেখে 'ফিগারো' পত্রিকাতে লিখলেন, "প্রত্যেকের উচিত ইউনেস্কোর নাটক দেখা। স্ট্রীণ্ডবার্গ ও মলেয়ারের এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ যে কোন নাট্যকারের মধ্যে হতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।" এর পর আবার 'দি লেসন' ও 'বল্‌ড সোপার্ণো' একাঙ্কিকা দুটি চালু করা হল। এবারে এই দুটি নাটক একাধিক্রমে তিন শো রাত্রি চলল। ১৯৫৭র ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, ইসরাইল ও ফিনল্যাণ্ডে ইউনেস্কোর নাটকগুলির অভিনয় হল। ইউনেস্কোর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটকও অভিনীত হল ১৯৫৭ সনে 'ল' ট্যুর সঁ গাগ'। এই 'ল' ট্যুর সঁ গাগ' নাটকে আমরা ইউনেস্কোর অ-নায়ক "বেরেঞ্জার"এর প্রথম দেখা পাই। এই 'বেরেঞ্জার' চরিত্রটিই ইউনেস্কোর নানা নাটক ও ছোট-গল্পের মাধ্যমে পরিপুষ্ট হয়ে 'গণ্ডার' নাটকের প্রধান চরিত্ররূপে দেখা দিয়েছে। বেরেঞ্জারকে কেন্দ্র করেই 'গণ্ডার' বা লে' রাইনোসোরাস' নাটকটি গড়ে উঠেছে। গল্পটি অদ্ভুত। বেরেঞ্জার একজন অতি সাধারণ লোক। মদ খেতে ভালবাসে মাতাল হতেও তার মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না। তার উঁচু-মনের অতি ভদ্র বন্ধুরা সেজন্য তাকে ঘৃণা করে। বেরেঞ্জার একজন অ-তরুণ কেরাণী, সেই অফিসের একটি মেয়েকে ভালবাসে। ইচ্ছা, অর্থের স্বচ্ছল অবস্থা হলেই তাকে বিয়ে করবে। এমন সময় এক কাণ্ড হল। এক রবিবার সকালবেলা বেরেঞ্জার রাস্তার পাশের দোকানে মদ খাচ্ছে, তার উন্নাসিক বন্ধু তাকে মদ খাওয়ার অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছে, নৈয়ায়িক ন্যায়ের আলোচনা করছেন অন্য দিকে, এমন সময় রাজপথ দিয়ে একটি গণ্ডার ছুটে

চলে গেল। প্রথম বিস্ময় কেটে যাবার আগেই আবার গণ্ডার ছুটে চলে গেল, এবার কিন্তু যাবার পথে যে পোষা বিড়ালটা রাস্তা পার হচ্ছিল, তাকে পিষ্ট করে দিয়ে গেল। বিড়াল শোকাতুরা মহিলাকে শান্ত করার আগেই তর্ক বাধল প্রথম ও দ্বিতীয় গণ্ডার একই গণ্ডার কি না আর তারা কোথা থেকে এল তাই নিয়ে। এর পর ঘটনা উদ্ভট। দেখা গেল সকলে গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে। রোগ যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি গণ্ডার হওয়া ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বেরেঞ্জারের অফিসের কর্তা, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী কর্মী এবং বন্ধুরা কেউই বাদ পড়ল না। উচ্চকাঙ্ক্ষী আর হতাশাধর্মী উভয়েই গণ্ডার হয়ে গেল। বেরেঞ্জারের উন্নাসিক বন্ধুটি সকলের চোখের সামনে ধীরে ধীরে গণ্ডার হয়ে গেল। প্রিয়বান্ধবীও শেষ পর্যন্ত গণ্ডার হয়ে গেল। বেরেঞ্জার একা শুধু রইল মানুষের প্রতীক হয়ে। তার তখন মনে হতে লাগল, সেই বুঝি অপ্রকৃত, সেই অস্বাভাবিক। চিরায়ত নিয়মের জাজ্বল্যমান ব্যতিক্রম। এই গণ্ডারের জগতে তার অবস্থান দানবীয়, স্থিতাবস্থায় সেই একমাত্র আলাদা—ভিন্ন জাতি. ভিন্ন গোত্র। ধীরে ধীরে বেরেঞ্জার সেই অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে নিজের অধিকার রক্ষা করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

এ নাটকটি তিনটি দেশের শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রতিষ্ঠান ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য সব আগে ফ্রান্সে অভিনয় হয় থিয়েটার দ্য ফ্রাঁসে। প্যারিতে ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা জাঁ লুই বারল্ট নাটকটির পরিচালনা করেন এবং বেরেঞ্জার চরিত্রে অভিনয় করেন।' লণ্ডনে অরসন ওয়েলস নাটক পরিচালনা করেন এবং স্যার লরেন্স অলিভিয়ার 'বেরেঞ্জার' ভূমিকায় নামেন। জার্মানির ডুসলডর্ফে Schanspieltans দল অভিনয় করেন। লণ্ডনের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নাটকের শেষে যখন বেরেঞ্জার 'আমার চারিদিকে গণ্ডার' বলতে বলতে পায়ে পায়ে পিছু হাঁটেন, তখন মনে হয় বুঝি আমরা সত্যি করেই সবাই গণ্ডার হয়ে গিয়েছি। প্রত্যেকটি দর্শক ঘাড় শক্ত করে বসে থাকেন পাছে পাশের ভদ্রলোক বুঝে ফেলেন যে, তাঁর নাকে হাত দিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে—সত্যি সেখানে খড়্গা উঠেছে কি না। চিরকাল মনে রাখার মত অনুভূতি।

'গণ্ডার' নাটকে ইউনেস্কো গোষ্ঠিবদ্ধতার ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ করেছেন, ধিক্কৃত করেছেন, মনের পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণভাবে অনাবৃত করেছেন। বর্তমান পৃথিবীর ঝোঁক গোষ্ঠিবদ্ধতায়। রাজনৈতিক, সামাজিক, শুভ এবং অশুভ কাজে গোষ্ঠী গঠনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং কর্তব্য। গোষ্ঠিকরণ বর্তমান

জগতের কেবলমাত্র কর্মকাণ্ড নয়, সেটাই আমাদের ক্রমবিবর্তন ও নির্বাণ, সভ্যতার মানদণ্ড এবং শক্তির মাপকাঠি। ইউনেস্কো তাই মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন। আজগুবি ঘটনার পরিণতিতে নিজেদের আবিষ্কার করি, অসম্ভবের সম্ভাবনায় আমাদের আসল রূপটা ধরা পড়ে, আবোলতাবোল ঘটনার ধাক্কায় রঙ মাটি ভেঙে গিয়ে ভেতরকার খড়ের শুষ্কতা প্রকাশ পায়। তাই আজ ইউনেস্কো অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। 'গণ্ডার' তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। দুই-একজন ইউনেস্কোকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এত জীব থাকতে গণ্ডারের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল কেন? উত্তরে ইউনেস্কো বললেন, যূথবদ্ধ কোন জীব তাঁর প্রয়োজন ছিল প্রতীক হিসেবে। তিনি হাতি, বাইসন, জলহস্তী এবং বুনো ষাঁড়েদের জীবনধারণপদ্ধতি অনুধাবন করেন। এমন সময় গণ্ডারের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি গণ্ডারকেই প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করবেন স্থির করেন। মোটা চামড়া, বদরাগী, ক্ষীণদৃষ্টি, অদূরদর্শী, নাকে খড়্গ, জঙ্গী এবং বিধ্বংসী অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাশবিক কিংবা এক কথায় পূর্ণ মানবিক বলা চলে।

'গণ্ডারে'র অভিনয় বিভিন্ন দেশে আদৃত হয়েছে। নাটকটিকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে কেউ কেউ অভিহিত করেছেন। এই বিবদমান সভ্যতার বিরুদ্ধে মানুষের উপযুক্ত উত্তর ধ্বনিত হয়েছে। ইউনেস্কো কারও প্রতি সামান্যতম দয়া দেখাননি। অত্যন্ত উগ্রভাবে মানুষের হীনতার রূপকে, সভ্যতার অহংকারকে প্রকাশিত করেছেন। এই সংস্কারবিরুদ্ধতা, এই আপোস-বিরোধিতা ইউনেস্কোর রচনার শ্রেষ্ঠ গুণ। কেবল সভ্যতা নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক কোন অন্যায়ই তাঁর হাতে নিষ্কৃতি পায়নি। প্রেম এবং বুদ্ধি, সমালোচক এবং অধ্যাপক, ইউনেস্কোর হাতে সমানভাবে তাড়িত হয়েছে। তাঁর নাটকগুলিকে অনেকে 'অ্যান্টি-রোমান্টিক' আখ্যা দিয়েছেন। 'নেগেটিভ-প্যাসিভিটি' ইউনেস্কোর নাটক রচনার প্রধান রীতি। অতি-আধুনিক নাটকের জনক হলেও ইউনেস্কোকে ঠিক আধুনিক বলা যায় না। বরঞ্চ আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি বুখারেস্টে জন্মান ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। পনের বছর বয়সে তিনি ফ্রান্সে আসেন এবং সেখানেই শিক্ষা সমাপ্ত করেন। রুমানিয়াতে ফিরে গিয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কিছু সুনাম অর্জন করলেও ফ্রান্সের টান প্রবল হল। ১৯৩৮এ সস্ত্রীক রুমানিয়া ত্যাগ করে ফ্রান্সে এসে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন।

এই ছোট্ট মানুষটি সম্বন্ধে আলোচনার শেষ নেই। কেউ বলেছেন, উনি



ইউজ্ঁ ইউনেস্কো

হলেন স্ট্রীণ্ডবার্গ ও মলেয়ারের সংমিশ্রণ; অন্যেরা বলেছেন, পাগল, খেয়ালী, কিন্তু নাট্যকার নন। সব থেকে আশ্চর্য হচ্ছে যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই সব কথা বলা হয়েছে—তাঁর কাছে নিন্দাস্তুতি কিছুই পৌছায় না। তিনি বলেন—আমি সেদিন দরজা খুললাম, আমার তিন বছরের মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার জীবনে যেন প্রথম দরজা খুলল। আমি এইরকম সহজ সত্য বলতে চাই। নিজেকে ঘুম থেকে জাগাতে চাই—অন্যকে জাগিয়ে দিয়ে।' মোটা ভ্রূর নীচে বড় বড় চোখ। তাকালে মনে হয় তাঁর দৃষ্টিটা বহুদূর চলে যাচ্ছে, আমাদের দেহ, ওই দূরের গাছ, লাল রঙের ফুলে রাঙা পথ পার হয়ে। মাথার সামনের দিকটায় টাক পড়ে গিয়েছে—কপালের রেখাগুলো গভীর। ইউনেস্কো বলেন, 'আমি জীবনটাকে মানিয়ে নিতে পারিনি। জীবনটা তাই আমার অসঙ্গতির মত লাগে। অন্যের সঙ্গেও মেলে না—বহির্জগতের সঙ্গে তো মেলেই না। আমার মনে হয় রূপের মধ্যে বস্তু নেই। তাই রূপ মিথ্যা,

অসার। শব্দ শুধু আওয়াজ—স্থায়ীত্ব সত্ত্বেও সত্য নেই তার মধ্যে, আর ওই বাড়িগুলো ওই আকাশের দিগ্‌দর্শনে খানিক কারণহীন আঁকাজোখা। মানুষ চলে—মানে নেই তার কিছু। নিয়মমত ফাঁক (স্পেস) ভরাট করছে মাত্র। আমার মনে হয় হঠাৎ একদিন সব উবে যাবে। মজা হচ্ছে আমি এ সত্ত্বেও বেঁচে থাকি। এই সব নানা রঙের গন্ধ শুঁকি। মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরে যাবার ব্যথা অনুভব করি। জানি না কেন, আমার সব কিছু বার বার হারিয়ে যায়।'

ভল্‌ফগাঙ্গ আমেদিয়ুস মোৎসার্ট

গন্ধর্বকে ধন্যবাদ। তাঁদের তাগিদে দীর্ঘদিন পরে আবার বিদেশী নাটক, নাট্যকার ও মঞ্চ সম্বন্ধে লেখবার জন্য কলম খুলে বসেছি। আরো লক্ষ প্রবন্ধকারের মতো আমিও সম্পাদক মণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

গল্পটা নাটকের। কিন্তু তার আগে লম্বা উপক্রমণিকা করতে হবে। ভল্‌ফগাঙ্গ আমেদিয়ূস মোৎসার্টের নাম সঙ্গীতের জগতে অমর অক্ষয় হয়ে আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপীয় সঙ্গীত জগতে তাঁর আবির্ভাব এক অভূতপূর্ব ঘটনা। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের মতো মোৎসার্টের কীর্তি সঙ্গীতশাস্ত্রের



মোৎসার্ট

পরিধিকে দিক চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। সঙ্গীত সাধনাকে অনন্ত সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মোৎসার্টের পরবর্তী সঙ্গীত স্রষ্টাগণ নানা রঙে নিজেদের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সব প্রতিভাধরদের মধ্যে মোৎসার্টই

প্রথম পথ প্রদর্শনকারীর সম্মানে প্রতিষ্ঠিত। সুরে ছন্দে বর্ণনাসুষমায় মোৎসার্টের পরবর্তী রচয়িতাগণ সঙ্গীতের দিগন্ত বিস্তার করেছেন। সমবেত যন্ত্রধ্বনী দিয়ে কি মোহময় স্বর্গ রচিত হতে পারে বার বার প্রমাণিত করেছেন। বিংশশতাব্দীর মানুষ এই শব্দ লহরীতে মুগ্ধ, বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

মোৎসার্টের বিশেষত্ব হল তিনি নূতন শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করেননি যা তাঁর পরবর্তী বিখ্যাত সুরকারদের অনেকেই করেছেন। তিনি প্রচলিত সাধারণ ধ্বনীগুলিকে তাঁর মনীষায় অসামান্য করে দিয়েছেন। সুরকে অপূর্ব সুক্ষ্মতায় বরণ করেছেন। মাধুর্যে তাকে সুষমার সমারোহে মণ্ডিত করেছেন। তাঁর যাদুদণ্ডের স্পর্শ পেয়ে কুটির যেন হয়ে গেল এক অপূর্ব সৌষ্ঠবপূর্ণ অট্টালিকা। স্বপ্নের জগৎ যেন রূপ পেল তাঁর মোহন স্পর্শে। ধূলি মুঠি যেন আবীরের রঙে রাঙা হয়ে মাতোয়ারা করে দিল চারদিক, আনন্দে ছন্দে সুগভীর উপলব্ধিতে।

এই মোৎসার্টের জীবনী নিয়ে নাটক লিখেছেন বর্তমান ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পিটার সাফার। নাটক চলছে ন্যাশানাল থিয়েটারে অলিভিয়ার মঞ্চে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন অন্যতম ইংরেজ অভিনেতা পল স্কোফিল্ড। কিছুদিন আগে যাঁকে বলা হত জন গীলগুড ও লরেন্স অলিভিয়ার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী—প্রিন্স অফ ওয়েলস অফ দি ব্রিটিশ থিয়েটার। আজ সেই রাজকুমার হয়েছেন রাজা। এমন মণিকাঞ্চন যোগ জোটা সহজ নয়। পিটার সাফার সকলের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করার জন্য নাটকের নাম দিয়েছেন 'আমেদিয়ুস' (Amadeus)'। মোৎসার্টের অপ্রচলিত মধ্য নাম।

থিয়েটার পাগল চার বন্ধুর কাছে এমন গ্রহসংযোগ কদাচ ঘটে। তাঁরা সবাই মোৎসার্টের ভক্ত, পিটার সাফারের প্রতি অতি শ্রদ্ধাশীল, পল স্কোফিল্ডের গুণগ্রাহী আর লণ্ডনের ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রযোজনার পক্ষপাতী। এঁদের মধ্যে ইংরেজ দুইজনের একজন হলেন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক এবং সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং অন্যজন ইয়র্কশায়ারের এক সুবিখ্যাত শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। ভারতীয় দুইজনের একজন লণ্ডনের স্থায়ী অধিবাসী। এঁর ইংরেজ স্ত্রী, শিল্প—ইতিহাসের সাধনায় তিনি যেন এই দলটিতে পরস্পরের ভাব বিনিময়ের যোগসূত্র। স্বামী হলেন এক বিখ্যাত সর্ব জাতীয় হিসাবপরীক্ষক সংস্থার অংশীদার। দ্বিতীয় ভারতীয় আমি। টেলিফোনে যোগাযোগ সৃষ্টি করে স্থির হল দিন সময়

সন্ধ্যা। ইংরেজ দুজনেই বাইরে থাকেন তাঁরা নিজেদের গাড়ী চালিয়ে যথাসময়ে থিয়েটারে হাজির হবেন জানালেন। দলের একমাত্র মহিলা ও পঞ্চম সদস্য মোৎসার্টের জীবনীর সারাংশ সকলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

হুল্ফগাঙ্গ আমেদিয়ুস মোৎসার্ট (Wolfgang Amadeus Mozart) অস্ট্রীয়ার অন্তর্গত সাল্জবার্গ সহরে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ওখানকার বিশপের অধীনে গীর্জার প্রধান সুরকারের চাকরি করতেন। পিতার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মোৎসার্ট মাত্র নয় বছর বয়সে সুরচর্চায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি অতি সহজেই পিয়ানো, বেহালা, হার্প্সীকর্ডে বা অন্য যে কোন বাদ্য যন্ত্রে সুর তুলতে পারতেন। কিন্তু জীবন তাঁর ছিল অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল। ইউরোপের অভিজাত মহলে তাঁর রচনার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হল বটে কিন্তু কোথাও কোন স্থায়ী কাজ জুটলনা। অবশেষে অস্ট্রীয়ার রাজা দ্বিতীয় যোশেফ কাছ থেকে ডাক এল কিন্তু তাঁর অসামাজিক ব্যবহারের জন্য সভার প্রধান সুরকারের আসন তাঁকে দেওয়া হল না। সঙ্গীত নাটক রচনায় অপেক্ষাকৃত হালকা কাজে তাঁকে নিযুক্ত করা হল। মোৎসার্টের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি এই সময়ের: ইডোমেনিও (১৭৮১), দি ম্যারেজ অফ ফিগারো (১৭৮৬), ডন গিয়োভানী (১৭৮৭), কসি ফাঁ টুট (১৭৯০), এবং দি ম্যাজিক ফ্লুট (১৭৯১)। শেষ জীবনে রাজার পৃষ্ঠপোষকতাহীন হয়ে মোৎসার্ট অত্যন্ত দারিদ্র্যে কাল কাটান। অত্যধিক পানদোষে ৩৫ বছর বয়সে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মোৎসার্ট ইহলোক ত্যাগ করেন।

মোৎসার্টের সৃষ্টিপথ ধরে সঙ্গীতনাট্য বা অপেরার প্রভূত উন্নতি হল পরবর্তী কালে। মোৎসার্টের রচনাগুলি কিন্তু কালজয়ী হয়ে রইল। অন্যান্য বহুবিখ্যাত সঙ্গীত-নাট্যের মাঝে, বহু নূতন সুরের আওয়াজের মাঝে মোৎ-সার্টের সৃষ্টি আজও অমলিন। অতি অল্প সময় পৃথিবীতে বিচরণ করলেও মোৎসার্ট যে মণিমুক্তাগুলি ছড়িয়ে রেখে গেছেন তার তুলনা পাওয়া কঠিন। অন্য দিকে তাঁর প্রদর্শিত পথে "অপেরা" এক অপূর্ব উন্নত শিল্প সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছে।

নাটক লেখার এমন চরিত্র পাওয়া কি সহজ। একদিকে ঈশ্বর দত্ত প্রতিভায় চরম প্রতিভাধর অন্যদিকে আহারে বিহারে ব্যবহারে চরম উচ্ছৃঙ্খল। এমন বিপরীত সংযোগ কদাচ দেখা যায়। রাজার সম্মানে যাঁর জীবন কাটা উচিত ছিল দারিদ্র্যের কষাঘাতে তাঁর মৃত্যু হল। বহু কামিনী সঙ্গিনীকে তিনি জীবনে পেয়েছিলেন তাদেরই একজন থেকে গেল তাঁর সঙ্গে। পরিচয়.

দিল স্ত্রীর। ভাগ করে নিল দুঃখ, অনাহার, নির্যাতন, অপমান। মোৎসার্টের মৃত্যুর পর তিনি বিবাহ করলেন অন্যকে। যত্ন করে রক্ষা করলেন মোৎসার্টের রচনাগুলি। তাদের প্রচার হল জগতে। এই মহীয়সী রমণী ছিলেন বলেই মোৎ-সার্টের কীর্তি সকলে উপভোগ করতে পারল। তাঁর বিরাট প্রচণ্ড প্রজ্বলিত প্রতিভাকে প্রণাম জানাতে পারল। মৃত্যুর পর মোৎসার্টের সুনাম দিকবিদিক পরিব্যাপ্ত করল। রয়্যালটির মোটা অর্থ অগ্রিম আদায় করতেন তাঁর ভূতপূর্ব প্রিয়া। মৃত্যুর আগে বেশ ভাল অর্থ জমা করেছিলেন মোৎসার্ট প্রচারে। শিখিয়েছিলেন তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের সন্তানদের এই মোৎসার্ট ব্যবসা।

নাট্যকার পিটার সাফারের সব থেকে বড় গুণ হল তাঁর ভাবনা প্রচলিত পথ সব এড়িয়ে চলে। এইতো সেদিন লোড সেডিংএর নাটক দেখে হাসতে হাসতে অবাক হলাম। যখন লোডসেডিং অর্থাৎ অন্ধকার তখনই মঞ্চ আলোময় সবাই অন্ধকারে থাকার অভিনয় করছে। আর যেই আলো এল মঞ্চ হল অন্ধকার সবার নড়াচড়া হয়ে গেল স্বাভাবিক। এই নাট্যকার ছাড়া 'রয়েল হাণ্ট ইন দি সান' অন্য কেউ লিখবেন ভাবা যায় না। কাজেই পিটার সাফারের নাম দেখলেই নাট্যগৃহে প্রবেশপত্র নির্দ্বিধায় কেনা যায় কারণ তার মধ্যে যেমন থাকবে আঙ্গিকে নূতনত্ব তেমনই থাকবে ভাববার বিষয়। আর যে নাটকই ভুলি না কেন তাঁর নাটক ভুলে যাওয়াও কঠিন।

ন্যাশনাল থিয়েটারে অলিভিয়ার মঞ্চ পাঁচকোণ অর্ধবৃত্তাকারে দর্শকদের মধ্যে ঢুকে এসেছে। প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ যেমন আছে ওপর দিয়ে তেমনি আছে নীচে দিয়েও। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে আলো পড়ল দর্শকদের পেছনে। দুইজন অভিনেতা উনবিংশ শতাব্দীর অস্ট্রীয়ার নাগরিকদের পোষাক পরে দর্শক বসাবার পথ দিয়ে নেমে চললেন মঞ্চের দিকে। তাদের সংলাপ (দুজনেরই এক সংলাপ) 'অবিশ্বাস্য। কি অসম্ভব কথা। কেউ কি কোন দিন ভেবে ছিল! আশ্চর্য! প্রাক্তন রাজসুরকার বৃদ্ধ স্যালিয়েরি এতদিন পর ঘোষণা করেছেন যে আমেদিয়ুস মোৎসার্টের তিনি হত্যাকারী। প্রতি-দিন ছয় বোতল কড়া মদ তিনিই আমেদিয়ুসের দরজার সামনে রাখার ব্যবস্থা করতেন।'

স্টেজ আলোকিত হল। শীতকালের ভিয়েনা সহর। জানালার বাইরে তুষারপাত হচ্ছে। একটি চাকাওয়ালা চেয়ারে দর্শকদের দিকে পেছন করে এবং সর্বাঙ্গ কম্বলে আচ্ছাদিত করে সেই স্বল্প আলোকিত ঘরে বসে স্যালি-য়েরি তুষারপাত দেখছেন। নীচে থেকে উঠে এল বৃদ্ধ ভৃত্য বলল: এ সব কি

বলেছ খবরওয়ালাদের ? স্যালিয়েরি খেঁকিয়ে ওঠেন অশিতিপর বৃদ্ধের সরু ভাঙ্গা গলায় : করেছি, বেশ করেছি। তোর তাতে কি ? তুই যা পালা, চলে যা, দূর হ' আমার সামনে থেকে।' বৃদ্ধ ভৃত্য মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়। বলে : 'সারা জীবনভোর খালি মিথ্যাচার করেই গেল। এখন মরবার বয়স হয়েছে পা পঙ্গু হয়ে গেছে, এখন সমানে মিথ্যাচার করে চলেছে।' কিছুক্ষণ চুপচাপ। কোন আওয়াজ নাই। কার যেন বুকটা টিপ টিপ আওয়াজ করছে ? আমার। কার নিঃশ্বাস যেন জোরে জোরে পড়ছে ? তিনসারি আগের ঝাকড়াচুলো ওই স্পেনীয় মেয়েটির। স্যালিয়েরি রূপী বর্তমান ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা পল স্কোফিল্ড দর্শকদের দিকে তাকালেন। চোখ পিট পিট করে বৃদ্ধের শুকনো ঠোঁটে একটু হাসি এনে বললেন : আপনাদের জানতে ইচ্ছা করছে না আমি সারাজীবনে কতো মিথ্যাচার করেছি ? তাহলে শুনুন।' উঠে দাঁড়ালেন স্যালিয়েরি রূপী স্কোফিল্ড। কম্বল খুলে গেল, মাথার পরচুলা খসে পড়ল, কি মন্ত্রে চোখে মুখে ফুটে উঠল যৌবনের দীপ্তি, প্রকাশ পেল সুন্দর রঙিন ঝকঝকে চকচকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্ট্রীয়ার রাজ সভাসদের পোষাক। স্যালিয়েরি বললেন 'তখন আমার পূর্ণ যৌবন। ভিয়েনায় বসন্ত-কাল। খবর পেলাম মোৎসার্ট অস্ট্রীয়ার রাজ-সুরকারের পদ প্রার্থী।'

সুরু হল নাটক। স্যালিয়েরি একাধাবে সূত্রধার, প্রধান চরিত্র ও খল নায়ক। অপূর্ব সৃষ্টি নাট্যকারের। স্যালিয়েরির সঙ্গীত প্রতিভা সীমিত কিন্তু সঙ্গীত সুরকারের কীর্তি বোঝার ক্ষমতা অগাধ। তাই দিয়ে সে বুঝতে পারছে যে মোৎসার্ট একজন অসামান্য স্রষ্টা। মোৎসার্টের ক্ষমতা পাবার জন্য সে শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রি করতেও রাজী। কিন্তু প্রতিভা তার আয়ত্তে নয় তাই প্রতিভাধরের প্রতি শয়তানী করে সে জীবনের সুরহীনতার ক্ষোভকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। একমাত্র সেই বোঝে মোৎসার্ট কত বড় প্রতিভা, তাঁর সৃষ্টি কি অনন্য সাধারণ। রাজাকে বলে তার উল্টো। মোৎসার্টের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের গল্প শুনিয়ে তাকে রাজসভা থেকে এবং ভদ্রসমাজ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দেয়। অবশেষে অর্থ দৈন্যে ক্ষুধার্থ মোৎসার্টের দরজার সামনে রাখে প্রতিদিন ছয় বোতল মদ যেটা পান করা মোৎসার্টের পক্ষে বিষপানের অনুরূপ। মোৎসার্ট মরে গেল। কিন্তু স্যালিয়েরির কি হল ? সেতো কিছু পেলনা। বরঞ্চ মোৎসার্ট বেঁচে থাকতে তাকে অনুকরণ করে অথবা তার থেকেও ভাল সঙ্গীত রচনার চেষ্টায় কিছু সুর সৃষ্টি হত। মোৎ-সার্টের মৃত্যুর পর তাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। তারপর সময় যত গেছে মোৎসার্টের

সুনাম যত দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে স্যালিয়েরিকে সবাই ভুলে গেছে। ওই নামে যে কোন সুরকার ছিল তা সম্পূর্ণ মুছে গেছে। অথচ তিনি তখনও জীবিত। জীবনমৃতের এর থেকে ভাল উদাহরণ পাওয়া যায় না।

কি সুন্দর অভিনয়। ঈশ্বরের কাছে স্যালিয়েরি অভিযোগ করছে: তুমি আমায় অন্যের কীর্তি বোঝার জ্ঞান দিলে কিন্তু আমাকে ক্ষমতা দিলেনা কেন? প্রতিভাধরকে বোঝবার বুদ্ধি আর শক্তি দিলে কিন্তু তাকে সহ্য করার মতো উদারতা দিলেনা কেন? কেন অসাধারণ হবার এই প্রচণ্ড বাসনাকে জাগিয়ে দিয়ে আমায় এমন সাধারণ করে গড়লে। সুরু হল স্যালিয়ারির ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ। ঈশ্বরের দয়ার পাত্র মোৎসার্টকে তাকে ধ্বংস করতেই হবে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য মনে পড়ে যায়। রাজসভায় মোৎসার্ট। এই দুরুহ শিল্পীর ভূমিকায় একজন আনকোরা নূতন অভিনেতা রিচার্ড ও' ক্যাল্যাহান অভিনয় করছেন। যেন মোৎসার্টের ছবি জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজসভায় আচার ব্যবহারের কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা ও কাষ্ঠময়তা মোৎসার্টের হাসি চাপবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে। সহসা উদগত সেই শ্লেষপূর্ণ চাপা হাসি যেন ঝর্ণার ধারার স্বাভাবিকতায় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহকে পরিব্যাপ্ত করেছে। মনে হয়েছে এই ঝরণা যেন নদী হয়ে জনপদসহর পার হয়ে সমুদ্রে গিয়ে বিলীন হবে। কিন্তু সঙ্গীত সৃষ্টির মুহূর্তে মোৎসার্ট অন্য ব্যক্তি। শান্ত, সমাহিত ধ্যান গভীর। প্রতিভার আলোকে তার মুখ উদ্ভাসিত তার নীল চোখে অসীমের সাধনা।

আর ভুলবনা সেই দৃশ্য। দারিদ্র্যের তাড়নায় মোৎসার্ট এবং তাঁর সঙ্গিনী রচনাগুলি বিক্রির চেষ্টা করলেন। স্যালিয়েরির ষড়যন্ত্রে সেগুলি কেউ কিনল না। শেষে স্যালিয়েরি খবর পাঠালেন মোৎসার্টের স্ত্রী বা সঙ্গিনীর কাছে যে তিনি যদি নিজে একা আসেন রচনাগুলি নিয়ে তাহলে তিনি বিবেচনা করে দেখবেন ওদের কোনটি রাখবার যোগ্য কিনা। সুরের সেই মস্তবড় খাতাগুলি বহু কষ্টে বয়ে নিয়ে এলেন মোৎসার্ট সঙ্গিনী স্যালিয়েরির ঘরে। স্যালিয়েরি প্রস্তুত। বাড়ী থেকে আর সবাইকে বিদায় করে দিয়েছেন যাতে কোন সাক্ষী তার অপকীর্তি জানতে না পারে। মোৎসার্ট সঙ্গিনীর কঠিন ভূমিকায় ফেলিসিটি কেণ্ডালের সে কি অপূর্ব অভিনয়। ভয়ে ভয়ে পায়ে পায়ে হেটে দাঁড়ালেন তার প্রিয়তমের শত্রুর সামনে। শীতকাল ঘর ঠাণ্ডা। ছিন্নবিচ্ছিন্ন পোষাক। মাথার আচ্ছাদনীতে দারিদ্র্যের চিহ্ন। স্যালিয়েরি উঠে এসে জানালেন যে তিনি সুর-রচনা কিনবেন না। তবে তিনি অর্থ দিতে প্রস্তুত যদি মোৎসার্ট সঙ্গিনী তাকে তাঁর দেহ উপভোগ করতে দেন। মুহূর্তে ক্যাকাশে

হয়ে গেল মুখ। পর মুহূর্তেই সপ্রতিভতা এনে তিনি বললেন তিনি রাজী। একটু রসিকতার চেষ্টা করলেন মুখে হাসির আভা এনে। ধন্যবাদ দিলেন স্যালিয়েরিকে কথাটা মনে করিয়ে দেবার জন্য। সত্যিই তো দেহ বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের কথা তার আগে তো মনে হয়নি। ধীরে ধীরে পোষাকগুলি ত্যাগ করতে লাগলেন। একে একাধিক দিনের অনাহার অন্যদিকে ঠাণ্ডা ঘর। একটি করে বসনচ্যুতির সঙ্গে তার দেহ ঠাণ্ডায় এবং ভয়ে কাঁপতে লাগল। বসন যত কম কম্পন তত বেশী। মুখে হাসি টেনে কম্পন বন্ধ করার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন মোৎসার্ট-প্রিয়া। শেষে কেবল একটি সেমিজ থাকল। তার তল দিয়ে দেহবল্লরী স্পষ্ট প্রকাশমান। ডাকলেন স্যালিয়েরিকে বললেন সেই অবস্থায় তাকে উপভোগের কোন অসুবিধা হবে না। সেমিজ ত্যাগ করলে ঠাণ্ডায় মারা যাবার সম্ভাবনা আছে। স্যালিয়োর বললেন না তিনি মত পালটেছেন। তিনি অর্থ দেবেন যদি ওই অধোলঙ্গ অবস্থায় মোৎসার্টের সমস্ত সঙ্গীত-রচনা ছিড়ে নষ্ট করে দেন মোৎসার্ট—প্রিয়া তাঁর নিজের হাতে। লিখতে শরীর এখনও রোমাঞ্চ হচ্ছে। ফণিনীর মতো গর্জে উঠলেন মোৎসার্ট সোহাগিনী। সর্বাঙ্গ দিয়ে আগলে ধরলেন রচনার খাতাগুলি। শান্ত মুখের মুখোস খুলে ফেলে চিৎকার করে ধিক্কার দিলেন স্যালিয়েরিকে। সে কি জানেনা যে এই রচনাগুলি অমূল্য। একটা স্ত্রীলোকের সম্মান অথবা তার মতো দুষ্কৃতকারীর জীবন তুচ্ছ এই অভ্রংলিহ কীর্তিসৌধের কাছে। এত ছোট মন স্যালিয়েরির যে এই অপূর্ব সৃষ্টিকে ধ্বংশ করতে চায়। সব গুছিয়ে নিয়ে বিদায় হলেন মোৎসার্ট-সঙ্গিনী, বললেন তুমি আমি কেউ থাকব না কিন্তু সঙ্গীত থাকবে। তাই থেকে লোকে বুঝতে পারবে মোৎসার্ট কি বিরাট প্রতিভাধর ছিল।

কখন চোখের জলের ভেতর দিয়ে বাষ্পীভূত নয়নে নাটক দেখেছি, কখন দুঃখে অভিভূত হয়েছি। কখন সুরের অপূর্ব যন্ত্রসঙ্গীতে মোহিত হয়েছি। মোৎসার্টের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি নাটকে এমন সুন্দরভাবে সংযোজিত হয়েছে যে তার সঙ্গীতের রস সম্পূর্ণভাবে আস্বাদন করা যায়। শুধু দৃষ্টি আর শ্রবণ দিয়ে নয় সমগ্র সত্বা দিয়ে এই নাটককে অনুভব করা যায়। সমস্ত দেহমন এই সঙ্গীতের সুরে পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয়ে যায়। মনে হয় জন্ম সার্থক হল। ভাষায় সে আনন্দের প্রকাশ হয় না। সূর্যাস্তের রঙিন আভা যেমন মনের মধ্যে শান্তি ছড়িয়ে দেয়, মায়ের কপালে সিঁদুরের টিপ যেমন পরম নির্ভরতা আনে, সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন মনে হয় বুঝি হারিয়ে গেছি, তেমনি

একটা সুখ, তেমনি একটা স্মৃতি মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এটাকেই বোধহয় বলেছেন "পাওয়া।" 'আমার সব নিবি কে, সব দিবি আয়, আয় আয় আয়।' নাটক শেষ হয়নি। বৃদ্ধ বিস্মৃত স্যালিয়েরির মোৎসার্ট বধের গল্প কেউ বিশ্বাস করলনা। বলল ওটা কাগজ বিক্রির ছল। স্যালিয়েরি বলে কেউ আর বেঁচে নাই হয়ত কখন ছিল না। নিশ্চয় ওটা কোন রূপকথার চরিত্র।

তিনি বেঁচে আছেন প্রমাণ করতে স্যালিয়েরি নিজের গলায় ছুরি চালালেন। তাতেও মৃত্যু এল না। সাংঘাতিক আহত হয়ে বেঁচে থাকলেন। এবারকার ঘটনা কাগজেও প্রকাশিত হল না। বৃদ্ধ আহত অশিতিপর স্যালিয়েরি তার চাকা-চেয়ারে বসে দর্শকদের ভাঙা ফ্যাসফেসে গলায় বললেন: 'দেখ, কেউ জানে না তবু আমি বেঁচে আছি। আমার অস্তিত্বও কেউ স্বীকার করে না তবু আমি শূন্য ভরাট করে আছি। তোমাদের মতো আমিও জনসংখ্যায় কেবল একটু সংযোগ, তাছাড়া আর কোন মূল্য নাই। ঝড়ে ধূলিকণা শুকনো পাতার সঙ্গে হাওয়ায় ওড়ে। একদল মরে যায় একদল জন্মে।'

নাটকে দেখার মতো অভিনয় করেছেন স্যালিয়েরির ভূমিকায় পল স্কোফিল্ড। নাটকের সর্বক্ষণ তাঁকে মঞ্চে থাকতে হয়। বস্তুত: অভিনয়ে এমন মুন্সীয়ানা আধুনিক নাটকে সচরাচর দেখা যায় না। একটু ব্যক্তিগত গর্ব অনুভব করলাম। আমার ছারপোকা নাটকে যে ভাবনাচিন্তার পরীক্ষা করেছি আমেদিয়ুস নাটকে তার সার্থক প্রয়োগ দেখতে খুবই ভাল লাগল। একাধারে নাটকের গল্প বলা, চরিত্রাভিনয় করা এবং গল্পের সব অপকর্মের হোতা হয়ে চরিত্র রক্ষা করা যে কি সুকঠিন কাজ তা সকলেই বুঝবেন। বিশেষ এমন এক মঞ্চে যেখানে তিনদিকে দর্শক বসে আছে এবং উইংস বা প্রসেনিয়ামের চিহ্নমাত্র নাই।

লণ্ডনে নাটক দেখার বড় আনন্দ থিয়েটার শেষের আড্ডা। এবারেও সেটা জমল একটি গ্রীক আহারালয়ে। আড্ডার নিয়ম হল প্রচলিত সমালোচনা যা কাগজে প্রকাশিত হয় সেটি উচ্চারণ করলে আহারের পুরো খরচ তার ঘাড়ে চাপবে। শিল্পী বললেন মোৎসার্টের সঙ্গীতের ব্যবহারকে স্টিরিওফোনিক ব্যবস্থার সাহায্যে একটা অপার্থিব রূপ দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক সুন্দর বললেন। নাট্যকার আমেদিয়ুসের সঙ্গে ঈশ্বরকে একাত্ম করেছেন। নাটকে তাই সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। আমেদিয়ুস প্রতিভাধর

হিসাবে হয়েছেন ঈশ্বরের বরপুত্র তার ওপর ছায়া পড়েছে খ্রীষ্টের। তাকে হত্যা করায় সেই ছায়া ঘনীভূত হল। খ্রীষ্টের ধর্মে ভরে গেল পৃথিবী কিন্তু যারা তাকে মারল তারা হীনতায় মিশে গুঁড়ো হয়ে গেল। সাধারণত্বের সঙ্গে প্রতিভার দ্বন্দ্বের চমৎকার প্রকাশ হযেছে এই নাটকে। তাই এই নাটক আমাদের মন ও বুদ্ধিকে সচেতন করে। প্রতিভার কষ্টিপাথরে মনটাকে ঘষে দেখতে ইচ্ছা করে কোন দাগ পড়ল কিনা।

হিসাব পরীক্ষক বললেন, আদর্শের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষটা চিরকালীন। তার মানে এই নয় যে আদর্শকে স্বার্থ ঘৃণা করে বরঞ্চ তার মানে এই যে আদর্শে স্বার্থের ক্ষতি করে। তার সংগ্রহে বাধা দেয়। স্বার্থ তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তার তো আদর্শ নাই। এখন যদি পুটলিটা না বাঁধতে পারে তার তো কিছুই থাকবে না। জীবনটা তার ষোলআনাই লোকসানে কাটবে। আদর্শ তাই তার শুধু অপছন্দ নয়, বড় ভয়ের।

শেষ কথা বললেন মহিলা। তিনি বললেন মোৎসার্ট সঙ্গিনী এক অপরূপ চরিত্র। তিনি নিজের নারীত্বের অবমাননায় বিচলিত হলেন না কিন্তু যখনই মোৎসার্টের কীর্তি ধ্বংস করার কথা শুনলেন তখন সর্ব শক্তি নিয়ে সেগুলি রক্ষা করলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর মাধ্যমেই মোৎসার্টের রচনা প্রচারিত হয়েছে। আদর্শ এবং স্বার্থ তার মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি না করে সহাবস্থান করেছে। তাঁর আদর্শ মোৎসার্টের শিল্পকর্মকে রক্ষা করেছে। তাঁর স্বার্থ এই রচনাগুলিকে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেছে। সকলের কাছে সেই প্রয়াত মহাসুরকারকে নিয়ে গিয়েছে। তাঁকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জগৎসভায় তাঁর নামকে অমরতা দিয়েছে।

আহারালয়ের মালিক এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দোকান বন্ধ করতে হবে। ঘড়ির কাঁটার যুক্ত করে তখন রাতের অধিশ্বরীকে প্রণাম জানান হয়ে গেছে। সকলে বাড়ীর পথ ধরলাম। সন্ধ্যার স্মৃতি ফুলের গন্ধের মতো আমাদের ঘিরে থাকল। লণ্ডনের এই সন্ধ্যাকে আমরা কেউ ভুলব না।

স্ট্রাটফোর্ড-অন-আভনে লেখক

লেখককে লেখা নাট্যকার ইউনেস্কো'র পত্র